মাহফুজ পারভেজ

বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি

বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম
ও
শান্তিচুক্তি

মাহফুজ পারভেজ

একটি পত্রিকা
একটি বইয়ের দোকান
একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

ISBN-984-8088-57-1

বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি

মাহফুজ পারভেজ

© মাহফুজ পারভেজ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
কম্পোজ : **বুক ক্লাব কম্পিউটার** ৪৪ আরামবাগ ঢাকা-১০০০
পানামা প্রিন্টার্স ৫৯ পশ্চিম মালিবাগ ঢাকা ১২১৭ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : **বুক ক্লাব** ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

১২৫.০০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জনকণ্ঠ উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান

ও

ড. আমেনা মোহসীন

www.pathagar.com

সন্দেশ প্রকাশিত মাহফুজ পারভেজ সম্পাদিত কবিতাগ্রন্থ

শতবর্ষের প্রেমের কবিতা বিরহের কবিতা

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ কয়েক যুগের রক্তক্ষয়ী জাতিগত সংঘাত গত বছরের শেষ দিকে (১৯৯৭) একটি আপাত মীমাংসায় পৌঁছেছে। বিদ্রোহী সশস্ত্র পাহাড়িদের সঙ্গে 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে। বাংলাদেশের কেন্দ্র থেকে দূরপ্রান্তে অবস্থিত গহীন অরণ্যের সংঘাত নিরসন করা হলেও চূড়ান্ত শান্তি যে আরো সময়ের ব্যাপার তা' অনুধাবন করতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। একদিকে যখন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছিল ঢাকায়, অন্যদিকে তখন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে মেতে ছিলেন বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী। শুধু পাহাড়েই নয়, জাতীয় রাজনীতিও হয়ে পড়ে দ্বিধা-বিভক্ত। পার্বত্য ইস্যু পরিণত হয় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতিক ইস্যুতে। যা বাংলাদেশী-বাঙ্গালি; ধর্মনিরপেক্ষতা; সরকার পদ্ধতি; উন্নয়ন কৌশল ইত্যাদি ইস্যুর মতোই স্থায়ী বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

জাতিগত সংঘাত মীমাংসা বা শান্তিচুক্তির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও উন্নয়ন- বিদেশী বিনিয়োগ-প্রাকৃতিক সম্পদ- গ্যাস-তেল-ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু বর্তমানকে পেরিয়ে আসছে একবিংশ শতকে সম্প্রসারিত হতে বাধ্য। এমনকি, জাতীয় রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক-অর্থনৈতিক-একাডেমিক এবং তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলকে পর্যন্ত প্রবলভাবে আলোড়িত করবে- এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়।

গুরুত্ববাহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর নানা দিক নিয়ে পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা লিখলেও আস্ত একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আপাতত আমার ছিল না। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে আমি ব্যস্ত রয়েছি পিএইচডি গবেষণা কর্মে। যদিও গবেষণার বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রাম (The Management of Ethnic Conflicts in South Asia : The Case of Chittagong Hill Tracts.), তথাপি আমি পরিকল্পনা করেছিলাম গবেষণা শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার। গবেষণার ধারাবাহিকতায় আমি যখন 'লিটারেচার সার্ভে' পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সরকারি-বেসরকারি নথিপত্র, বই-পুস্তক, প্রবন্ধ নিয়ে কাজ করছি, তখনই 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় এবং পার্বত্য ইস্যু সমগ্র জাতিকে অত্যন্ত উত্তাপের সঙ্গে, হয় ইতিবাচক নয় নেতিবাচকভাবে, স্পর্শ

www.pathagar.com

করে। সে সময় অনেকেই আমাকে এ বিষয়ে প্রামাণ্য-তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের অভাব পূরণের তাগিদ দিতে থাকেন।

ছাত্র জীবনের নেশা-পেশা ও ভালবাসার সাংবাদিকতাকেই আমি কর্মজীবনের প্রথম পেশা হিসেবে সাদরে নিয়েছিলাম, যাকে আমি বর্তমান শিক্ষকতা-গবেষণা পেশার পাশাপাশি এখনো নিরবিচ্ছিন্নভাবে লালন করছি 'জীবন্ত কিংবদন্তি সাংবাদিক', জনকণ্ঠ উপদেষ্টা সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন তোয়াব খানের স্নেহ ও আনুকূল্যে: যাঁর কর্মপদ্ধতির কাছ থেকে পেয়েছি আমি : সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্যকর্মকে গুরুত্ব দেয়ার ও মেধাস্নিগ্ধ পরিশ্রমের শিক্ষা। এ গ্রন্থ অতি দ্রুত সম্পন্ন করার পেছনে পরোক্ষ অনুপ্রেরণা তিনি: এবং প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ড. আমেনা মোহসীন, যিনি বিশ্বখ্যাত ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে একটি অসাধারণ ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্ব 'সন্দেশ' স্বত্তাধিকারী, সাহিত্যবোদ্ধা-সম্পাদক লুৎফর রহমান চৌধুরীর। গ্রন্থের প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে অনুজ প্রত্নতাত্তিক মাসুদ জিয়াউল হক ও অনুজপ্রতীম তরুণ লেখক প্রকল্পের কবি, বর্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক শামীম সিদ্দিকীর পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে, অবনত মস্তকে স্বীকার করা প্রয়োজন, আমার পিতা-মাতার শর্তহীন-উদার-অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা-পৃষ্ঠপোষকতার কথা, যা আমাকে নিয়ত গতিশীল রাখে: আমার সাফল্য বলতে যদি কিছু থাকে, তা মূলত তাঁদেরই সাফল্য।

মাহফুজ পারভেজ

ডিসেম্বর, ১৯৯৮
ডিএমসি : ৪৮২,
পূর্ব কাফরুল,
ঢাকা সেনানিবাস।

www.pathagar.com

৯–১৩ বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি
পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির সাধারণ পর্যালোচনা
গ্রন্থের উদ্দেশ্য
বিষয়বস্তুর আলোচনা
১৪–২১ গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ
ব্যক্তিক আলোকে বাংলাদেশের আদিবাসী
আদিবাসী জীবনের খণ্ডচিত্র
পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবন : করুণ উপাখ্যান
সন্ত্রাস বনাম শান্তি
২২–৩১ পার্বত্য চট্টগ্রাম : মাটি ও মানুষ
ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক বিবরণ
ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংগ্রাম
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
লোকাচার ও সংস্কৃতি
৩২–৪৪ সবুজ পাহাড়ে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা
বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস
পাকিস্তানি শাসনের অবিমৃষ্যকারীতা
মুক্তিযুদ্ধে বিভ্রান্ত পার্বত্য জনগোষ্ঠী
স্বাধীন বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবের আমল
শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও বিচ্ছিন্নতা
৪৫–৫১ রক্তের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার
সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ
বিদ্রোহে ভারতের সংযুক্তি
রক্তের বদলে রক্ত
শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সংঘাত
নির্যাতন চিত্র : বিপন্ন পাহাড়ি ও বাঙ্গালি
বিদ্রোহের স্খলন : চাঁদা আদায় সংস্কৃতি
অমীমাংসিত রক্তপাত : অমীমাংসিত ফলাফল
৫২–৬২ শান্তির সন্ধানে দীর্ঘ পথযাত্রা
অবহেলিত পার্বত্য জীবন
শেখ মুজিবের উদ্যোগ ও বিভ্রান্তি
জিয়াউর রহমানের আমলে শক্তি ও কৌশল নীতি
এরশাদ আমল : অতীতের ধারাবাহিকতা
খালেদা জিয়া আমল : রাজনৈতিক উদ্যোগের সূচনা
শেখ হাসিনা আমল : সম্পন্ন শান্তিচুক্তি
উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি ৬৩–৬৮
শান্তিচুক্তি ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া
পাহাড়ে আনন্দ ও ক্ষোভের মিশ্র প্রকাশ
চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
চুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অবস্থান গ্রহণ
শান্তিচুক্তি ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি
পার্বত্য শান্তিচুক্তির নানাদিক ৬৯–৮৩
চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
চুক্তির বিপক্ষে উত্থাপিত যুক্তি
চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতা বিতর্ক
বিএনপির ১৮টি অভিযোগ ,সরকারের বক্তব্য
স্থায়ী শান্তি ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য
পার্বত্য চট্টগ্রাম :
তিনটি বিকল্প প্রস্তাবনা ৮৪–৯৬
চুক্তি এবং উল্লেখযোগ্য বিকল্প প্রস্তাবসমূহ
পার্বত্য সমস্যা : জাতীয়তাবাদের সংকট
পার্বত্য সমস্যা : বিকল্প মানবিক সমাধান
পার্বত্য সংকটের নানা মাত্রা ও ভবিষ্যৎ
একবিংশ শতকের বাংলাদেশ ও
পার্বত্য চট্টগ্রাম ৯৭–১০৫
স্থায়ী শান্তির সন্ধানে
মানবিক সমাধানের সন্ধানে-
আগামী শতকের প্রস্তুতি
বাংলাদেশের পিছিয়ে যাওয়া
স্বাধীনতার ২৭ বছর : সামাজিক আদর্শহীনতা
হতাশার সর্বব্যাপী প্লাবন ও উদ্দেশ্যহীন যাত্রা
একবিংশ শতক : জেগে ওঠবার সময়
অপরিহার্য উন্নয়ন, সমৃদ্ধি : অপরিহার্য শান্তি, স্থিতি
চুক্তিই স্থায়ী শান্তির শেষ কথা নয়
আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ ও বাংলাদেশের শিক্ষা
পাহাড়ি-বাঙ্গালি সামাজিক ঐক্যের অপরিহার্যতা
স্থায়ী শান্তির সংকল্প: বিকল্প মানবিক সমাধান
পরিশিষ্ট ১০৭–১৭৬
ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি
খ. জনসংহতি সমিতি : আদর্শ ও লক্ষ্য
গ. পার্বত্য শান্তিচুক্তি
ঘ. শন্তু লারমার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকার
গ্রন্থপঞ্জি

www.pathagar.com

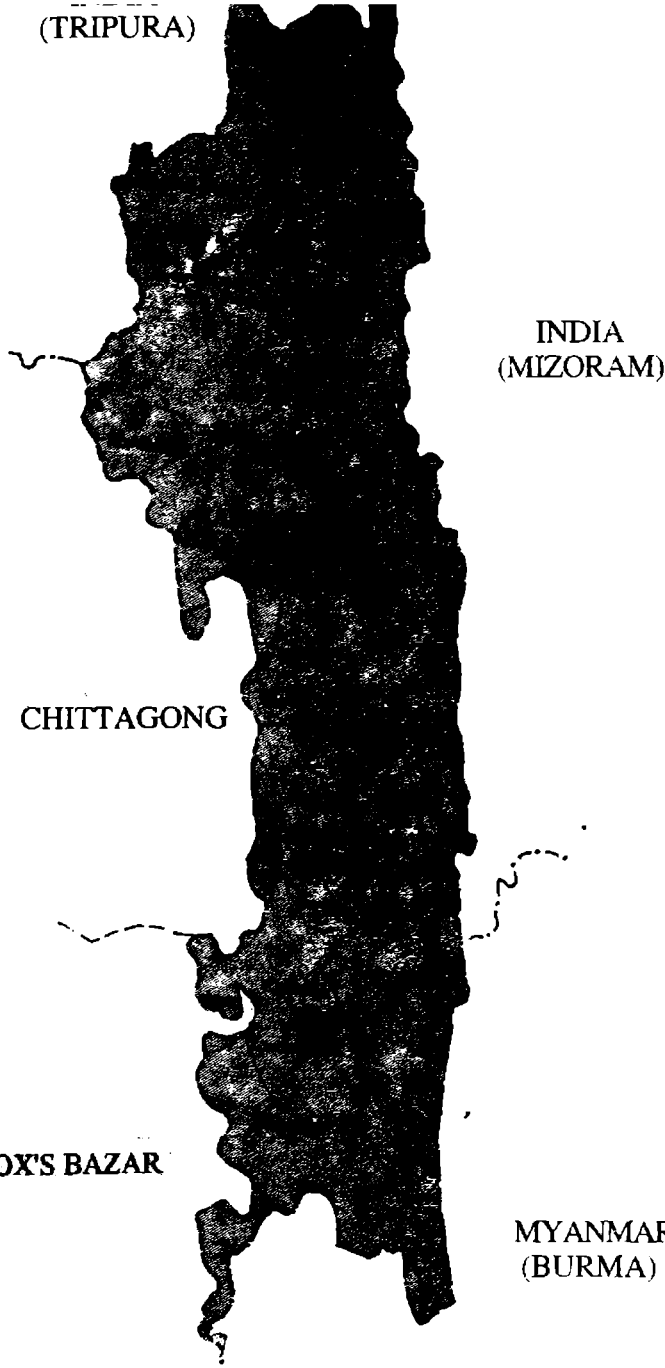

সূত্র : বাংলাদেশ পর্যটক মানচিত্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, নভেম্বর - ১৯৯৭।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি
মানবিক বিকল্প সমাধানের সন্ধানে

বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন আপাতত শান্ত; বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র 'শান্তিবাহিনী'র রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে। 'শান্তিচুক্তি' জন্ম দিয়েছে নতুন উত্তেজনার। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর চির অবসান ঘটানো সম্ভব হলো না। এমনই প্রেক্ষাপটে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতির মাধ্যমে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্ব ও বাংলাদেশের সামনে উপস্থিত হয়েছে একটি শতক, নতুন সহস্রাব্দ : একবিংশ শতক।

পাহাড় ও অরণ্যের রাখি বন্ধনে চির সবুজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল বাংলাদেশেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর একটি অন্যতম দৃষ্টিনন্দন স্থান। বিগত দুই দশক ভাল ছিল না পার্বত্য অঞ্চল, পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙ্গালিরা। সবুজ পাহাড়ে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের লাল অগ্নিশিখা। নৈর্সগিক জনপদ হয়ে উঠেছিল রক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদের ভয়াল উপত্যকা। শান্তির দেশ সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয় পার্বত্য চট্টগ্রামের 'সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল হিংসার ঝরনাধারা' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭); সেখানে চলছিল Internal war (S. Mahmud Ali 1993)। অভ্যন্তরীণ লড়াই ও বিদ্রোহের করাল গ্রাসে পার্বত্য ভূমি ও মানুষ হয়েছিল ভীত, সন্ত্রস্ত; সমগ্র দেশবাসী উদ্বিগ্ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ও কৌশল নীতি নেয়া হয়েছিল; যার ফলাফল ভাল হয়নি, শান্তির বদলে বৃদ্ধি পেয়েছিল অশান্তি। পরে নেয়া হলো রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ, এরই ধারাবাহিক ফলশ্রুতিতে সম্পন্ন হলো বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে বহু আকাঙ্খিত শান্তিচুক্তি। শান্তিচুক্তি সংঘাত অবসানের মাধ্যমে শান্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে; কিন্তু স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙ্গালি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তীব্রভাবে বিরুদ্ধাচরণ করছে শান্তিচুক্তির। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যের সংঘাত এখন জাতীয় রাজনীতিকেও গ্রাস করেছে। ফলে পার্বত্য শান্তির ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

চুক্তির ব্যাপারে হতাশাও পোষণ করেছেন অনেকেই। চুক্তি মানেই চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ। কেউ কেউ বলেছেন মানবিক হৃদয়ের চুক্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭)। কেউ কেউ বলেছেন চিরতরে সংঘাত নিরসন না হবার তত্ত্ব (D. R. Z. A. Nazneen 1996)। শক্তিশালী একটি তাত্ত্বিক অভিমত হলো জাতীয়তাবাদের সর্বগ্রাসীতার বিরুদ্ধে (Amena Mohsin 1997)। এরা সকলেই দিতে চেয়েছেন স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী পূর্ণ শান্তির পথ নির্দেশনা।

ফলে শান্তিচুক্তি মানেই স্থায়ী শান্তি নয়; বরং শান্তির পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কেবলমাত্র চুক্তিতে আঁকড়ে থেকে শান্তির সন্ধান করা হবে একদেশদর্শিতা। কারণ স্পর্শকাতর ও অতীত বিবাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর চুক্তি যে কোন উত্তেজনা, পরিবর্তন ও বাস্তবতায় থমকে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চুক্তি স্বাক্ষর ও ভঙ্গের বহু ইতিহাস খোঁজ নিলে জানা যাবে। এমনকি, মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত অধুনা লুপ্ত শান্তিবাহিনী বহু অস্ত্র বিরতির চুক্তি করেছিল এবং ভেঙেছিল। ভবিষ্যতে কোন পক্ষ কখন শান্তিচুক্তিকে বিপন্ন করবে, এটা আগাম বলা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থে শান্তির অপরিহার্যতাকে প্রধানতম গুরুত্বের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। শান্তিচুক্তিকে শান্তির পক্ষে একটি বড়ো ধরনের উদ্যোগ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু কোন চুক্তি বা পরিকল্পনা যেহেতু সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে এবং সর্বমহলের আস্থা অর্জন করতে পারে না- সেহেতু লক্ষ্য রাখতে হবে ত্রুটি ও অসঙ্গতিগুলোর প্রতি এবং ক্রমশ সকলকে শান্তির অধীনস্থ করতে হবে। এ জন্য চুক্তিই একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। জরুরি হলো সামাজিক ঐক্য বিধান করা। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অভিন্ন সুফল সকলের কাছে নিয়ে যেতে হলে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। অনাগত একবিংশ শতক শত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শান্তি ও ঐক্যের ডাক দিয়েছে: সময় এসেছে সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের।

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান প্রয়োজন। প্রয়োজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিকাশ এবং মূল জাতীয় স্রোতধারার সঙ্গে তাদের কার্যকরী ও অর্থবহ সংযোগ। এভাবেই শত স্রোতের মিলিত উদ্দামে জাতির মূল স্রোত গতিশীল, পুষ্ট ও বিজয়ী হবে: সম্ভব হবে কাঙ্খিত সাফল্যের স্বর্ণালী সৈকতে পৌছানো।

প্রশ্ন উঠতে পারে সামাজিক ঐক্যের প্রতি জোর দিতে গিয়ে পাহাড়িদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অস্বীকার করার বিষয়টি। এটা সত্যি যে, গ্রন্থে স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়নি। কেন পায়নি, তার সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ পাহাড়ি জনগণের আত্ম-উন্নয়ন ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করাই আদিবাসী ও বাংলাদেশের স্বার্থে জরুরি বিবেচনা করা হয়েছে। পার্বত্য স্বায়ত্তশাসন সামন্ত প্রভু, ধর্মীয় ক্ষমতাবান ও রাজনৈতিক-সামাজিক টাউটদের হাতে জিম্মি হবার আশংকা এখনো লুপ্ত হয়নি: এখনো উদ্বোধন ঘটেনি স্বাধীন-স্বনির্ভর-আত্মবিকশিত পার্বত্য জনতার। পার্বত্য স্বায়ত্তশাসন তাদেরকে এক শোষণ থেকে অন্য শোষণে নিয়ে যাবে এবং অচিরেই তাদের বাধ্য করবে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। শান্তি ও

www.pathagar.com

সমৃদ্ধি সে পথে নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা কম: পাশাপাশি স্থায়ী শান্তির কথা বলা হলে পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর কথাও মাথায় রাখতে হবে।

বস্তুতপক্ষে, যেহেতু সকলেই পার্বত্য শান্তির অপরিহার্যতা সম্পর্কে একমত, সেহেতু কেবলমাত্র চুক্তিতে আবদ্ধ না থেকে শান্তির বীজকে সমাজের দৃঢ় মৃত্তিকায় সম্প্রসারিত করতে হবে। গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে স্থায়ী শান্তির জন্য অবশ্য করণীয় সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে। এবং এটা করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতিসত্ত্বা, সংকট-সম্ভাবনা, বিদ্রোহ-শান্তি প্রক্রিয়া, ভূ-রাজনীতিক প্রসঙ্গ, শান্তির পক্ষে অন্যান্য বিকল্প প্রস্তাবনা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। একটি বিশাল ক্যানভাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ইস্যুর ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে স্থায়ী শান্তির আলোকিত পথ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (**গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ**) অন্তরঙ্গ আলোকে অবলোকন করা হয়েছে বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়কে। লেখকের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের সুযোগে তুলে ধরা হয়েছে আদিবাসী জীবনের খণ্ডচিত্র এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর যাপিত জীবনের করুণ উপাখ্যান আর সন্ত্রাস বনাম শান্তির দ্বৈরথ।

তৃতীয় অধ্যায় (**পার্বত্য চট্টগ্রাম : মাটি ও মানুষ**) পার্বত্য জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির সচল-সজিব প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করেছে। ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক বিবরণ, জেলা অনুযায়ী পরিসংখ্যান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও এ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য দিক হলো : পার্বত্য জাতিসমূহের রাজনৈতিক-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা: তাদের লোকাচার ও সংস্কৃতি: বৃহত্তর বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক: জীবনযাপন প্রণালী এবং সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর বিস্তারিত আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় (**সবুজ পাহাড়ে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা**) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের প্রতি ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণ-অবহেলার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছে। এ অধ্যায়ের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো পার্বত্য বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট এবং অন্তর্নিহিত কার্যকারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্রোহের রূপ-চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুধাবন করা। ঐতিহাসিক শোষন-বঞ্চনার পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে পাকিস্তানি শাসনামলে অনুসৃত অমানবিক নীতিগুলো, যেসব নীতি পাহাড়িদের জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে উৎসাহিত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য জনতার বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা: এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে তাদের প্রতি আক্রোস গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। কারণ পাহাড়িদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কারণ জানতে হলে এ সকল ঘটনার গভীরে প্রবেশ প্রয়োজন। এ অধ্যায়েরই আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো স্বাধীনত্য পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাহাড়িদের আন্তঃসম্পর্ক এবং স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে পাহাড়ি জাতিসত্তার উন্মেষ। আলোচিত-সমালোচিত 'শান্তিবাহিনী'র প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য এবং জাতিগত বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গটিও এ অধ্যায়ে যুক্ত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়ে (**রক্তের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার**) উতুঙ্গ বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ দমনের নামে যে ধারাবাহিক রক্তপাত চলেছিল, সেটাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে, কিভাবে অতি দ্রুত সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত হলো; সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নেটওয়ার্ক বিস্তার করলো এবং এসবের পেছনে মদতদাতা হিসাবে ভারতের কিরূপ ভূমিকা ছিল। শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ চিত্র উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এ পর্যায়ে; উঠে এসেছে অন্তঃদ্বন্দ্বের জটিল ইতিহাস; পাহাড়ি বিদ্রোহীদের হাতেই পাহাড়ি বিদ্রোহের নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে তীব্র নেতৃত্বের সংঘাতের স্বরূপ। দীর্ঘ মেয়াদি পার্বত্য বিদ্রোহ আদর্শিক পথ থেকে কিভাবে ক্রমে বিচ্যুৎ হলো এবং চাঁদা আদায় সংস্কৃতিতে আত্মনিয়োগ করলো– সে তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং পার্বত্য বিদ্রোহীদের অবস্থান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে (**শান্তির সন্ধানে প্রলম্বিত পদযাত্রা**) সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দেয়া হয়েছে বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালার দিকে। শান্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকরা কি রকম সিদ্ধান্তহীন ছিলেন এবং শান্তি স্থাপনের নামে কিভাবে অশান্তি বাড়িয়েছেন- সেটা আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এই ক্ষেত্রে শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সরকারের অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতির নানা দিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে, বিদ্রোহ দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ নীতি কিভাবে রাজনৈতিকভাবে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং পরিশেষে সম্পন্ন হয়েছিল শান্তিচুক্তি।

সপ্তম অধ্যায় (**উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি**) মূলত অভিনিবেশ করেছে শান্তিচুক্তি পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে। বিচ্ছিন্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কিভাবে জাতীয় আগ্রহ ও বিরোধিতার দ্বৈত চাপে রাজনীতির উত্তপ্ত ইস্যু হয়েছে তার বিবরণ এ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। চুক্তির পর সরকারি এবং বিরোধী দলের কার্যক্রমও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে।

অষ্টম অধ্যায় (**পার্বত্য শান্তিচুক্তির নানা দিক**) বহুল আলোচিত-সমালোচিত শান্তিচুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে উপস্থাপিত প্রায় সকল যুক্তি-তর্ক মতামতকে একত্রে সন্নিবেশিত করেছে; আলোচিত হয়েছে শান্তিচুক্তির প্রধান প্রধান দিক ও বৈশিষ্ট। চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতার পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক এবং চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপির উত্থাপিত অভিযোগ ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারের বক্তব্য উল্লেখ করে এ অধ্যায়ে স্থায়ী শান্তি ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য প্রসঙ্গে মতামত দেয়া হয়েছে।

নবম অধ্যায় (**পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ তিনটি বিকল্প প্রস্তাবনা**) সমকালীন প্রেক্ষিতে পার্বত্য সংকট সমাধানে উপস্থাপিত তিনটি ভিন্ন প্রস্তাবকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। উপসংহারে উপনীত হবার আগে সমস্যার সমাধানে যে যে দৃষ্টিকোণ ও মাত্রা থেকে বিকল্প পরামর্শ দেয়া হয়েছে– সেগুলোকেও পুনরালোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

উপসংহার : (একবিংশ শতকের বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ স্থায়ী শান্তির সন্ধানে) আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছে এবং সে আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে স্থায়ী শান্তির সুপারিশ দিয়েছে; যেখানে আদিবাসীদের উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে চুক্তিই স্থায়ী শান্তির শেষ করা নয়; বলা হয়েছে পাহাড়ি-বাঙ্গালি সামাজিক ঐক্যের অপরিহার্যতা ও স্থায়ী শান্তির নিরঙ্কুশ সংকল্পের প্রত্যাশা। মানবিক সমাধানের সন্ধানের মাধ্যমে টানা হয়েছে গ্রন্থের যবনিকা।

পরিশিষ্টে ১৪১৮ সাল থেকে শান্তি চুক্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের ক্রমঘটনাপঞ্জিসহ জনসংহতি সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ দলিল সংযোজন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ

পাঠ্য বইয়ের পাতায় আমি জীবনে প্রথম কোন উপজাতির ছবি দেখি। এর আগে উপজাতীয়দের সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিল না। পুস্তকের পাতায় পাওয়া এক অদ্ভুত রূপকথার মতো ধারণা নিয়ে শৈশবে আমার যে মানস জগত তৈরি হয়, সেটা ভাঙতে বহুদিন লেগেছিল।

সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছি; বাসায় বানান করে পড়তে শিখেছি; চারদিকে পাঠযোগ্য যা পাই তারই পাঠোদ্ধারে মেতে থাকি। এমন সময় শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। পড়াশোনা সব কোথায় গেলো! এখান থেকে সেখানে আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি। যুদ্ধের বাজারে আমি যেন বাসার বাইরে এদিক-সেদিক না যাই, সেজন্য বুদ্ধি করে আমার হাতে একটি মজার বই ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বইটির নাম 'পাকিস্তানের উপজাতি'। শিশুদের জন্য রঙিন ছবিতে ঠাসা চমৎকার বই। আজব আজব চেহারা; বিচিত্র সব পোশাক; বাদ্যযন্ত্র, উৎসব, অস্ত্র; দেখি আর অবাক হই। ততদিনে আমি জেনে গেছি কয়েকটি নাম : পাঠান, বেলুচ, মগ, চাকমা, গারো...। আমার ধারণা হয়েছিল এরা মনে হয় পাহাড়-জঙ্গলের কোন রূপকথা রাজ্যে থাকে।

২.

সে ধারণা ভেঙেছিল, আমি যখন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন। আমার বড় বোন থাকতেন হালুয়াঘাটে, ঠিক গারো পাহাড়ের পায়ের কাছে। এক শীতের ছুটিতে আমরা সেখানে বেড়াতে গেছি। একদিন ঘর থেকে বের হয়ে পাহাড় দেখছি আর আনমনে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি; ওপরের দিকে দেখতে দেখতে আশপাশ খেয়াল ছিল না। ছোট এলাকা; ভিড়, হৈ-চৈ কিছুই নেই। বেশ খানিকটা এগুনোর পর হঠাৎ খেয়াল হলো পাশে কারা যেন কি সব অচেনা ভাষায় কথা বলছে। তাকিয়ে দেখি সরু পথের পাশে একটা খোলা জায়গায় অদ্ভুত চেহারার কয়েকজন মানুষ বসে আছে; আমার দিকে তাকিয়ে ওরা আমাকে নিয়েই কথা বলছে। অচেনা জায়গা, শীতের বিকেল, আলো কমে এসেছে, চারদিকে মানুষজনও দেখা যাচ্ছে না। অপরিচিত চেহারার লোকগুলোকে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে নিয়ে কথা বলতে দেখে আমি তো ভয়েই অস্থির। কোন রকমে পিছন ফিরে এক দৌড়ে বাসায় হাজির হলাম। সবাইকে আমার ভয়ের কথা বলতেই শুরু হলো হাসি! বড় আপা কাজের লোক পাঠিয়ে অফিসের পিয়নকে ডেকে আনতে বললেন।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর পিয়ন লোকটি আসতেই আমি চিৎকার করে বললাম, 'একেই তো দেখেছি আরো ক'জনকে নিয়ে আমার ব্যাপারে বলাবলি করছিল'। আপা সংশোধন করে দিলেন: বললেন : 'একে দেখোনি, এর মতো একই চেহারার কয়েকজনকে দেখেছো! ও তো এতোক্ষণ অফিসেই ছিল'। বাল্যের বিস্ময় ভাঙিয়ে আপা আমাকে গারোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওই লোকটির সঙ্গে পরে আমি অনেকবার গারো পাহাড়ের খুব কাছাকাছি বেড়াতে গেছি: ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। আমার বয়েসী গারো ছেলেমেয়েরা অবাক চোখে আমাকে দেখছিল: আমিও অবাক তাদের দেখে। মনে হয়েছিল আমাদের দেশে থেকেও ওরা আমাদের মতো নয়: কী চেহারা, কী ভাষা, কী পোশাক-সবদিক থেকে কেমন যেন আলাদা। তখন এর বেশি কিছু আর বুঝিনি: গারোদের সঙ্গে পরিচিত হয়েই খুশি হয়েছিলাম: ওদের দুঃখ-যন্ত্রণা টের পাবার মতো বয়স আমার তখন হয়নি: সেটা ছিল শুধুমাত্র আনন্দিত হবার জীবন। এটা বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা কোন রূপকথা জগতের স্বপ্নের মানুষ নয়: আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ: এমনকি বইয়ের পাতায় যে রঙিন চমক, তারচেয়েও ওরা অনেক অনেক বেশি সাধারণ।

৩.

১৯৮৩ সালের কথা, কিশোরগঞ্জে কলেজে পড়াশোনা করি। কাজ করছি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকের জেলা প্রতিনিধির। একদিন প্রেসক্লাবে পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর চিঠি নিয়ে এক লোক দেখা করতে এলেন। লোকটি গারো উপজাতীয়। তিনি একটি সমস্যায় পড়েছেন, আমার সহযোগিতা চান। সমস্যাটি বেশ জটিল: তাদের নিজস্ব কম্যুনিটির মধ্যেই সমস্যাটির সূত্রপাত, এখন ছড়িয়ে গেছে নানা দিকে। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মতবাদেরই অনেকের সংঘাত শুরু হয়েছে। তিনি অবাধে মিশনারীদের দ্বারা খ্রিস্টানকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধী: নিজস্ব জাতিসত্তা ও পরিচিতি বাঁচিয়ে রাখতে আগ্রহী। দ্বন্দ্বের সূচনা সেখান থেকেই। ভদ্রলোক একটি ছোটখাটো চাকরি করেন। প্রতিপক্ষের লোকজন নানাভাবে তাঁর চাকরির ক্ষতি করতে চাচ্ছে। চাকরি চলে গেলে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে খুবই বিপদে পড়বেন। আমরা উদ্যোগ নেয়ায় লোকটি সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন। পরে কী হয়েছিল সে খবর আর আমরা পাইনি।

তবে সাম্প্রতিক গারো সম্প্রদায়ের খোঁজ-খবর পাওয়া গেলো আরেকটি সূত্রে। জুন মাসের (১৯৯৮) শেষ সপ্তাহের কোন একদিন কথা হচ্ছিল শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটের দোতলায় সাহিত্যিক-লেখক আহমদ ছফার কার্যালয় 'উত্থান পর্বে'। এক ভদ্রলোক একজন শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলে চাচ্ছেন, যে সাঁওতালদের মধ্যে ফিরে গিয়ে স্কুল চালাতে এবং সমাজ-উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী। ছেলেটিকে হতে হবে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল এবং অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে পূর্ণ সতর্ক। ভদ্রলোককে আমার পরিচিত মনে হলো: আলাপ করে জানা গেলো তার নাম জীবন, জাহাঙ্গীরনগরে পদার্থ বিদ্যায় পড়াশোনা করেছেন, আমার এক ক্লাস সিনিয়র। ক্যাম্পাসে আমাদের দেখা-

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ হলেও তেমন কথা হয়নি। তিনি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও নামকরা বেসরকারি সংস্থায় কাজ করছেন। 'কেন তিনি সাঁওতালদের নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন' জানতে চাইলে জীবনদা গারোদের উদাহরণ টানলেন। বললেন, 'গারোদের মধ্যে এখন নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য জানা লোকের সংখ্যা একেবারে হাতে গোনা। সবাইকে সদা প্রভুর পায়ের তলায় নিয়ে গেছে।' আমার স্মৃতিতে তখন কিশোরগঞ্জের হঠাৎ পরিচিত বেদনার্ত গারো লোকটির চেহারা ভেসে উঠলো; যে ভদ্রলোক চেয়েছিলেন গারোরা স্বকীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চেতনা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকুক!

৪.

মধ্য আশি দশকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে আমি প্রথমে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হই। কিছুদিন ক্লাস করার পর বিভাগ বদল করে চলে আসি 'সরকার ও রাজনীতি'তে। ইতিহাসে আমার এক সহপাঠী ছিল বিমল কুমার চাকমা, বাড়ি রাঙ্গামাটি জেলার কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দর্শনে আর একজন উপজাতি ছাত্র ছাড়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কোন জাত ভাই ছিল না। সে আমলে পাহাড়িরা কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তে আরম্ভ করেছে; এতো অধিক হারে রাজধানীতে আসতে চাইতো না। এখন তো ঢাকায় তারা শ' শ'—তাদের সমিতি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবেও তারা বেশ সক্রিয়।

বিমল, কোন ভুলে যে ঢাকায় পড়তে এসেছিল, কে জানে। সব সময়ই তাকে পোহাতে হতো বৈরি পরিবেশের জ্বালা। ভালো বাংলা বলতে না পারায় ওর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বলতে গেলে ছিলই না। তাছাড়া আমোদ প্রিয় বন্ধুদের যন্ত্রণাকর ঠাট্টা-তামাশা তো' ছিলই। ওর হয়েছিল গল্পের ব্যাঙের অবস্থা। বালক-বালিকারা পুকুরে ঢিল ছুড়ছে আর ব্যাঙের লাফালাফি দেখে হাসিতে মেতে ওঠছে। ওদিকে যে ব্যাঙের জীবনমরণ সমস্যা, সে খেয়াল আমোদপ্রিয় বালক-বালিকাদের থাকবে কেন? কৌতূকপ্রবণ বন্ধুদের তো এটা দেখলে চলে না যে, বেচারা বিমলের ইজ্জত-আব্রু-ব্যক্তিত্ব থাকছে না যাচ্ছে। ওর কাছ থেকে টাকা-পয়সা, বইপত্র, নোট ধার নিয়ে ফেরত না দেয়াটাই ছিল বৈধ। অবশ্য এ সমস্যা খুব বেশিদিন থাকেনি। নি:সঙ্গ বিমলকে নিয়ে বহুরখানেক পর টানাটানি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে উৎসাহী সহপাঠীরা। এক বিপদ গিয়ে হাজির হয়েছিল অন্য বিপদ। ক্যাম্পাসে ক্যাডার ও মাসলম্যানদের চোখ পড়ে বিমলের ওপর। সবার ধারণা, বিমল যেহেতু পাহাড়ি ছেলে, ওর সাথে শান্তিবাহিনীর যোগাযোগ থাকতে বাধ্য। নাম আরবী হলেই যেমন ধরে নেয়া হয় পাক্কা মুসলমান, পাহাড়ি বিমলকেও ধরে নেয়া হয়েছিল শান্তিবাহিনীর লোক। তারিক আজিজ নাম হয়েও লোকটি খ্রিস্টান এবং ইরাকের মতো শক্ত মুসলমান দেশের মন্ত্রী- এটা অবশ্য কেউ কেউ সহজে মেনে নেয় না। বিমল যতোই বলে 'না'; অন্যরা তারচে' বেশি বলে 'হ্যাঁ'। অনেক ঝুলাঝুলির পর ক্যাডাররা দেখলো বিমল আসলেই বেচারা; ওকে দিয়ে ভালো 'অস্ত্র-বোমা' সাপ্লাই আনানো যাবে না। ঝামেলা আসতো তখনই যখন ক্যাম্পাসে কোন গ্রুপের হাতে

www.pathagar.com

নতুন কোন অস্ত্র আসে; প্রতিপক্ষ প্রকাশ্যে ও গোপনে পরীক্ষা করতো : 'ব্যাটা আবার ভালো মালটা ওদের দিয়ে দেয়নি তো'! আতংক ও চাপের মধ্যে কাটতো বিমলের দিন। সবচেয়ে বিপদে পড়তো যখন বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ওর আশে-পাশে ঘোরাফেরা করতো। বিমলের সঙ্গে আগাগোড়াই আমার সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মাঝে মধ্যে মন খারাপ হলে সে চলে আসতো আমার কাছে; ওর কথা শুনলে হাহাকার করে ওঠতো আমার ভেতরে।

প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ও চাপের মধ্যে শিক্ষা জীবন শেষ করে বিমল বহু কষ্টে ক্যাম্পাস ছাড়তে পেরেছিল। মনে হয়েছিল সে যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। সমাপনী উৎসবের এক ফাঁকে বিমল আমাকে বলেছিল : 'ডিগ্রিটা নিতে গিয়ে অনেক শিক্ষা হলোরে দোস্ত,' আনন্দের সেই রাতে বিমল মনপ্রাণ উজাড় করে আনন্দিতও হতে পারেনি; আতংকের, ভীতির ঘোর তার শেষ হয়নি।

৫.

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়ই আমি পূর্ণকালীন সাংবাদিকতা শুরু করেছিলাম। সে সময় ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্ট বীটগুলো আমাকে কাভার করতে হতো। আশি দশকের শেষ দিকে বামপন্থী সংগঠনগুলো পার্বত্য জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রশ্নে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। মানবিক বোধসম্পন্ন প্রায় সব মানুষই নির্যাতিত পার্বত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ও সহমর্মী মনে করতেন। এটা আমাদের ভাবতে দুঃখ হতো যে আমাদের এই স্বাধীন দেশের একদল সংখ্যালঘু নাগরিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও প্রতিক্রিয়ার হাতে দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। সে সময় ক্রমে ক্রমে পাহাড়িদের ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠছিল ঢাকায়। ওদের বেশ কিছু সংবাদ সম্মেলনেও আমি গিয়েছি, ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করে তাদের সমস্যা ও সুখ-দুঃখ সম্পর্কে জেনেছি। এসব দেখা-সাক্ষাৎ হতো সাধারণত প্রেসক্লাবের সামনে তোপখানা রোডের কোন কোন ক্ষুদ্র বামদলের কার্যালয়ে। একদিন সম্ভবত ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের ২২ বা ২৩ তারিখ, তোপখানা রোডের এক রাজনৈতিক দলের অফিস থেকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করে বেরিয়ে এসেছি। প্রেসক্লাবের সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। ১২টি লাশ সাজানো। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে এ সকল বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে শান্তিবাহিনী। যে পথে পাহাড়িদের অভিযোগ শুনেছি, সে পথেই শুনতে হলো পাহাড়িদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ। কী নির্মম হত্যার সংস্কৃতি!

৬.

১৯৯৩ সালের শুরুতেই আমি সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে শিক্ষকতায় চলে আসি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাজনীতি বিজ্ঞান' বিভাগে যোগদান করি। এখানে এসে আমি আমার বিভাগেই বেশ কয়েকজন পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীকে পাই। ঢাকায় পাহাড়ি-বাঙ্গালির দ্বন্দ্ব আমার মনোজগতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। চট্টগ্রামে দেখা গেলো দ্বন্দ্বটি কেবলমাত্র মানসিকই নয়, বস্তুগতও বটে। চট্টগ্রামের লোকজন, খুব সাধারণ কারণেই নানা বৈষয়িক স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

www.pathagar.com

পার্বত্য সংকটে তাদের অবস্থান,তাদের লাভ-লোকসানের তুলাদন্ডে নির্ধারিত। বুদ্ধিজীবীরাও অবস্থা বুঝে অবস্থান নিয়েছেন। এনজিও, প্রজেক্ট বা সরকারি মহলের সাথে সম্পর্কের নিরিখে এক একজন নির্ধারণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যায় তাদের নিজ নিজ অবস্থান।

পূর্ব-পেশার কারণে চট্টগ্রামের অনেক সাংবাদিকই ছিলেন আমার পরিচিত। বেশ ক'টি জাতীয় দৈনিকের ব্যুরো চিফ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাদের সঙ্গে পরিচয় দশ বছরের কম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাদের পেশাগত দায়িত্বের বাইরেও ছিল গভীর আগ্রহ। সেখানকার তাজা খবর, ছবি চড়া দামে দেশ-বিদেশে বিক্রির সুযোগ ছাড়াও ছিল অন্য সুযোগ।

বিষয়টি প্রথমে আমি অনুধাবন করতে পারিনি। মনে রাখতে হবে, সে সময় সমস্যাটির সামরিক সমাধানের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছিল সরকারি নীতি। চট্টগ্রামের সামরিক কেন্দ্র থেকে পাহাড়ে অবস্থিত সেনাবাহিনীর মাহাত্ম্য প্রচার এবং তাদের উপস্থিতির আবশ্যিকতা প্রমাণ করার জন্য কাউকে কাউকে কাজে লাগানো হতো। অনেকেই বেশ আগ্রহ ও উৎসাহে এ কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে নানাভাবে বেশ লাভবান হয়েছেন। এসব কারণে প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে প্রচারণা জোরদার করার।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকা, গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি থেকে বিশেষ বিশেষ কাউকে বেছে নিয়ে সরকারি দাওয়াতে পাহাড় ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে এসব দু'তিন দিনের অতিথি 'দেখে এলাম', 'ঘুরে এলাম', 'যা দেখলাম' শিরোনামে ধারাবাহিক রচনা ফেঁদে বসেন। সে সব রচনা ছিল অন্ধের হস্তি দেখার মতো করুণ বিষয়। খামচা-খামচি করে এলোমেলো তথ্যে তারা যা লিখতেন, সেটা আসলে সামরিক সরবরাহকৃত বিবৃতির পরিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছুই হতো না। এগুলো না হতো গবেষণামূলক, না হতো সাহিত্যের পদবাচ্য। কোন কোনটিকে ব্যর্থ ভ্রমণ কাহিনীর মর্যাদাও দেয়া যায় না।

আমি গোড়া থেকেই নীতিগতভাবে সমস্যাটিকে দেখতে চেয়েছি উদার, মানবিক ও পক্ষপাতহীনভাবে। কোন পক্ষকে অবলম্বন করে ন্যায্য সমাধান দেয়ার হাস্যকার দাবি যারা করেন তাদের দলে আমি নেই।

আমার অবস্থানগত পরিচিতি জানার পরও কেউ কেউ আমাকে সরকারি সফরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে আসতে প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। তাদের এড়িয়ে যতোই আমি পাহাড়ি শিক্ষার্থী ও পর্বতে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের সঙ্গে আলোচনা করি, তারা ততোই আমাকে চাপাচাপি শুরু করেন। কোনভাবেই রাজি করাতে না পেরে একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো। বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন এক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধু বিভাগে আমার চেম্বারে এসে হাজির। আমি তো' অবাক! শহর থেকে এতোদূরে সাধারণত কেউ আগাম যোগাযোগ ছাড়া আসেন না। তাছাড়া বন্ধুটি আমার বাসার ফোন নম্বর জানে, তার পক্ষে ফোনে কথা বলে আসাও অসম্ভব ছিল না। অচিরেই তার জরুরি আগমনের হেতু জানা গেলো। তিনি সরাসরি

www.pathagar.com

আমাকে পার্বত্য সফরে যাবার প্রস্তাব দিলেন। সম্পর্কের কারণে তাকে এক কথায় না করে দেয়া অসম্ভব। চট করে আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে আমার অবস্থান জানে এমন দু'জন পাহাড়ি ছাত্রকে ডেকে আনলাম। বন্ধুটিকে বললাম 'আমি যেতে রাজি। আমার এই দুই প্রিয় ছাত্র বহুদিন থেকে ওদের বাড়িতে যেতে বলেছে, এই সুযোগে সেটা হয়ে যাবে।' বন্ধু বললো 'কি ভাবে'। 'কেন', আমি কপট অবাক হবার ভান করলাম : 'সামরিক যানে পার্বত্য চট্টগ্রাম যাবো, সেখান থেকে আমি ওদের বাড়ি গিয়ে কয়েকদিন থেকে চলে আসবো। টিমের সঙ্গে না এলেই চলবে।' বন্ধুটি আতংকিত হয়ে ওঠলো। আমিও গো ধরে বসলাম; বললাম : 'এদের কথা দেয়া আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম গেলে অবশ্যই তাদের বাড়ি যাবো; আমি তো আর রোজ রোজ পার্বত্য চট্টগ্রাম যাচ্ছি না! তাই সুযোগ হারাতে পারি না।'

বিফল মনোরথ বন্ধু ফিরে গেলেন। আমার খুব কষ্ট হলো এতো কাছের একজন বন্ধুকে একটা সাজানো নাটকের মাধ্যমে না করে দিতে। কিন্তু আমি নিরূপায়। যেখানে সর্বত্র রক্ত, কেউ রক্তের দায়মুক্ত নয়, সেখানে আমি কার সাথে যাবো? প্রকৃতি ও আদিম সৌন্দর্যের কাছে একমাত্র শান্তি ছাড়া অন্য কোন কারণে আমি যেতে আগ্রহী নই। যেখানে শান্তি প্রতিনিয়ত হনন করা হচ্ছে প্রতিটি পক্ষের নেতৃত্বে; সেখানে যাওয়া না যাওয়া সমান কথা।

৭.

তখন শান্তি সমঝোতায় অস্ত্রবিরতি চলছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং সে সময় সম্ভবত তিরানব্বুই সালের শীতকাল, বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমি প্রথমবারের মতো পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করি। চোখের সামনে থেকে এমন অপরূপ ভঙ্গিতে প্রকৃতি বদলে গিয়ে শুরু হলো সৌন্দর্যের এক-একটি নবতর পালাবদল, আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম।

সমতল এলাকার লোকদের জানবার কথা নয় পার্বত্য সৌন্দর্য। দিগন্তব্যাপী মাইলের পর মাইল তরঙ্গের মতো বিস্তারিত পর্বতমালা; পর্বতের শরীর বেয়ে এক একটি ঝর্না বা ছড়ি যেন রূপালী ফিতার উদ্দাম নৃত্যে নেমে এসেছে; চারদিকে গভীর-আর্দ্র সবুজ আর সবুজ; দূরে উপত্যকায় আদিম বসতি; অপেক্ষাকৃত উঁচুতে, পর্বত শীর্ষের বসতি থেকে নীল আকাশকে পাওয়া যায় নিবিড়তম দূরত্বে; প্রকৃতির গভীর ও অন্তর্ভেদী স্পর্শ মুছে দিয়ে যায় সকল কোলাহল, সকল অস্তিত্ব। আমি ভেবে পাই না এই বিপুল সৌন্দর্যের বর্ণনা কী করে সম্ভব!

প্রথমবার পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল কেন্দ্রবিন্দু রাঙ্গামাটি ও আশে-পাশের এলাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাবার সুযোগ হয়নি; সফর ছিল সংক্ষিপ্ত; প্রথম দর্শনের স্পর্শাতীত চমক আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

পরে আরো অনেকবার পার্বত্য অঞ্চলের আরো অনেক স্থানে গিয়েছি। ভেজা মাটি আর অচেনা লতা-গুল্ম-পুষ্পের মাদকতা নিয়ে ফিরে এসেছি। প্রাণবন্ত

www.pathagar.com

প্রকৃতির মাঝখানে বসতি স্থাপনকারী সংগ্রামশীল পার্বত্য মানুষদের দেখেছি ঠিক উল্টো: আতংক, ভীতি ও শংকার মধ্যে কাটছে তাদের চির নির্যাতিত জীবন। তাদের বিরুদ্ধে যেসব নির্মম অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়,শুনলে গা শিউরে ওঠে। অসহায় মানুষদের জন্যে প্রীতি ও সহানুভূতিতে হৃদয় সিক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় কাল-কালান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করেও মোচন হবে না অনাদীকালের পাপ। অপরিচিত বা সদ্য পরিচিত পাহাড়ি মানুষ, এমনকি চেনা-জানা পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের অব্যক্ত বোবা চোখে ঝরে ঝরে পড়ছিল বেদনার নীল ধারা।

যাদের বিরুদ্ধে এতো ক্ষোভ, বাঙ্গালি বসতি স্থাপনকারী সে সব অ-উপজাতি মানবমণ্ডলিও যে সুখের সাগরে ভাসছে তেমনটি নয়। বিভীষিকার মধ্যে চলছে তাদের জীবন। সকল বাঙ্গালিকে নির্যাতনের জন্য দায়ী করা যায় না, কেউ কেউ দায়ী। ভীতির সংস্কৃতির কাছে এই ন্যায়বোধ অচল। যে কোন সময়, যে কোন চোরাগুপ্তা হামলায় যে কেউই প্রাণ হারাতে পারেন। একবার রাঙ্গামাটি শহরে আমার এক ছাত্র দেখা হতেই বাঙ্গালি পাড়ায় নিয়ে গেলো। বিচ্ছিন্ন ভয়ের দ্বীপে বাস করছে যেন লোকগুলো। প্রশাসন, পুলিশ বা কেউই তাদের রক্ষা করতে পারছে না; তাদের রক্ষা করছে শান্তিবাহিনীকে দেয়া নিয়মিত মাসিক চাঁদা। কোন ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী নেই, যারা তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য শান্তিবাহিনীকে চাঁদা না দিয়ে নিবিঘ্নে থাকতে পেরেছে। যেন অঘোষিত একটি গোপন যুদ্ধের কাল পাড়ি দিচ্ছে পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতি ও বাঙ্গালিরা।

৮.

পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পারতো বাংলাদেশের শান্তির সুইজারল্যান্ড: হয়ে গিয়েছিল তীব্র অশান্তির লেবানন। অশান্তি কাউকে রক্ষা করেনি: কোন পক্ষকেই বিজয়ী করেনি। বাড়িয়েছে হিংসা, রক্তপাত ও বিভেদ।

সংঘাত নিরসনে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও চলেছে পাশাপাশি। এবং সে ধারায় ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য সমস্যা একটি জাতীয় ভিত্তিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেউ কেউ বলছেন চুক্তির ফলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়েছে: শান্তি নিশ্চিত হয়েছে। অপরপক্ষ বলছে দেশ বেচে দেয়া হয়েছে পাহাড়িদের কাছে। কেউ কেউ বিদেশী শক্তির গন্ধও আবিষ্কার করেছেন।

কেবলমাত্র কাগুজে চুক্তি করেই এমন একটি জ্বলন্ত জাতিগত সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। চুক্তি কখনোই এমন কোন আধ্যাত্মিক বিষয় নয় যে পর্বতের পাতায় পাতায় আর হ্রদের ঢেউয়ে ঢেউয়ে শান্তি ছড়িয়ে দেবে! আর চুক্তি করার ফলে চুক্তি ভাঙার সুযোগ এমনিতেই এসে যায়। যুগ যুগ ধরে দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, হানাহানি যেভাবে একেকটি জাতির মননে স্থায়ী আবাস করে নিয়েছে: সেটা মোচন করবে কে? কোন ব্যবস্থা মানবিক ভালবাসার প্রজ্জ্বলিত শিখায় পার্বত্য-বাঙ্গালি সবাইকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করবে? পুরো বাংলাদেশ যেমনভাবে পার্বত্য

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীর নিজস্ব, নিরাপদ ও উন্মুক্ত অংশ; তেমনভাবে পুরো পার্বত্য অঞ্চলকেও সমগ্র দেশবাসীর কাছে একান্ত নিরাপদ ও উন্মুক্ত করবে কে?

পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু এখন কেবলমাত্র উচ্ছ্বাস ও রাজনৈতিক বিলাসের অনুগামী; দলীয় অবস্থান চিহ্নিত করছে দলের সমর্থক ব্যাপক মানুষের অবস্থান। আসছে বিদেশী সংস্থা, উত্তোলন হচ্ছে প্রভূত সম্পদ। আন্তর্জাতিক গোপন নজরও আজ আর অজানা নয়। আমাদের সমস্যা যদি অন্যদের ফায়দা লুটার ক্ষেত্র হয় তাহলে দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না! মুর্শিদাবাদের সমস্যাই একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মওকা নেবার পথ করে দিয়েছিল; তিনশ বছর গোলামি করেও যদি সে বোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে আমরা আর কি থেকে শিক্ষা নেবো! আমাদের কোন বিপদ মানে আমাদের সকলেরই, পাহাড়ি বা বাঙ্গালি নির্বিশেষে, সবার বিপদ। একজনের বিপদ অন্যজনের সুখ আনবে, এটা ভাবা মূর্খতা।

সন্ত্রাস বনাম শান্তির প্রেক্ষপটে যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমরা আমাদের চোখের সামনে পাচ্ছি, তাকে শান্তির পক্ষে, ঐক্যের পক্ষে প্রভাবিত করতে হবে। একবিংশ শতকের যে সীমাহীন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে অনাগতকাল; তাকে জয় করতে হবে সম্মিলিত শ্রমে-মেধায়-মননে। এজন্য মানব মুক্তির গান গাইতে হবে শত কণ্ঠে। পিছিয়ে পড়া বাঙ্গালি, পিছিয়ে পড়া পাহাড়ি– সবাইকে উন্নয়নের মূলস্রোতে এনে কোন রূপকথা বা বিভীষিকা নয়; গড়তে হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ, গতিশীল, সমৃদ্ধ বাস্তবতা; বিজয়ী ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম : মাটি ও মানুষ

হয় পাহাড়, অরণ্য আর হ্রদ ঘেরা সবুজ অপূর্ব সুন্দর নিসর্গের জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রাম। সমগ্র বাংলাদেশের চেয়ে ভিন্ন, অভিনব, সে সৌন্দর্য। পাশ্চাত্যের অনিন্দ্য সুন্দরী সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করা পার্বত্য অঞ্চলকে। সেখানে আকাশ অনেক বেশি নীল, বৃক্ষ সবুজ, পাখি সুকণ্ঠী, পুষ্প রঙিন, প্রকৃতি উদার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম রূপময়; অত্যন্ত ভিন্ন তার রূপ সমতল অঞ্চল থেকে। সেখানে মাইলের পর মাইল ধানখেতে বাতাস ঢেউ খেলে যায় না; সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ালে পৃথিবী একটি ঝোঁপের মতো ছোট হয়ে ওঠেন। আর পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে চোখের সামনে শুধু অভাবিত বিস্ময়—পাহাড়ের পর পাহাড় বিশাল স্থির ঢেউয়ের মতো পড়ে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে; পাহাড়গুলোকে ঢেকে আছে বিভিন্ন ধরনের বিশাল গাছ, দূর থেকে যাকে ঘাসের আস্তরণ বলে মনে হয়। সেখানে মাথার ওপর দিয়ে এলোমেলো দ্রুত মেঘ উড়ে যায়, আবার ফেনার মতো আটকে থাকে পাহাড়ে। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের দিকে তাকালে সৌন্দর্যে বিবশ হয়ে আসে চোখ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়। মানুষ সেখানে বেশি চোখে পড়ে না; পড়লে পাহাড়ের পাশে তাদের ছোট্ট পতঙ্গের মতো তুচ্ছ মনে হয়; সেখানে মহান হচ্ছে সবল প্রকৃতি, মানুষ নয়। সেখানে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে আগুনে পোড়া পাহাড়; যেন আগুন লেগে পুড়ে গেছে পাহাড়গুলোর ছাল; দেখে কষ্ট হয়। কিন্তু পাহাড় না পুড়িয়ে উপায় নেই, সেখানে চাষের জন্য সমতল ভূমি বেশি নেই; তাই পাহাড়িরা পাহাড় পুড়ে পাহাড়ের গায়ে জুম অর্থাৎ চাষ করে—একই সাথে বোনে কয়েক রকম ফসল। দু-তিন বছরেই পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে ওটে পাহাড়ের মাটি, সেখানে আর ফসল জন্মে না; তাই পাহাড়িরা দু-তিন বছর পর পর পাহাড় বদলায়— এক সময় ছ-সাত বছর পর পর বদলাতো। তাদের জীবন এক ধরনের পাহাড়ি যাযাবরের। পাহাড়িরা বেশ শক্ত মানুষ, পাহাড় দিয়ে উঠে নেমে বাল্যকাল থেকেই তাদের পা, জংঘা, জঘন পেশল হয়ে ওঠে, তাদের পায়ের গোছা দেখার মতো; তাই একজন পাহাড়ি অবলীলায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে যেতে পরে, কিন্তু সমতলের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যেখানে বয়ে চলে সরু নদী; এবং অত্যন্ত সরু ছড়ি বা ছড়া বা ঝরনা। ঝরনার জল গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে চলে, এক-আধ ফুটের মতো হয় ওই জলের গভীরতা; পাহাড়িরা ওই ছড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পছন্দ

www.pathagar.com

করে। ছড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অনেক সহজ, কেননা তা অনেকটা সমতল, তাতে পাহাড়ে ওঠার কষ্ট হয় না; এবং পিপাসা লাগলে ছড়ার জলেই তৃষ্ণা মেটানো যায় (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ১৪)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে অবস্থিত। ভূ-খণ্ডটি মূলত উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পুবে ভারতের মিজোরামের লুসাই পর্বত শ্রেণী, মায়ানমারের অংশ, দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি জেলা পর পর অবস্থিত। উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা, মাঝখানে রাঙ্গামাটি জেলা ও দক্ষিণে বান্দরবান জেলা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। একটি মতে পার্বত্য অঞ্চল ৫০৯৩ বর্গমাইল, আরেক মতে ৫১৩৮ বর্গমাইল বা ১৩০০০ বর্গ কিলোমিটার; তবে মোটামুটিভাবে সকলেই নিশ্চিত যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দলভাগের এক ভাগ (BBS 1989)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণব্যাপী পর্বতপুঞ্জ। এগুলোর মধ্যে আছে: সুবলং, মায়ানি, কাসালং, সাজেক, হরিং, বরকল, রাইনখিয়াং, চিম্বুক, মিরিঞ্জা। পাহাড়গুলো সাধারণত ১০০ থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের নাম কেওক্রাডং, উচ্চতা ২৯৬০ ফুট।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও উপত্যকায় বয়ে চলেছে অনেকগুলো পাহাড়ি নদী। এর মধ্যে কর্ণফুলী, মাতামুহুরী, সাংগু, চেংগি, মায়ানি, কাসালং ও রাইন খিয়াং অন্যতম। আরেক বৃহৎ জলাধার কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদ, আয়তন ২৬৫ কি. মি.। জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীতে ১৮০০ ফুট দৈর্ঘ্যের ১৫৩ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন বাঁধ নির্মাণ করায় এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। এ হ্রদের জলে ডুবে যায় পুরনো রাঙ্গামাটি শহর; এখন যে রাঙ্গামাটি শহর রয়েছে, সেটা পরে নির্মিত, নতুন। কাপ্তাই ছাড়াও আছে আরো দুটি প্রাকৃতিক হ্রদ : রাইনখিয়ানকাইন ও বোগাকাইন।

প্রশাসনিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় ২৫টি থানা রয়েছে। এগুলো হলো : খাগড়াছড়ি জেলায় ৮টি (খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দিঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, লক্ষ্মীছড়ি, মানিকছড়ি, মহলছড়ি); রাঙ্গামাটি জেলায় ১০টি (রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, নানিয়ারছড়, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি, বিলাইছড়ি); বান্দরবান জেলায় ৭টি (বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম, নাইক্ষংছড়ি)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্যে (ইত্তেফাক ১৯৯৭) দেখা যায় আরো বিস্তারিত বিবরণ, যেমন :

ক) খাগড়াছড়ি জেলা, আয়তন ২৬৬০ বর্গ কিলোমিটার; উপজাতীয় ২,০৪,৬৩৫ জন এবং বাঙ্গালি ১,২৫,৬৪০ জনসহ মোট জনসংখ্যা ৩,২৯,৯২৩ জন; শিক্ষার হার ২০% জন; কলেজ ৫টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়

www.pathagar.com

৩৫৬টি, কারিগরি বিদ্যালয় ১টি, বসবাসকারী উপজাতীয় সংখ্যা ৩টি (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা)।

খ) রাঙ্গামাটি জেলা, আয়তন ৬,১১,৬১৩ বর্গ কিলোমিটার: উপজাতীয় ২,২৩,২৯২ জন এবং বাঙ্গালি ১,৭৮,০৯৬ জনসহ মোট জনসংখ্যা ৪,০১,৩৮৮ জন: শিক্ষার হার ৩৬.৪৮% জন; কলেজ ৩টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৩৯টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ১২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫০৭টি, কারিগরি বিদ্যালয় ৩টি, বসবাসকারী উপজাতীয় সংখ্যা ১১টি (চাকম., মারমা, তংচংগ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, লুসাই, বোম, খিয়াং, মুরুং, চাক, খুমি)।

গ) বান্দরবান জেলা, আয়তন ৪,৫০২ বর্গ কিলোমিটার; উপজাতীয় ১,১০,৩৩৩ জন এবং বাঙ্গালি ১,২০,২৩৬ জনসহ মোট জনসংখ্যা ২,৩০,৫৬৯ জন; শিক্ষার হার ২৩.৮৮% ভাগ: কলেজ ২টি, উচ্চ বিদ্যালয় ১৫টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ২৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১০টি, বসবাসকারী উপজাতীয় সংখ্যা ১২টি (মারমা, মুরুং, ত্রিপুরা, তংচংগ্যা, বোম, চাকমা, খুমী, খিয়াং, চাক, উসাই, লুসাই, পাংখো)।

জেলা সদরের সঙ্গে প্রধান সড়ক ছাড়া, সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিম প্রকৃতির রাজ্য: ঘন বন ও পর্বতের আড়ালে বিচ্ছিন্ন। ভারতের সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর অনেকাংশই এখনো চিহ্নিত ও নির্ধারিত হয়নি। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের কাছে সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার অংশ দেখা যায় বটে; কিন্তু মিজোরাম বা মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত একেবারে বিমূর্ত। (খাগড়াছড়ি জেলার পশ্চিম পাশে ভারতের ত্রিপুরা সীমানার পরিমাণ ২৩৭ কিমি: রাঙ্গামাটি জেলার পূর্ব পাশে ভারতের মিজোরাম সীমানার পরিমাণ ১৭৬ কিমি: রাঙ্গামাটি জেলার কিছু অংশ ও সম্পূর্ণ বান্দরবান জেলার পূর্ব পাশে মায়ানমারের সঙ্গে আছে ২৮৮ কিমি সীমান্ত)।

অরণ্য-সংকুল পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃতি সমতলের মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা অসাধ্য-প্রায়। সেখানে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়, এক মাইল পথ হেঁটে যেতে সেখানে লাগে কয়েক ঘন্টা: তাই সেখানে মহাজগতের দূরত্ব হিসেবের মতো মাইলের বদলে সময় দিয়ে হিসেব করতে হয় দূরত্ব: ওই এলাকার একান্ত অধিবাসী শুধু ওই এলাকার একান্ত অধিবাসীরা। ওই এলাকার অনেক অধিবাসী বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার বোঝে না; তাদের কারো হয়তো বাড়ি রাঙ্গামাটির সাজেকের পাশে, মামাবাড়ি মিজোরামে, আর শ্বশুরবাড়ি মায়ানমারে। তারা দেশের সীমা ও ছাড়পত্র ও দলিলহীন স্বাধীন অরণ্য মানুষ। এমন অরণ্য-পার্বত্য অঞ্চল বিদ্রোহীদের জন্যে স্বর্গ: তারা স্বর্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে পারে অবলীলায়, যেখানে শীতে বরফ জমে না, পায়ের নিচে মরুভূমি জ্বলে না এবং পাথরের আঘাতে পা থেকে রক্ত ঝরে না: বরং ছায়া দেয় চিরহরিৎ বৃক্ষ, তৃষ্ণা মেটায় ঝরনাধারা, আশ্রয় দেয় নিবিড় উপত্যকা। ওই সীমানার দীর্ঘ এলাকায় বাংলাদেশের কোন পুলিশ বা প্রহরী বা সৈনিক নেই: নাড়াইছড়ি থেকে সাজেক (১২২ কিমি), আঁধারমানিক থেকে মৌদক (১৩২ কিমি), মৌদক থেকে লেম্বুছড়ি (১০২ কিমি)

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অরক্ষিত, সেখানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারও নামে না (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ১৩)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯,৭৪,৪৪৫ জন; এদের মধ্যে উপজাতীয় ৬,৬৩,০৭৭ জন আর বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালি ৩,১১,৩৬৮ জন। উপজাতীয়রা সকলেই এক ও অভিন্ন নয়; তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ধর্ম, গোষ্ঠী ও পরিচিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ১৩। এই উপজাতিগুলো হলোঃ চাকমা, মারমা বা মগ, ত্রিপুরা, মুরুং, তংচংগ্যা, বোম, পাংখো, খুমি, উসাই, খিয়াং, চাক, লুসাই ও রিয়াং।

জনসংখ্যার বিবেচনায় চাকমা ৩,০৬,৬১৬ জন, মারমা বা মগা ১,৭৬,২৩০ জন, ত্রিপুরা ১,০২,৪৫৫ জন, মুরুং ৩২,০৯৮ জন, তংচংগ্যা ২১,১৪০ জন, বোম ৫,৫৮৪ জন, পাংখু ১,৬৫৮ জন, খুমি ১,০৯১ জন, উসাই ৯৬৬ জন। শতকরা হিশেবে ৩০.৫৭% ভাগ চাকমা, ১৬.৬০% ভাগ মারমা, ৭.৩৯% ভাগ ত্রিপুরা, অন্যান্য উপজাতি ৬.০৬% ভাগ এবং বাঙ্গালি ৩৯.৩৮ % ভাগ (BBS)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরোটি জাতি বা উপজাতি বা গোত্র এক জায়গায় জড়ো হয়ে নেই; বিশেষ এলাকায় জড়ো হয়ে আছে বিশেষ উপজাতি; যেমন- চাকমারা বেশি রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়; মারমাদের ঘনবসতি চন্দ্রঘোনা, বান্দরবান ও লামায়। বিভিন্ন গোত্রের ভাষা আর ধর্মও এক নয়। একটি গোত্র নিজেদের ভাষা বলে, অন্য গোত্রের সাথে কথা বলে বাংলায়; আর ধর্মে চাকমা, মারমা ও তংচংগ্যারা বৌদ্ধ; ত্রিপুরারা হিন্দু; লুসাইরা খ্রিস্টান; ম্রো, রিয়াং, খুমি, মুরুং, বনজোগি, পাংখোরা সর্বপ্রাণবাদী। তাঁদের নাম রাখার রীতিতে একটি মিল আছে, সবাই নামের শেষে জাতি পরিচয় ব্যবহার করে; যেমন কীর্তিমান চাকমা, বিনতা তংচংগ্যা। তাঁদের কারো কারো নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত, যেমন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয়; আবার কারো নাম তাঁদের ভাষায় এবং কিছু নাম আমাদের কাছে পুংলিঙ্গের, কিন্তু আসলে মানুষটি স্ত্রীলিঙ্গ; যেমন : নিশিকুমার চাকমা বা বীরেন্দ্র চাকমা (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ :১৫)।

পাহাড়ে জুম পদ্ধতিতে আর উপত্যকায় কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদই উপজাতীয়দের প্রধান উপজীবিকা। জুমই চাষের প্রধান পদ্ধতি। পাহাড় পুড়িয়ে তগল বা দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে একই গর্তে বোনা হয় ধান, কার্পাস, ভুট্টা, শসা প্রভৃতির বীজ। সমতল ভূমিতে উৎপাদন করা হয় ধান, সরষে, তামাক, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি।

আদিবাসীদের এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি এখনও গ্রহণ করেনি। জঙ্গলের একটা অংশ আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে, তারপর সেই ভস্মাচ্ছাদিত জমির ওপর আলগোছে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হলো জুম চাষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জুম চাষ হলো আদিবাসীদের ধর্মগত সংস্কার।

www.pathagar.com

আদিবাসীরা ধরিত্রীমাতার বুক লাঙ্গল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় না। লাঙ্গল প্রথা তাদের কাছে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার (সুবোধ ঘোষ ১৯৯৫ : ৮৩)। অবশ্য অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন, নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং সর্বোপরি আধুনিকতা আদিম পার্বত্য সমাজে যে পালাবদলের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে তাতে উপজাতীয়দের মধ্যে কৃষিভিত্তিক ধারা ক্রমেই লুপ্ত হচ্ছে; আসছে পেশার বিচিত্র পরিবর্তন।

উপজাতীয় সমাজে প্রধান বা সমাজপতি তিন রাজা : চাকমা, মোং ও বোমং রাজা। রাজারা নিজ নিজ সার্কেল বা এলাকার প্রধান, সমাজ শাসনের ও কর আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের। কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত হতো দেওয়ানরা, যারা ছিল খুবই শক্তিশালী। ১৯০০ সালে দেওয়ান পদটি লুপ্ত হয়। প্রত্যেক রাজার নিজস্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি আছে; তবে উপজাতিদের আর কারো জমির মালিকানা নেই। শাসনের জন্য প্রতিটি মৌজার জন্য আছে একজন হেডম্যান; পাড়া বা গ্রামের জন্য কারবারি। তারা অনেকটা পাহাড়ি যাযাবর শ্রেণী যেন। হেডম্যান বা কারবারির অনুমতি নিয়ে বিশেষ পাহাড়ে বা ভূমিতে থাকতে ও চাষ করতে পারে,কিন্তু ওই ভূমির তারা মালিক নয়। এক অর্থে তারা চির উদ্বাস্তু। চাকমাদের বিচার পদ্ধতিকে বলা হয় 'লাজের বাহার'। প্রতিটি উপজাতি বিভক্ত কয়েকটি গোত্রে; যেমন ম্রোংদের আছে পাঁচটি গোত্র, মগদের একুশটি, চাকমাদের চব্বিশটি। তাদের সমাজ পিতৃপ্রধান। চাকমা ও মগদের প্রধান বার্ষিক উৎসব মহামনিমেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বর্ষের শেষে। পুরুষরা ধুতি ও জামা পরে, মাথায় পরে 'খবং'; নারীরা নিম্নাঙ্গে পরে 'পিন্দম', বক্ষে 'খাদি'; তারা শাড়ি-ব্লাউজও পরে। নারীরা উৎকৃষ্ট বুনন শিল্পী; তারা বোনে কারুকাজখচিত বস্ত্র, যার নাম 'আলম'। বাঁশের বাঁশি তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র, যাতে তারা তোলে প্রেমাবেগের কাতরতা। তাঁদের প্রিয় ও প্রধান মহাকাব্যের বিষয় রাধামোহন ও ধনপতির বিরহ বিধুর প্রেম (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ৪৩)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল অদিবাসী কুকিরা; আরাকানি চাকমাদের আগ্রাসনে কুকিরা বিতারিত হয় এবং চাকমারা চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে বসতি স্থাপন করে। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় মগরা আরাকান থেকে বিতারিত করে চাকমাদের। তারা দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে, বসতি স্থাপন করে পাহাড়ে আর উপত্যকায়।

নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্ত্বাই সুবৃহৎ চীনা-ভোট (Sino-Tibetan) মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চীনা-ভোট (Sino-Tibetan) বৃহৎ দলটি প্রথমে ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) এবং পরে চীনা-শ্যাম (Siamese-Chinese) উপ-ভাগে বিভক্ত হয়। পরে চীনা-শ্যাম থেকে শ্যাম বা থাই দল এবং সেখান থেকে হা-শ্যাম (হা মানে রাজ্য, অর্থাৎ শ্যাম রাজ্য) সৃষ্টি করে (বরেন ত্রিপুরা ১৯৯০)। ভোট-বর্মী দল থেকে ছয়টি উপদলের সৃষ্টি হয়; নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতির ছক থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

www.pathagar.com

ছক—১

নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি

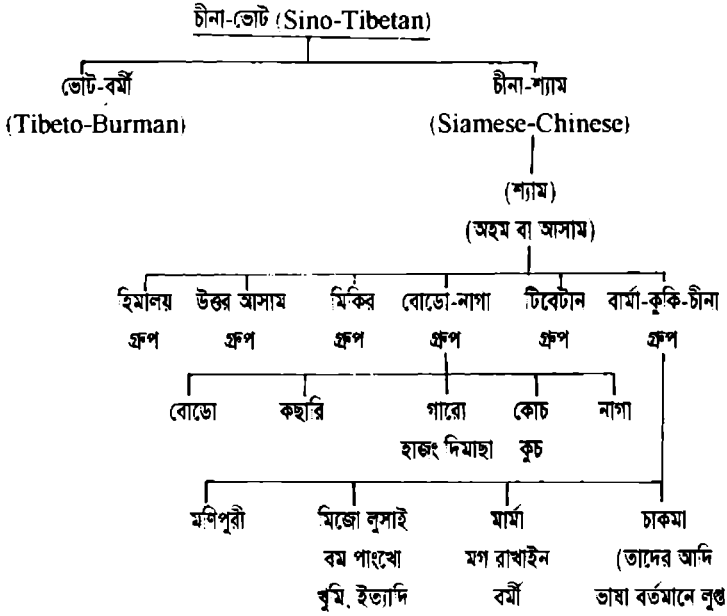

উৎস : (বরেন ত্রিপুরা ১৯৯০)

নৃতত্ত্ববিদদের মতে উপজাতীয়রা আকৃতির দিক দিয়ে মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত। তাঁদের অর্থনীতি, কৃষ্টি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন আসাম ও বার্মার সঙ্গে তুলনাযোগ্য। কৃষি কাজই হলো ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এসব অঞ্চলে চাষাবাদের পদ্ধতির সর্বত্র একই নাম, জুম। উপজাতীয় জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, দ্বিতীয় স্থানে আছে হিন্দু সম্প্রদায় এবং বাকিরা যথাক্রমে খ্রিস্টান এবং সর্বপ্রাণবাদী (Animist)। উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমারা শিক্ষায়, সংখ্যায়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। চাকমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুঘলদের দ্বারা প্রভাবিত এবং মৌলিত কাঠামো আরাকানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা দীর্ঘকাল ধরে বাস করলেও তারা বাঙ্গালি জনজীবন থেকে রয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন। উপজাতীয়রা মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি ও শাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়নি। অবশ্য অনেক নৃবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, মুসলমান শাসন আমলে উপজাতীয়রা মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করে। তাঁরা উপজাতীয়দের নামের পদবি পর্যালোচনা করে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। উপজাতীয় রাজাদের বংশ তালিকা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, উপজাতি রাজাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হন (মোঃ নুরুল আমিন ১৯৯২ : ১৩৮)। চাকমা জাতির ইতিহাসে চম্পন খান, জব্বর খান, ধর্মবক্স খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কর্মবিবরণী পাওয়া যায়। মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন; এমন মতও পাওয়া যায় যে, মুঘল শাসনের সময় মুঘলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চাকমা রাজারা, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত প্রজারা, মুসলিম নাম ও পদবি ব্যবহার করতেন। যদিও তারা কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হননি (সিদ্ধার্থ চাকমা ১৯৮৫ : ১৩-১৪)।

অন্য এক গবেষকের লেখায় মুসলিম বিবাহ প্রথার সঙ্গে চাকমা জাতির বিবাহ প্রথার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। মুসলমানদের মত ফুফু, খালা, শাশুড়ি, মাতামহী, পিতামহী, কন্যা, ভগ্নি, ভাইঝি প্রভৃতিকে বিয়ে করা চাকমাদের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চাকমা সমাজে চাচাত বোন, খালাত বোন, ফুফাত বোন বিয়ে করা চলে। এমনকি ভায়ের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতিও তাদের মধ্যে দেখা যায়,যা ইসলাম ধর্মমতে আইনসঙ্গত (আব্দুস সাত্তার ১৯৬৬ : ৭৩)।

উপজাতীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পক্ষে সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তির বিপরীতে উপজাতীয়রা অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, উপজাতীয়রা নিজ নিজ ধর্মীয় সত্তা বিসর্জন দিয়ে কখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এ যুক্তির প্রমাণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি এলাকায় কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। অর্থাৎ উপজাতীয় রাজারা, এমনকি প্রজারা, যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো তাহলে এ এলাকায় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ নির্মিত হতো (মোঃ নূরুল আমিন ১৯৯২ : ১৪৬)।

গবেষকরা বলছেন যে, বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু আদিবাসী-সমাজ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে; বাংলার আদিবাসী বললে মূলতঃ তাদেরই বোঝায়। এদের সামাজিক পরিচয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় (সুবোধ ঘোষ ১৯৯৫)ঃ

১. কুকি : ১৯৩১ সালের জনগণনায় এদের মধ্যে ৬০৮ জন খ্রিস্টান, ২১১৭ জন প্রাকৃতিক ধর্মাবলম্বী লোক পাওয়া যায়। এদের অবস্থান একদা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলেও এরা এখন গভীর অরণ্যের দিকেই চলে গেছে। কুকিদের ঘর মাচান পদ্ধতিতে তৈরি; মেয়েরা পরপুরুষের সামনে ওড়না গায়ে দিয়ে বের হয়। বাঁশি বাজানো এদের খুবই প্রিয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. ত্রিপুরা : এদের মধ্যে 'অগ্রসর' ও 'অনগ্রসর' সমাজ আছে। ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমাজও আছে; সমতলবাসী ত্রিপুরা সমাজ বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে দীক্ষিত। ধর্মে অধিকাংশই 'হিন্দু' বলে পরিচয় দেয়। অনগ্রসর সমাজের ত্রিপুরাদের মধ্যে নাগা সংস্কৃতির আধিক্য দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরাতেই এদের অধিকাংশ বসতি হলেও ময়মনসিংহে 'টিপরা' নামে পরিচিত কিছু লোক দেখা যায়।

৩. লুসাই : লুসাই সমাজে খৃস্টধর্ম খুবই প্রচারিত হয়েছে, তবে অল্পসংখ্যক হিন্দু ও উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী আছে। এরা জনসংখ্যার দিক থেকে অতি ক্ষুদ্র।

www.pathagar.com

৪. খিয়াং : পার্বত্য চট্টগ্রামের এ উপজাতি গোষ্ঠী ধর্মে বৌদ্ধ, বাঙ্গালি হিন্দুদের মতো ধুতি পরিধান করে; ঘরগুলো মাচান পদ্ধতিতে তৈরি করে। এরা আরাকান অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী।

৫. খুমি : সর্বাত্মাবাদী ধর্মে বিশ্বাসী, সংখ্যায় অতি অল্প একটি অনগ্রসর সমাজ।

৬. ম্রো : ধর্মে বৌদ্ধ, আরাকান থেকে আগত। চেহারায় মঙ্গোলীয় ছাপ একেবারেই দেখা যায় না। পুরুষেরা মালকোচা দিয়ে ছোট লাল রঙের বা সাদা ধুতি পরে। বস্ত্রশিল্প এদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান। নিজেদের বানানো পাগড়ি পরে পুরুষেরা। দাঁত কালো করা এদের অন্যতম প্রসাধন প্রথা। অল্প বয়সের ছেলেরা কোমরে পুঁতির মালা জড়ায়, যৌবনে মাকড়ি পরে। মেয়েরা নীল রঙের ছোট ছোট ঘাগরা পরে, হাঁটু পর্যন্ত সেটার পরিধি। ম্রো স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক লজ্জাবোধের সংস্কার সাধারণ সভ্যতার সংস্কার থেকে পৃথক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে প্রকাশ্যভাবে একই স্থানে নগ্ন হয়ে স্নান করতে কোন দ্বিধা অনুভব করে না।

৭. চাকমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা বাঙ্গালি সংস্কৃতিতে দীক্ষিত একটি সমাজ। ভাষা বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা। ধর্মে এরা বৌদ্ধ। গবেষকদের মতে, বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও ভাষা প্রসারের একটি প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো চাকমা সমাজ।

১৯২৬ সালে আসামের নৃতাত্ত্বিক তথ্যের পরিচালক (Direction of Ethnography) মি. জে. পি. মিলস পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমাজের একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন; তাতে বলা হয়েছে : ১৮ শতাব্দীতে কক্সবাজার অঞ্চলের দিক থেকে এই সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। এরা আচারে-ব্যবহারে ও সংস্কৃতিগত বিষয়ে খুবই বাঙ্গালি হয়ে গেছে। এদের বলা যায় 'most Bangalised Tribe'. এদের ভাষা মূল বাংলাভাষারই একটি উপভাষা বা Dialect. চেহারার মধ্যে মঙ্গোলীয়ত্বের খুব কম লক্ষণ দেখা যায় (Show little trace of their partially Mongol Origin)। সম্পন্ন চাকমা পুরুষ বাঙ্গালির মতোই ধুতি পরিধান করে; মেয়েদের পরিচ্ছদ অবশ্য বাঙ্গালি মেয়ের পরিচ্ছদের মতো নয়, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত টকার্টের মতো রঙিন নীল বর্ণের পরিচ্ছদ তাদের পরিধেয়। যৌবনপ্রাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত মেয়েরা কোন বক্ষবাস পরে না। উদ্ধাঙ্গ অনাবৃত থাকে। যৌবনাগমনের পরে রেশমী কাপড় দিয়ে কাঁচুলির মতো করে বুক বেঁধে রাখে। বাঙ্গালি মেয়ের মতোই নাকে ও কানে অলঙ্কার ধারণ করে তারা। গলায় রূপার হাঁসুলি এবং মাথার চুলে খোঁপা করা তাদের খুবই প্রিয়।

চাকমা গ্রামগুলো নদী স্রোতের ধারে অবস্থিত। সম্পন্ন ব্যক্তিরা ইটের দালানে বাস করে, কিন্তু গরীবদের ঘরগুলো কুটির সদৃশ্য। চাকমা সমাজ কতগুলো 'গোজা'তে (clan) বিভক্ত। পূর্বে প্রত্যেক গোজার একজন দেওয়ান বা প্রধান ছিল; প্রতিটি গোজাকে বলা হতো মৌজা। ব্রিটিশ আমলেই দেওয়ান শাসিত গোষ্ঠীগত জীবনচর্যার প্রথা বিনষ্ট হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ধর্মে চাকমারা বৌদ্ধ: কিন্তু ধর্মগত আচারে বৌদ্ধত্বের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়না। যতদূর জানা যায়, ব্রিটিশ আমলেই কালিন্দি রানী নামে চাকমা সমাজের এক রানী সকলকে বৌদ্ধ হবার নির্দেশ দেন। বর্তমানে চাকমা সমাজে একজন মাত্র পুরোহিত দেখা যায়। ১৮ শতাব্দীতে চাকমা সমাজে কিছু কিছু লোক মুসলমান হয়েছিল। চাকমা রাজা এবং সর্দারেরা ধর্মে মুসলমান না হয়েও সে সময় মুসলমান নাম গ্রহণ করেছিল। পরে অবশ্য চাকমাদের মধ্যে হিন্দুত্বের অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে।

কালিন্দি রানীর আমল থেকে প্রচলিত যে চাকমা সমাজে শুধুমাত্র রাজার ঘরের মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথা থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত প্রথম ব্রিটিশ অফিসার লিউইনের সঙ্গে (Lewin) যেদিন কালিন্দি রানী সাক্ষাৎ করেন, সেদিন তিনি ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকেছিলেন। সেই থেকে পর্দা বা ঘোমটা প্রথা রাজবাড়ির মেয়েদের মধ্যে চলে আসছে।

চাকমাদের দরিদ্র শ্রেণী কপ্‌নির মতো ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। চাকমা সমাজ লাঙ্গল প্রথায় কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়েছে। মেয়েরা সুতো কাটতে ও বস্ত্র বুনতে পারদর্শিনী। এদের তাঁত ভারতীয় তাঁতের মতো নয়, ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের তাঁতের মতো।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাপর যেসব উপজাতি আছে তাদের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি: তদুপরি তথ্যের অভাব, পরস্পর বিরোধী তথ্য, মনগড়া কাহিনী প্রভৃতি সঠিক বিবরণ ও ইতিহাস সন্ধানের পথে বড় বাঁধা।

বর্তমান উপজাতিদের পার্বত্য অঞ্চলে আগমনের ইতিহাস কমবেশি পাঁচশ বছরের কিছু বেশি। এর আগের ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য নেই। একটি সূত্র মতে, চাকমারারা প্রথম আসে ১৪১৮ সালে। চাকমা রাজা মোআন তসনি ব্রহ্মদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেন রামু ও টেকনাফ এলাকায়। এই আগমনকারী চাকমারা সেখান থেকে আদিবাসী কুকিদের বিতারণ করে। তারপর থেকে পালাক্রমে চাকমা, মারমা প্রভৃতি উপজাতি আসতে এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী বসতি স্থাপন করতে শুরু করে (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ৪৫)। এই তথ্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ নৃতাত্ত্বিক জে. পি. মিলস মনে করেন চাকমারা এসেছে ১৮ শতাব্দীতে (সুবোধ ঘোষ ১৯৯৫ :২৩৩)।

সতেরো শতকে (১৬৬৬) সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিকার করে: এবং এ অঞ্চলের শাসনভার দেয়া হয় সুবে বাংলার শাসকের ওপর। দিল্লির আধিপত্য চাকমারা মেনে নেয়নি, তারা সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে: তবে শেষের দিকে দিল্লিকে কর দিতে বাধ্য হয়। ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব মীর কাশেম খাঁর কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ভার নেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: পাহাড়িরা এটাও মেনে নেয়নি, ২৫ বছর গেরিলা যুদ্ধ চলে। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করে পৃথক জেলায় পরিণত করা হয়। শাসনের জন্য নিয়োগ করা হয় একজন তত্ত্বাবধায়ক। যথারীতি ইংরেজরা 'ভাগ-কর

www.pathagar.com

এবং শাসন কর' নীতির মাধ্যমে উপজাতি ও বাঙ্গালিদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটায়। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল বা বিধিমালা' করে ১৯০০ সালের নতুন একটি আইন জাতিগত বৈরিতাকে পুষ্ট করার পাশাপাশি পার্বত্য এলিট শ্রেণী ও রাজন্যদের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা চর্চার সুযোগ করে দেয়। সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত এলাকা' (নন রেগুলেটেড এরিয়া) ঘোষণা করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে বহিরাগতদের আগমন ও স্থায়ী বসবাস বন্ধ করে পারস্পরিক ঘৃণার বীজ ছড়ানো এবং পার্বত্য এলাকাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে রাজা, হেডম্যান ও কারবারিদের সাহায্যে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'একান্ত এলাকা' (এক্সক্লুসিভ এরিয়া) ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে যাবার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অংশ করে দিয়ে যায়। কিন্তু পাহাড়িরা মেনে নেয়নি, রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় আর বান্দরবানের ব্রহ্মদেশের পতাকা উড়তে থাকে, সামরিক অভিযান করে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬২ সালে 'একান্ত এলাকা'র বদলে 'উপজাতি এলাকা' এবং আবার ১৯৬৪ সালে 'উপজাতীয় এলাকা' লোপ করে ১৯০০ সালের বিধি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে পার্বত্য রাজারা পাকিস্তানের পক্ষে থাকে, মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ের পর সন্দেহ করে পাহাড়িদের। স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে শুরু হয় নতুন রক্তাক্ত ইতিহাস (Syed Murtaza Ali 1988: 136-8)।

www.pathagar.com

সবুজ পাহাড়ে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা

প্রকৃতির লীলা নিকেতন পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পারতো প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড; হয়ে গেলো অগ্নিগর্ভ। শান্তি যেখানে ছিল স্বাভাবিক, সেখানেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো বিদ্রোহ, অশান্তি, হানাহানি, রক্তপাত...। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আর ডাকা সম্ভব হলো না নিজস্ব নামে; ডাকতে হলো অন্য নামে : 'The Fearful State' (S. Mahmud Ali 1993); 'সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা' (হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৭); 'The Hitch in the Hills' (Syed Murtaza Ali 1988)। সৌন্দর্যের রানী পার্বত্য জনপদের শান্ত সমাহিত চেহারার বদলে চোখে ভেসে উঠতে লাগলো বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত এক বিভীষিকাময় অঞ্চল।

পাহাড়ে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় মানুষের গর্জে ওঠার পেছনে একটি নয়, অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। মূলত ষাট দশকে দানা বেঁধে ওঠা পার্বত্য বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন সত্তর দশকে শাসক গোষ্ঠীর অবিমিষ্যকামীতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়, তখনই আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে সংকটগুলো ভেসে ওঠে। কিন্তু পার্বত্য বিদ্রোহ একদিনে কিংবা একটি মাত্র ঘটনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণা করা মোটেও সঙ্গত হবে না। পাহাড়িদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী যে বঞ্চনা, শোষণ ও নিপীড়ন করা হয়েছে; তার স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশই ছিল সাম্প্রতিক বিদ্রোহের উৎসমুখ। শোষণ যেমন নীতি নির্ধারক মহল থেকে হয়েছে; তেমনি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও। বাঙ্গালিদের প্রতি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মনে যে ধারণা যুগ যুগ ধরে মেলামেশার ফলে বিদ্যুতের অক্ষরে অংকিত হয়ে আছে, সেগুলোর সমষ্টিকরণ করলে এই দাঁড়াবে: বাঙ্গালিরা চোর, প্রতারক, লম্পট; তাদের স্ত্রী এবং কন্যা সন্তানেরা বাঙ্গালিদের কাছে নিরাপদ নয়। তারা কৌশলে তাদের ভূসম্পত্তি দখল করে নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ঠকায়। তাদের কাছ থেকে জিনিষ কেনার সময় ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে টাকা ধার দিয়ে চড়াসুদে আদায় করে সর্বস্বান্ত করতে বাঙ্গালিদের বাঁধে না (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ১১)।

অরণ্য জনপদে বাঙ্গালিদের বহু নির্মম শোষণের ঘটনা থেকে পাহাড়িদের মনে বাঙ্গালি বিদ্বেষী মনোভাব জন্ম নিয়েছে; বহু দিনের প্রবঞ্চনায় তৈরি হয়েছে স্থায়ী

www.pathagar.com

হিংসা ও ঘৃণা। কেউই একই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষগুলোকে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর মেলবন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়নি। নিলে এমনটি হতো কি-না সন্দেহ। তার বদলে আমরা যে গভীর শোষণের ও বঞ্চনার কথা শুনি, সত্যিই ভয়াবহ। একটিমাত্র উদাহরণ দেয়া যাক : অনেক দিন আগে হেমন্ত কুমার নামে এক মহাজন একটা ইলিশ মাছ হার হালে পাতানো চাকমা বন্ধুকে দিয়ে বললো, বন্ধু এটা পদ্মার ইলিশ, তোমার জন্য এনেছি, ঝোলে-ঝালে রান্না করে খাও। অমৃতের স্বাদ পাবে। চাকমা বন্ধুটি বললো, তুমি ঠিকই বন্ধুর কাজ করেছো। মাছটা তো তুমি কষ্ট করে এনেছ, বলো কত দাম দিতে হবে। হেমন্ত বাবু দাঁতে জিভ কেটে বললেন, বন্ধু তুমি আমাকে এতো কমিনা মনে করো কেন, আমি তোমার কাছে ইলিশ মাছের দাম চাইবো! মাছটা আমি তোমাকে উপহারই দিলাম। বছরে বছরে শুধু তুমি এক আড়ি (১০ কেজি) করে ধান দেবে। হেমন্ত বাবু যতোদিন বেঁচেছিলেন এক আড়ি করে ধান প্রতি বছর বন্ধুর কাছে আদায় করেছেন। হেমন্ত বাবুর মৃত্যুর পর তার ছেলে বন্ধু পুত্রের কাছ থেকে উপহার দেয়া ইলিশ মাছের শুল্ক ঠিকমতো আদায় করেছে। নাতির আমল যখন এলো চাকমাটির নাতি বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলো, একটা ইলিশ মাছ দিয়ে তিন পুরুষ ধরে এক আড়ি ধান আদায় করছো, তোমার ইলিশ মাছের দাম কতো। হেমন্ত বাবুর নাতি হিসেব করে জানালো বর্তমানের হিসেবে ছয় টাকা চৌদ্দ আনা। তখন নাতি চাকমা ছয় টাকা চৌদ্দ আনা নগদে শোধ করে বললো আগামী বছর থেকে আর আসবে না। পার্বত্য উপজাতিদের প্রতি যে শোষণ তা শুরু হয়েছে অনেক অনেক আগে। শান্তিবাহিনী গঠিত হওয়ার আগে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ভারত-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে, কাপ্তাই বাঁধ চালু হওয়ার আগে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ার আগে, নওয়াবেরা বাংলার মসনদে আসীন হওয়ার আগে, মুঘলেরা জঙ্গল মহাল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্পাস মহল বলে চিহ্নিত করার আগে, কতো আগে আমি বলতে পারবো না। যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম অনুসারে রণরক্ত সফলতার মধ্য দিয়ে শক্তিমান জনগোষ্ঠীর কাছে মার খেয়ে দুর্বল মানবগোষ্ঠী একটেরে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহের ভাগ্যও তার চাইতে বিচ্ছিন্ন নয় (আহমদ ছফা : ১৯৯৮ : ১২)।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শোষণ যখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীক রূপ পরিগ্রহ করে তখন রুখে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প থাকে না। পাকিস্তানিরা ২৫ বছরের শাসন-শোষণে শুধুমাত্র বাঙ্গালিদের ওপর জুলুম করেই ক্ষান্ত হয়নি, ব্রিটিশদের মতো তারাও এমন একটি কাজ করে গেছে, যাতে বাঙ্গালি-পাহাড়ি সংঘাত জেগে থাকে। ব্রিটিশরা করেছিল 'ডিভাইড এন্ড রুল': অর্থাৎ 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি। যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের বিভক্ত করে নিবিঘ্ন রেখেছিল শাসন। পাকিস্তানিরাও পাহাড়িদের জীবন অন্ধকার করে পূর্ব বাংলাকে উজ্জ্বল করার 'মাছের মায়ের পুত্র শোক' নীতি গ্রহণ করে ভাব ধরেছিল যে তারা বাঙ্গালির স্বার্থে অনেক কিছু করছেন। অর্থাৎ কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশকে আলোকিত করার সাথে সাথে পাহাড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্বেষের

www.pathagar.com

কালো অন্ধকার। বাংলাদেশ আলোকিত হলো আর পাহাড়িদের ঘরবাড়ি অতল জলে তলিয়ে গেলো। বাঙ্গালিদের খুশি করার নাম করে পাকিস্তানিরা সুকৌশলে উপহার দিল একই অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর গোপন ক্ষোভ। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান তাঁদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়, জলে ডুবিয়ে দেয়: পাকিস্তানের জন্য যা ছিল বিদ্যুৎ, তাঁদের জন্য তা ছিল বিপর্যয়। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে গিয়ে ডুবে যায় তাঁদের বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি এবং বাড়িঘর: ৫৪০০০ একর বা ৩৫০ বর্গমাইল উর্বর জমি (যা ছিল সমগ্র পার্বত্য এলাকার চাষযোগ্য ভূমির ৪০% ভাগ) হারিয়ে যায় জলে। ফলে ১৮০০ পরিবারের প্রায় ১০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয় (এম. কামরুজ্জামান ১৯৮৬ : ২৩)। তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাকিস্তান (বিঘা প্রতি পাঁচ টাকা!): তার জন্যে দেয়ার কথা ছিল ৫ কোটি টাকা, তবে দেড় কোটির বেশি টাকা দেয়া হয়নি। ওই টাকাও তাঁদের হাতে বিশেষ পৌছেনি, একটা বড় অংশ খেয়ে নিয়েছিল রাজনীতিবিদ ও আমলারা, আর বাকি অংশ কখনো ছাড়াই হয়নি। তার দিয়ে বিদ্যুৎ আসতে দেখে উল্লাসিত হয়েছিল বাঙ্গালিরা, একটি বিশাল কাজ করেছে ভেবে নিজেদের প্রশংসায় মুখর হয়েছিল সামরিক শাসকেরা, এবং সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল উদ্বাস্তুদের কথা। তখন বৈদ্যুতিক তার দিয়ে শুধু বিদ্যুৎ বইতো না, দীর্ঘশ্বাসও বইতো। ষাটের দশকে পাহাড়িরা রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করতে পারেনি: তাদের প্রতিবাদ ও দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে পাহাড়ে নীরবে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিশে গিয়েছিল, দেশের সমভূমি পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২০)।

পাকিস্তানি সামরিক শাসনে পাহাড়ি ক্ষোভ প্রকাশিত হতে পারেনি, তা পরে সুযোগ মতো ঠিকই বিস্ফোরিত করেছিল তারা: কখনই ভুলেনি তারা কাপ্তাই ট্র্যাজেডির দুঃসহ স্মৃতি। এমনকি ১৯৮৪ সালের শেষের দিকেও উপজাতীয়দের কণ্ঠে শোনা যায় : I have not been able to construct a house like the one built by my ancestors and which is now under the water of the Kaptai Lake. I now live in a makeshift thatched house (Syed Anwar Husain 1991 : 440). শুধু তাই নয়, ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান যখন পার্বত্য অঞ্চলে পরিদর্শনে যান, তখনও মনের গোপন ক্ষোভ প্রকাশ করতে উচ্চকিত হয়েছিলেন তাঁরা : The vast expanse of water captured by the Dam provides a scene which impresses every visitor with its beauty. But could anybody have thought that this immense body of water is to some extent filled with the tears of the local people? Through the cables of the electric line not only current flows but also the nights of grief (মোঃ নুরুল আমিন ১৯৯২ : ১৪০)।

কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্টি করেছিল ব্যাপক সামাজিক ক্ষোভ: ব্যক্তিগত জীবনে এনেছিল বেদনার দুর্বিসহ অধ্যায়। কাপ্তাই বাঁধ চালু হওয়ার পূর্বের ব্যাপার, রাঙ্গামাটি শহর ছিল কর্ণফুলী নদীর তীরে। নদীর জলস্তর থেকে বাজারের উচ্চতা ছিল সত্তর আশি হাতের মতো। বাঁধ যখন চালু হলো বাজার পানিতে ডুবে গেলো।

www.pathagar.com

আরো একশ হাত উঁচু জায়গায় সরিয়ে নিতে হলো। সে জায়গাও পনির তলায় চলে গেলো। আরো দূরে আরো উঁচুতে সরিয়ে নিতে হলো বাজার। কাপ্তাই বাঁধ পাহাড়িদের জীবনে কি রকম মারাত্মক অভিশাপ বয়ে এনেছিল, সে বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা দেয়ার জন্য ক্রমাগত বাজার স্থানান্তরের বিষয়টা উল্লেখ করলাম। আমার স্বচক্ষে দেখা গৃহহারা পাহাড়িদের দু'একটা খণ্ডচিত্র এখানে তুলে ধরতে চাই। এক মাঝবয়সী মহিলাকে দেখলাম নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটে যাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে একটি নারকেলের শলার ঝাড়ু, আরেক হাতে মাটিশুদ্ধ একটি বারোমেসে বেগুনের চারা। এখানে বলে রাখা অন্যায় হবে না, পাহাড়ি এলাকায় নারকেলের ঝাড়ু বড়ো সহজলভ্য বস্তু নয়। আরেক মহিলাকে দেখলাম, তিনি একটা মুরগি এবং একটি কুকুরের বাচ্চাকে কোলের কাছটিতে নিবিড়ভাবে ধরে পাহাড়ি পথে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁদের চোখের যে অসহায় দৃষ্টি আমি দেখেছি, সারা জীবনে তা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ১৩)।

কাপ্তাই ট্র্যাজেডির সঠিক পুনর্বাসন ও মানবিক ব্যবস্থাপনা করা গেলে অবস্থা অন্য রকম হতে পারতো। পাকিস্তানি শাসকদের বিবেচনায় পাঞ্জাবিদের স্বার্থের বাইরে অন্য কোন বিষয়ই স্থান পায়নি: তাদের দূরদৃষ্টিও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে পূর্বদিকে অগ্রসর হবার মতো উদার ছিল না: তদুপরি তাবৎ পূর্ব বাংলাই ছিল তাদের কাছে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ'। সেই উপনিবেশের প্রান্তিক অঞ্চলের স্বার্থ দেখার মতো মনোযোগী পাঞ্জাবিরা হবে, এমন আশা করাও সম্ভব হয়: কারণ শাসক ও শোষণের কাছে অঞ্চল-জাত-ধর্ম অর্থহীন। তারা শুধু জানে নির্বিঘ্নে শোষণ করার বর্বর পদ্ধতি ও সেই পদ্ধতির বর্বরোচিত ব্যবহার।

পাকিস্তানিদের কাপ্তাই নীতি পাহাড়িদের একদিকে যেমন নির্যাতিত করেছে, অন্যদিকে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতেও সাহায্য করেছে। A section of the Hill people however is of the opinion that Kaptai makes a watershed in the development of the political consciousness among the Hill people. The sufferings and loss of their land had forced them to take to education. It was a period of intense nationalist agitation in East Bengal. The total exclusion of the Hill people from this movement and the lack of sympathy of the Bengalis towards the economic plight of the Hill people only made them conscious of their separateness from the Bengalis (Amena Mohsin 1997 : 105).

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে পাহাড়িদের উদ্বাস্তু বানানোর পাশাপাশি পাকিস্তান আমলে এমন কিছু কার্যক্রম নেয়া হয় যাতে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩ সালে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাগজ কল কর্ণফুলী পেপার মিল তৈরি করে পার্বত্য সম্পদের ব্যাপক ও একচেটিয়া ব্যবহার শুরু হয়। কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ, নরম কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ। অথচ সেই কলে শতকরা মাত্র এক ভাগেরও কম চাকরি দেয়া হয়

www.pathagar.com

পাহাড়িদের। কাগজ কল বানানোর ফলে মারমা জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হয়, তাদের সরিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র। বর্তমানে মিলের আশপাশে কোন আদিবাসী বসতি নেই। যারা বাস করছে সকলেই অভিবাসী বাঙ্গালি (Amena & Imtiaz 1996 : 275-276)।

বস্তুত পাকিস্তানি আমলে কাপ্তাই বাঁধ চাকমাদের এবং কর্ণফুলী কাগজ কল মারমাদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করে; পার্বত্য বনজ সম্পদের ওপর পাহাড়িদের একাধিপত্য ক্ষুণ্ন করা হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালি বসতি স্থাপন ও তাদের সুবিধা বন্টন কার্যক্রম চলে। ফলে নানাভাবে নির্যাতিত পার্বত্য জনগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রীয় মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তাদের মধ্যে দানা বাঁধে পার্বত্য জাতীয়তাবাদ। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে কঠোর সামরিক শাসনে পাহাড়িরা আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি; তাছাড়া সে সময় ব্যাপক জনগোষ্ঠী বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের দাবিতে এতই মুখর ছিল যে, অন্য দাবি বিকশিত বা প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের গণআন্দোলনের ব্যাপারেও পাহাড়িদের বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। কারণ : The Hill people could only blam the Bengalis for their miseries. It is no wonder then that they remained apathetic towards the Bangladesh Liberation movement which was viewed by them as a struggle of the Bengalis against the West Pakistanis (Amena Mohsin 1997 : 106).

বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন ইশারা খুঁজে পাননি। তাদের মনোভাব ছিল অনেকটা এ রকম : ক্ষমতায় পাকিস্তানিরা থাকুক কিংবা বাঙ্গালিরা আসুক আমাদের জন্যে তো সবাই এক রকম। আমরা একইভাবে শোষিত হবো। সুতরাং আমরা কেন বাঙ্গালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো? এ রকম একটা মনোভাব পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে। যদিও এ মনোভাব সকল পাহাড়ির নয়। পাহাড়িদের একাংশ তো রীতিমত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পাহাড়িদের নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করার পেছনে আরো একটি প্রভাব কাজ করেছে। রাঙ্গামাটির চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ছিলেন বার্মায় অর্থাৎ বর্তমান মায়ানমারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ওপর রাজকীয় প্রভাব পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ১৬)।

জাতির জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সরল মানুষেরা, বা তাদের প্রধানেরা : ১৯৪৭-এ তাঁরা পাকিস্তান চাননি, কিন্তু তাঁরা পড়েন পাকিস্তানে; আবার ১৯৭১-এ তাঁরা বা তাঁদের বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ চাননি, বা সমর্থন করেননি; চান পাকিস্তান, সমর্থন করেন পাকিস্তানকে। নেতারা জাতিকে কতোটা ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, তার উদাহরণ পাই পার্বত্য চট্টগ্রামে। তবে ১৯৪৭-এর ব্যাপারটিকে ঠিক ভুল বলতে পারি না, এটাকে বলতে পারি

www.pathagar.com

নিয়তির পরিহাস: তাঁদের পক্ষে ভারতকে চাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেন, যোগ দিতে চান ভারতের সাথে: এমনকি কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি চাকমা প্রতিনিধিদল বোম্বাই, দিল্লি ও কলকাতায় গিয়ে গান্ধী, কৃপালিনি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, বল্লবভাই প্যাটেলের সাথে দেখা করে ভারতের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করে: এবং তাঁরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তানি স্বাধীনতার পর চাকমারা কয়েক দিন ধরে রাঙ্গামাটিতে উড়োন ভারতের পতাকা, আর বান্দরবানে মারমারা উড়োন ব্রহ্মদেশের পতাকা: এবং পাকিস্তানি বেলুচবাহিনী অনতিবিলম্বে দমন করে তাঁদের বিদ্রোহ। ১৯৭১-এ বেদনাদায়ক ভুল করেন চাকমা ও মারমা নেতারা ও রাজারা: তরুণরা অনেকেই যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু সমাজপতিরা মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করে সমর্থন করেন পাকিস্তানকে। ত্রিপুরারা অবশ্য যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, মানিকছড়ির মোং রাজা মোং প্রু সাইন চৌধুরীও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন; কিন্তু সাধারণভাবে পাহাড়িরা ছিলেন পাকিস্তানের পক্ষে। কী করে তাঁরা এটা করতে পারলেন? যে চাকমারা ক্ষুব্ধ ছিলেন পাকিস্তানের ওপর, যে লারমা ভাইয়েরা ছিলেন মার্ক্সবাদী, ভাবছিলেন পাকিস্তান থেকে মুক্তির কথা (ত্রিবিদ রায় আর অউং শু প্রুর মতো রাজারা না হয় নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে দালাল হয়েছিল পাকিস্তানের), তারা কেন সমর্থন করলেন পাকিস্তানকে? স্বাধীনতার পর তারা জাতিগতভাবে পড়েন মুক্তিবাহিনীর রোষে– নেয়া হয় নানা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ, তাই চাকমা ও মারমারা উল্লাসের সাথে উপভোগ করতে পারেননি স্বাধীনতার সূচনার সময়টি (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২১-২২)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অতি দ্রুত একটি সংবিধান প্রণীত হয় এবং সংসদীয় সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার ও মানব স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে: ১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা, অনুচ্ছেদ ১৯-এ সুযোগের সমতা, ২০-এ কর্মের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে (মোঃ শাহআলম ১৯৯৬)। অথচ পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, The Bangladesh Constitution did not make any provision for the CHT. for did its first national budge of 1973 make any developmental allocations for the CHT region (Amena Mohsin 1997 : 110).

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সংবিধানে কোন বিধান এবং বাজেটে কোনরূপ বরাদ্দ না রাখা ছাড়াও স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান শেখ মুজিব পাহাড়িদের কোন দাবি না মেনে বলেন যে 'যা বাঙ্গালি হইয়া যা' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ১৮)। শেখ মুজিব তাঁর প্রথম ও শেষ পার্বত্য সফরে গিয়ে ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটির

www.pathagar.com

এক জনসভায় বলেছিলেন : From this day onward the tribals are being promoted into Bengalis (সিদ্ধার্থ চাকমা ১৯৮৬ : ৯)।

১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারুবিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একদল উপজাতীয় তাঁদের দাবি নিয়ে উপস্থিত হন মুজিবের কাছে; তারা হতাশ হন; এর কিছুদিন পর ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজা মং প্রু সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে সাত জনের আরেকটি দল চার প্রস্থ দাবি নিয়ে আসেন মুজিবের কাছে, কিন্তু দেখা না পেয়ে ফিরে যান, তবে রেখে যান তাঁদের দাবিগুলো; আর ২৪ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ওই দাবিগুলোই আরো বিস্তৃতভাবে পেশ করেন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণেতাদের কাছে। তাঁর মূল দাবিগুলো ছিল (Selina and Ehsanul 1990 : 44-46) :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. পার্বত্য আদিবাসী জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. পার্বত্য আদিবাসী রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

শেখ মুজিবের ঘোষণা, মানবেন্দ্র লারমার দাবি প্রত্যাখ্যান, ভারতীয় সৈন্যের দীর্ঘকাল পার্বত্য অঞ্চলে উপস্থিতি পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে আতংকিত করে তোলে। তাঁরা মনে করতে আরম্ভ করেন শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তাঁদের প্রতি সংশয় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এ ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে চরমপন্থী নিষিদ্ধ রাজনীতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা বাস করতে থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার একটি পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সর্বহারা পার্টির প্রয়াত নেতা সিরাজ সিকদার পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ব্যাপক গেরিলা সংগ্রামে নিয়ে আসার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে উদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা তাঁর কবিতার বই 'জনযুদ্ধের পটভূমিতে' অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সর্বহারা পার্টির কর্মীরাই প্রথম পার্বত্য জনগোষ্ঠীর তরুণদের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর দীক্ষাদান করে। সে সময়ে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে চীনপন্থী রাজনীতির একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পার্বত্য জনগোষ্ঠীর নেতারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাস করে সেগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। প্রয়োজনবোধে সেগুলোতে যোগ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সমগ্র বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে তাঁদের স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন, এ কথা সকলে না হলেও অনেকেই বিশ্বাস করতেন (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ১৮)।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান আমলের নির্যাতন ও নিপীড়ন পাহাড়িদের ভাগ্য থেকে দূর হয়নি। পাহাড়িরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের দাবিগুলো সরকারের নজরে আনার জন্য : প্রথমেই তারা বিদ্রোহের পথ

www.pathagar.com

বেছে নিয়েছিলেন, এমন ধারণা ঠিক নয়। তারা চেয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসন এবং বাঙ্গালি রাষ্ট্র কাঠামোয় নিজস্ব জাতীয়তা ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার। কিন্তু সরকার প্রধান তাদেরকে বাঙ্গালি হয়ে যাবার উপদেশ দিলেন। স্বাভাবিক কারণেই শেখ মুজিবের এই আদেশ পালন করা পাহাড়িদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; প্রাকৃতিকভাবেই কারো পক্ষে সম্ভব নয় নিজের জাতীয় পরিচয় মুছে ফেলা বা সংস্কার করা। খসড়া সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার সময় পাহাড়িদের সংসদ সদস্য ও নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ক্রুদ্ধস্বরেই বলেছিলেন : 'আমি একজন চাকমা। একজন মারমা কখনো চাকমা হতে পারে না, একজন চাকমা কখনো ম্রো হতে পারে না এবং একজন চাকমা কখনো বাঙ্গালি হতে পারে না। আমি চাকমা। আমি বাঙ্গালি নই। আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক, বাংলাদেশী। আপনারাও বাংলাদেশী, তবে জাতি হিসেবে আপনারা বাঙ্গালি। উপজাতীয়রা কখনো বাঙ্গালি হতে পারে না' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ১৮-১৯)। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে তিনি আরো বলেছিলেন : 'I come from an economically backward region of Bangladesh...During the British and Pakistan period we were terated like object of Zoo...in the new state of Bangladesh we had expected a change in our fate...but to our utter dismay this budget has made no provision for our development...I don't forsee any change in our fate' (Parliament Debates 1973 : 662-663). স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে পাহাড়িরা স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আশা করেছিলেন; সেজন্য তাঁরা সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন; চেয়েছিলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলের শোষণের অবসান; কিন্তু সকল আশাই ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের কোন আশাবাদী ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যক্রমে। এ হতাশার কথা তাঁরা জাতীয় সংসদের মতো সর্বোচ্চ দরবারে উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ রেখেছেন।

বস্তুতপক্ষে, শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের চার দফা দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের 'এক সংস্কৃতি' ও 'এক ভাষানীতি' নেয়ার ফলে উপজাতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। যার ফলে জন্ম নেয় জুম জাতীয়তাবাদের। এই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হলেন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। পাহাড়িদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে লারমা ১৯৭২ সালের ১৬ মে গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' (Md. Nurul Amin 1988-89 : 114)। এই সংগঠনকে বলা হয় মাওবাদী রাজনৈতিক দল 'রাঙ্গামাটি কম্যুনিস্ট পার্টি'র বাহ্যিক রূপ। ১৯৭২ সালেই দেখা দেয় আরেক নতুন তরুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা প্রীতিকুমার চাকমা, যিনি আবার সক্রিয় করে তোলেন পাহাড়ি ছাত্র সমিতিকে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি খাগড়াছড়ির ইটছড়ির জঙ্গলে বিকশিত হয় 'শান্তিবাহিনী'-'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সশস্ত্র শাখা, যার নাম রাখা হয় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার সহোদর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ডাক নাম শান্তি বা শন্তু অনুসারে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' হচ্ছে পাহাড়িদের 'সিনফেন', আর 'শান্তিবাহিনী' তার

www.pathagar.com

'আইআরএ'। এখানে দেয়া শুরু হয় অস্ত্র প্রশিক্ষণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক পরিবার লারমা পরিবার: ওই পরিবারেরই দুই ভাই মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, যাঁর ডাক নাম শন্তু লারমা, পাহাড়িদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন বিদ্রোহী রাজনীতি। তাঁরা দুই ভাই সশস্ত্র বিদ্রোহেও দেন নেতৃত্ব (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২৩)।

শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভিন্নমত লক্ষ্য করা গেছে (Amena Mohsin 1997 : 56-58)। সেখানে দেখা যায় যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে নিজস্ব আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই পাহাড়িরা সশস্ত্র শান্তিবাহিনী (Peace Forces) গঠন করেন। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে চাকমা রাজা পাকিস্তানের সহযোগিতা করেন: ফলে পাহাড়ের জনগোষ্ঠী মুক্তিবাহিনীর রোষানলে পড়েন। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর ১৬ জন পাহাড়ি মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। দীঘিনালা ও বরকলে আরো অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং ১৯৭১ সালের পুরো ডিসেম্বর মাসেই এমন প্রতিশোধমূলক বহু ঘটনা ঘটতে থাকে (S.A. Ahsan & Bhumitra Chakma 1989 : 967)। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মোং রাজা অবস্থাদৃষ্টে জরুরি ভিত্তিতে উপজাতি নিধনের বর্বরোচিত ঘটনা বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু উগ্র বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক সরকার উপজাতীয়দের ওপর হামলা ঠেকাতে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে অপারগতা প্রদর্শন করে। এমনকি সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পাহাড়িদের স্বীকৃতি প্রদানের ন্যায্য বিষয়টিও নাকচ করে দেয়। ফলে আঞ্চলিক অধিনায়কের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও রণবিক্রম ত্রিপুরা ও অশোকমিত্র কারবারি নামে দুইজন পাহাড়ি বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীরত্বসূচক জাতীয় পদক দেয়া হয়নি (সিদ্ধার্থ চাকমা ১৯৮৬ :৪৭)। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে যে প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারাও মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী পাহাড়ি নিধনের অবসান কামনা করে নেতার হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব পাহাড়ি নেতাদের আবেদন উড়িয়ে দিয়েছিলেন: এমনকি তিনি এও পর্যন্ত বলেছিলেন যে, যুদ্ধের পর এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক (Amena Mohsin 1997 : 57)। বাঙ্গালি মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পাহাড়িদের ওপর সহিংসতাকে পার্বত্য জনগণ স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি: শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে ফেলে যাওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্র উদ্ধার করে পাহাড়ি তরুণরা কেবলমাত্র বাঙ্গালিদেরই প্রতিরোধ করেনি: বরং গ্রামে গ্রামে বিকল্প প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ফলে তাদের নাম হয়ে যায় 'শান্তিবাহিনী' (Peace Forces)। এই ঘটনার দু'টি দিক স্পষ্ট : ১. পাহাড়িদের অস্ত্র গ্রহণের স্বেচ্ছা উদ্যোগ প্রমাণ করে পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা: এবং ২. একই সঙ্গে উদ্যোগটি, অর্থাৎ 'শান্তিবাহিনী'

www.pathagar.com

গঠন পাহাড়িদের মধ্যে একাত্মতা (Gorwth of self) জন্মায় (Asish Nandy 1983 : XV)।

মূলতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই প্রকাশ্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'-এর ধারাবাহিক পর্যায়ে সশস্ত্র ও গুপ্ত 'শান্তিবাহিনী'ও গড়ে ওঠে: একই সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা আর স্বতন্ত্র পার্বত্য সংহতি, যা 'জম্মু জাতীয়তাবাদ' নামে পরিচিত– সেটাও রূপ পরিগ্রহ করে। গবেষকদের মতে জিন্না যেখানে বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন; মুজিবও তেমনি পাহাড়িদেরকে বাঙ্গালির চেয়ে আলাদা জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বীকার না করে জম্মু জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন। পাহাড়িদের দাবি মানার বদলে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বক্তব্যকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে সেনা বিমান ও পুলিশ বাহিনীর সমন্বয়ে সামরিক অভিযান চালানো হয় পাহাড়ের অভ্যন্তরে (Mey 1984 : 114)। অবশ্য তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সেনা অভিযানের কারণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছিলেন, সামরিক অভিযান ছিল পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা মিজো বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে (Amena Mohsin 1997 : 58)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনদাবিকে অগ্রাহ্য করে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে যেতে দেয়া ও বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে বাধ্য করার জন্য স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের ভূমিকা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিকে এ যাবতকালে এককভাবে দায়ী করা প্রসঙ্গে অতি সম্প্রতি ভিন্ন ব্যাখ্যা (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮) উপস্থাপন করা হয়েছে। তাতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক অতীত কার্যক্রমের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে : বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বাঙ্গালি হয়ে দেশের সমগ্র জনগণের সঙ্গে বসবাসের বহুল আলোচিত পরামর্শদানের ঘটনা থেকে ভিন্ন অবস্থায় নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সূচনা বলে অনেকে মনে করলেও প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্নতর। এ কথা সত্যি যে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রবর্তিত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালি নামে পরিচিত হইবেন'– এ কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বান ছিল সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ। এবং জাতীয় সংহতির প্রতি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস। এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে '৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ যুদ্ধে রাজা ত্রিদিব রায় সহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষ সমর্থন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী পার্বত্য বিদ্রোহের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাসহ অপর একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পন সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য এবং হানাদার বাহিনী

www.pathagar.com

কর্তৃক বেসামরিক লোকজন নিয়ে সৃষ্ট ওদের সহযোগী সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর সদস্য পাহাড়িদের একটি অংশের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করে নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতে থাকে। তাদের এ তৎপরতা দমন করতে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সময় পর্যন্ত লাগে। এমনকি এক অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর পাহাড়ি জনগণকে 'বাঙ্গালি হয়ে' বসবাসের পরামর্শ ছিল বস্তুত তাদের প্রতি স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার তাগিদ এবং নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের (জাতিসত্তার নয়) পরিচয়বাহী। জাতির জনক হিসাবে তা ছিল সময়োপযোগী ও যথার্থ।...বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে তিনটি স্থায়ী সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অসন্তোষ মোকাবিলা এর আশু উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯৭২ সালে 'জনসংহতি সমিতি' এবং পরবর্তী বছর ৭ জানুয়ারি এর সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' প্রতিষ্ঠিত হলেও বঙ্গবন্ধুর সমগ্র শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে তদ্রুপ কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সাধারণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ থেকেই কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ও স্পর্শকাতর ঐ অঞ্চলে উল্লেখিত সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয় (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শেখ মুজিবের শাসনামলে (১৯৭২-'৭৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী কার্যকর অর্থে আত্মপ্রকাশ করেনি এবং কোন সশস্ত্র অভিযানেও অংশ নেয়নি। এর কারণ হতে পারে তিনটি :

১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৭৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি আসনেই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ও চাথোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সিমিত রায় ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রার্থী উপেন্দ্র লাল চাকমাকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে প্রধানত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সরকারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ফোরামে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও পাহাড়িদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রচুর দেন-দরবার করেন এবং নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এমনকি আপাত মুজিব বিরোধী বলে পরিচিত লারমা ১৯৭৪ সালে গঠিত দেশের একটিমাত্র দল বাংলাদেশ কৃষকশ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)-এ যোগদান করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে পাহাড়ি নেতারা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোয় আইনগত পদ্ধতিতে তাদের অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। লারমার বাকশালে যোগদান থেকে বলা যায় যে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো ক্ষমতার সাথে থেকে অবস্থার বদল ঘটানো যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের।

২. ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপজাতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে। এর আগে ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রিক শোষণের বিষয়গুলো পাহাড়ি মানসিকতায় ছিল বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত ভাবে চিহ্নিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সুযোগে পাহাড়িদের অধিকার ও শোষণ মুক্তির কথাগুলো প্রথমবারের মতো সুসংঘবদ্ধভাবে সমগ্র অঞ্চলে প্রচারিত হয় এবং একটি সামগ্রিক ঐক্যের পথ

www.pathagar.com

উন্মোচিত হয়। পাহাড়িদের ঐক্যকে ধরে রাখার জন্য সে সময়ই কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হয়ে ছিল না: পার্বত্য জনসংহতি সমিতি কেবল গঠিত হয়েছে। শান্তিবাহিনীও সদস্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। ফলে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার বা সশস্ত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবার মতো আদর্শিক প্রেক্ষাপট ও সাংগঠনিক ভিত সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান ছিল না। তাছাড়া পরবর্তীতে যারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা তখন ব্যস্ত ছিলেন সাংবিধানিক পথে দাবি আদায়ের সংগ্রামে। ফলে ১৯৭২-'৭৫ পর্যন্ত সময়কালে ব্যাপক পাহাড়ি বিদ্রোহ দেখা দিতে পারেনি।

৩. বিদ্রোহ না হবার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ভারতের অনিচ্ছা। পার্বত্য অঞ্চল, যার তিনদিকেই বস্তুত ভারত, সেখানে বিদ্রোহ করতে হলে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা ও আশ্রয় অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে বিদ্রোহীরা যদি ভারতের মদদ না পায় তাহলে তাদের সব চেষ্টা ভণ্ডুল হতে বাধ্য। (শেখ মুজিবের আমলে ভারতের আশ্রয় না পাওয়ায় বিদ্রোহ হয়নি: জিয়ার আমলে ভারতের আশ্রয় ও সমর্থন পাওয়ায় বিদ্রোহীরা বিপুল বিক্রমে উপস্থিত ছিল)। ১৯৭৪ সালে শান্তিবাহিনী ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করে: ভারত সাহায্য তো করেইনি বরং সে তথ্য জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকারকে (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২৩)।

শেখ মুজিবের শাসনামলে বিদ্রোহ না হলেও একথা স্পষ্ট যে, পাহাড়িরা সে সময় অতি সন্তর্পণে চূড়ান্ত বিদ্রোহের প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তবে কেবলমাত্র শেখ মুজিবের বাঙ্গালি হবার পরামর্শেই পাহাড়িরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এমন নয়। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বিদ্রোহের আরো অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় :

১. অভিবাসী বাঙ্গালিদের শোষণ-প্রবঞ্চনায় পাহাড়িদের মধ্যে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ জন্ম নেয়া এবং সেটা দূর না করায় প্রকট হতে থাকে:

২. পাকিস্তানি শাসকদের তিনটি নীতি পার্বত্য জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে সবচেয়ে বেশি: এগুলো হলো : ক. কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে চাকমাদের উদ্বাস্তুকরণ: খ. কর্ণফুলী কাগজকল স্থাপনের ফলে মারমাদের উদ্বাস্তুকরণ: এবং গ. উদ্বাস্তুদের যথাবিহীত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন না করে বাঙ্গালি অভিবাসন বৃদ্ধি এবং অভিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শক্তিশালীকরণের ফলে পাহাড়িদের অসন্তোষ বৃদ্ধি:

৩. মুক্তিযুদ্ধের পর ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা পূর্ণাঙ্গভাবে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিপালিত না হওয়ায় পাহাড়ি নিধনের ঘটনায় নতুন রাষ্ট্র সম্পর্কে পাহাড়িদের ভীতি সঞ্চার:

৪. শেখ মুজিবের বাঙ্গালি হয়ে যাবার ঘোষণায় ভুল বুঝাবুঝি:

৫. সংবিধান ও বাজেটে পার্বত্য বিষয়ক নীরবতায় বঞ্চিত হবার ধারণা:

৬. ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে যাওয়াসহ পাহাড়ে আরো তিনটি সেনানিবাস তৈরির ফলে সৃষ্ট মানসিক চাপে পাহাড়িদের আত্মরক্ষা ভাবনার জন্ম:

www.pathagar.com

৭. সাংবিধানিক পথে উত্থাপিত পাহাড়িদের দাবিকে গুরুত্ব না দেয়া;

৮. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের সর্বগ্রাসিতায় রাষ্ট্রের প্রবল জাতীয়তাবাদী চরিত্র গ্রহণ; জাতি একটি সাংস্কৃতিক একক আর রাষ্ট্র রাজনীতিক; এই দুইটি একাকার হয়ে গেলে চরম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে (Amena Mohsin 1997)।

স্বাধীনতার পরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পার্বত্য সমস্যা যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি, হয়তো সেসময় সেটা সম্ভব ছিলও না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিক্ষুব্ধ পাহাড়িরা দাবি আদায়ের জন্যে অবশেষে গর্জে উঠেন; পাহাড়ের সবুজ প্রেক্ষাপটে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের লাল অগ্নিশিখা।

www.pathagar.com

রক্তের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার

১৯৭৩ সালে শান্তিবাহিনী গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর এ সংগঠনের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জিয়াউর রহমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য এলাকায় বাঙ্গালি বহিরাগতদের পুনর্বাসন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরশাদ সরকারের আমলে পার্বত্য এলাকায় বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পাহাড়ি ও বহিরাগত বাঙ্গালি লোকসংখ্যার অনুপাত ৫০ : ৫০ এসে দাঁড়ায় (CHT Report 1991)। শুরু হয় রক্তের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার। সবুজ পাহাড়ের শান্ত বুকে নেমে আসে হত্যা, প্রতি-হত্যা, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ; লুণ্ঠন-নির্যাতন-সন্ত্রাস-বিভীষিকার প্রায় দু'যুগব্যাপী কালো অধ্যায়।

মুজিব সরকারের পতনের পর শান্তিবাহিনীর ব্যাপক শক্তি সঞ্চয় ও আক্রমণের পেছনে ভারতের উস্কানির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কৌশলগত কারণেই ভারত শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করে। পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা ও মিজো বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চলে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিত। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হওয়ার ফলে ভারত-বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে হুমকির সম্মুখীন রাখার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করে (মোঃ নূরুল আমিন ১৯৯২ :১৪১)।

বস্তুতপক্ষে মুজিব সরকারের পতনের পর সাংবিধানিক পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে তৎপর হওয়া মানবেন্দ্রে নারায়ন লারমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঢাকায় তখন সামরিক মদদপুষ্ট সরকার তাদের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে চিহ্নিত করে 'Islamic Republic of Bangladesh' (Stephen 1976 : 22) –এর অনুকূলে। সংখ্যালঘুদের মনে স্বাভাবিকভাবেই ভীতি সঞ্চারিত হয়। সব আশা ছেড়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা প্রবেশ করেন গভীর অরণ্যে, শুরু করেন সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে তিনি একবার জিয়ার সাথে যোগাযোগ করেন; তবে কিছুদিন পরই ভারত তাঁকে ডাকে, এবং শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে চায় (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২৪)। এমনও জানা যায় যে, মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আশ্রয়ে চলে যান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকেন (Amena Mohsin 1997 : 66)। বেশ কিছু গ্রুপকে ট্রেনিং দেয়া ছাড়াও ১৯৭৫

www.pathagar.com

সালের নভেম্বরে ভারত শান্তিবাহিনীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের দু'টি বড় ধরনের চালান দেয় (S. Kamaluddin 1980; Subir Bhaumik 1996)।

ইতোমধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীভাবে গঠন করতে সক্ষম হয়। সর্বস্তরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গঠিত হয় জনসংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি; তাছাড়া নির্বাহী পরিষদ, নীতি প্রণয়ন কমিটি, রাজনৈতিক শাখা প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে জনসংহতি সাংগঠনিক কাজকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে। জনসংহতির সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংগঠনটির সর্বোচ্চে আছে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি। পরবর্তীতে রয়েছে নির্বাহী পরিষদ; জনসংহতি সমিতির নির্বাহী পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করে এর ক. রাজনীতিক; খ. সামরিক; গ. বিচার; ঘ. অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব। রাজনীতিক কার্যক্রম আবার ১. গ্রাম পঞ্চায়েত; ২. ছাত্র ও যুব ফোরাম (যুব সমিতি); ৩. নারী সংগঠন; ৪. জুম চাষী সমিতি; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম কাঠুরিয়া সমিতি; ৬. তথ্য ও প্রচার শাখা; ৭. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্থ। জনসংহতি বিস্তারিত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে, বিচার ব্যবস্থাকে সামরিক ও বেসামরিক ভাগে ভাগ করা হয়।

জনসংহতি সমিতি শন্ত্র লারমার অধিনায়কত্বে নিয়মিত ৫ হাজার সদস্যের শান্তিবাহিনী তৈরি করে এবং আরো ১০ হাজার পাহাড়িকে সাধারণ প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখে, যাতে তাদের ডাকা হলে অস্ত্র হাতে বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিক বাহিনীর মতো কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে শান্তিবাহিনী জলপাই সবুজ উর্দি ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদ্রোহের সুবিধার্থে শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামকে সিলেট, বগুড়া, যশোর, কুমিল্লা, রংপুর ও ঢাকা– এই ৬টি ভাগে বিভক্ত করে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে সেকশনগুলো পরিচালিত হতে থাকে (Syed Murtaja Ali 1996 : 21-32)।

১৯৭৩ সালে শুরু করে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর সদস্য সংগ্রহ ও সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে শান্তিবাহিনী ৬ সেক্টরে ৬ জন সেক্টর কমান্ডার এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন করে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জালের মতো বিস্তৃত হয় শান্তিবাহিনীর গোপন নেটওয়ার্ক। ১৯৭৪ সালেই ক্ষুদ্র আকারে শান্তিবাহিনীর প্রথম অপারেশন চালানো হয় একদল পুলিশের ওপর। এতে বেশ ক'জন পুলিশ আহত হয়। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিবাহিনীর প্রথম ব্যাপক আক্রমণের খবর আসে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্য থেকে, যখন সেখানকার বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আক্রান্ত হয়। রাস্তা মেরামতের কাজে নিয়োজিত সেনা প্রকৌশল বিভাগের সদস্যদের রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে হত্যা করে শান্তিবাহিনী; নির্মাণ সামগ্রী ধ্বংস এবং অস্ত্র-গোলা বারুদ লুট করে নিয়ে যায় শান্তিবাহিনী। জঙ্গল যুদ্ধে শান্তিবাহিনীর শক্তিমত্তা ও নৈপুণ্য প্রমাণ করে তাদের প্রথম হামলার ঘটনাটি (Syed Murtaza Ali 1996 : 40)।

www.pathagar.com

তারপর একের পর এক শান্তিবাহিনীর আক্রমণ চলতে থাকে; তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় সরকারি স্থাপনা, সামরিক বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের গ্রামগুলো। বিশেষ করে গভীর জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে গিয়ে অকাতরে প্রাণ হারায় অনেক বিত্তহীন বাঙ্গালি অভিবাসী। এমন প্রেক্ষাপটে শান্তিবাহিনীকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য জিয়াউর রহমান ওই এলাকায় প্রায় এক লাখ সৈন্য মোতায়েন করেন (মোঃ নূরুল আমিন ১৯৯২ : ১৪১)। এ সময়কালে সবচেয়ে নৃশংস হামলা ছিল রাঙ্গামাটির কালামপালির ঘটনা, যাতে কমপক্ষে ১০০ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয় ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ; যে ঘটনা সরেজমিনে দেখে এসে ২১ এপ্রিল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সবিস্তারে বর্ণনা করেন তৎকালীন তিন সংসদ সদস্য, যথাক্রমে শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমা (Obserber 23 April 1980)।

এদিকে ১৯৭৬ সালের কোন এক সময় শন্তু লারমা ও চবরি মারমা আটক হন সেনাবাহিনীর হাতে;শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে আসেন প্রীতিকুমার চাকমা। ১৯৮১ সালে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে শন্তু লারমা ও চবরি মারমা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের আলাপ-আলোচনায় ছেদ পড়ে। মুক্ত শন্তু লারমা নতুন করে শান্তিবাহিনীর দায়িত্ব নিতে চাইলে প্রীতি গ্রুপের বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং শান্তি বাহিনী শন্তু গ্রুপে ও প্রীতি গ্রুপ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় শান্তিবাহিনী সরকার ও বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিদের আক্রমণের পাশাপাশি উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন শন্তু লারমার অধীনস্থ শান্তি বাহিনীর সদস্যরা প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী কমান্ডার অমৃত লাল চাকমা ওরফে বলি ওস্তাদসহ অনেককে হত্যা করে এবং প্রতিশোধ হিসাবে ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপ কয়েকজন সঙ্গীসহ হত্যা করে 'পার্বত্য জনসংহতি সমিতি'র নেতা ও শন্তু লারমার অগ্রজ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে। শন্তু লারমা শান্তি বাহিনীর পাশাপাশি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র প্রধানের দায়িত্বও পান। উপদলীয় সহিংসতার প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন শান্তিবাহিনী সদস্য আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অধিনায়ক মেজর জেনারেল এম. নূরুদ্দীন খানের কাছে অস্ত্র জমা দেয়। ২৯ জুন বাংলাদেশ সরকার ও প্রীতি গ্রুপের মধ্যে আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; তবে দলনেতা প্রীতি কুমার চাকমা আত্মসমর্পন করেননি। ধারণা করা হয় প্রীতি গ্রুপের আত্মসমর্পণের পর প্রীতি কুমার চাকমা বিদ্রোহ ছেড়ে এখন ভারতে সুখে সংসার করছেন (S. Mahmud Ali 1993; Syed Murtaza Ali 1996; হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭)। প্রীতি গ্রুপের বিলুপ্তির পর বিদ্রোহীদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের অবসান ঘটে এবং রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বে একচ্ছত্রভাবে আসীন হন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা)।

www.pathagar.com

ক্ষমতা সুসংহত করার পর সমগ্র '৮০ দশক ব্যাপীই শন্তু লারমার শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী কার্যকলাপের মাত্রা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়: সেনাবাহিনী, সরকারি ও বাঙ্গালি বেসামরিক লোকজন তাদের হামলার শিকার হন। শান্তি বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও শক্তি বাড়াতে থাকে। উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনীর হাতে সেনা প্রকৌশল সদস্যরা নিহত হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পার্বত্য অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়েছিল (Amena Mohsin 1977 : 168)। সেনাবাহিনী মোতায়েনকে একটি মিশনারী কার্যক্রম বলে প্রচার করা হয়। তাঁদের উপস্থিতিকে জাতি-গঠনের কার্যক্রম বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বিপুল বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হয়, সেনা ব্যয়ও বিপুল বৃদ্ধি পায় (Rehman 1991 : 104)।

শান্তিবাহিনীর প্রকাশ্য শাখাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতে থাকে। বিদেশে যে সেনা সদস্যরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রশংসিত হয়েছে, তারাই দেশের অভ্যন্তরে নির্যাতনের অপবাদের সম্মুখনী হন। শান্তিবাহিনীর শাখাগুলো যে সব প্রচারপত্র ও পত্রিকা প্রকাশ করে, সেগুলো পড়লে মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে বা চলছিল উনিশশো একাত্তর। তাদের বিবরণে পাওয়া যায়, সৈনিকেরা গিয়ে পাড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাইফেল চালাচ্ছে, অপহরণ করছে অখ্যাত ও বিখ্যাত মেয়েদের, উলঙ্গ করছে তাদের, এবং চালাচ্ছে অবাধে ধর্ষণ। যারা একাত্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে, তারা এসব বিশ্বাস না করে পারে না– না ঘটলেও তাদের মনে হয় এসব ঘটেছে: এসব বিশ্বাস করাই হয়ে ওঠে মানবাধিকারবাদ ও মানবতবাদ (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২৮)।

পাহাড়িদের লেখা কোন কোন বইয়ের (বিপ্লব ১৯৯৭) দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কথা : ক. ডিসেম্বর '৭৮- জানুয়ারি, ১৯৭৯, উত্তর রুমা সেনাবাহিনী ক্যাম্প সদস্য কর্তৃক দুমদুম্যার ৫০ গ্রামে হামলা, ২২ গ্রাম ধ্বংস: সুবলং উপত্যকায় হামলা। খ. ১ জানুয়ারি ১৯৮৬, শরণার্থী লঞ্চে হামলা, নিরাপত্তা সদস্য কর্তৃক ৪ রমণী ধর্ষিতা। গ. জুলাই '৮৫-জুলাই '৯৫ পর্যন্ত অসংখ্য গ্রামে গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মন্দির ধ্বংসের অভিযোগ। বইটির অনুচ্ছেদ ও পাতায় পাতায় রয়েছে হাজার হাজার অভিযোগ। অভিযোগের কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা সে প্রমাণ সকলের চোখের সামনে স্পষ্ট না হলেও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য তা ছিল যথেষ্ট। যে কারণে দেশীয় মানবতাবাদীরা তো বটেই, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে।

পাশাপাশি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো শান্তিবাহিনীর নৃশংসতা, বর্বরতা। তাঁদের ভয়াল আক্রমণের শিকার হন নিরীহ বাঙ্গালি বসতি স্থাপনকারীরা। বাঙ্গালি ছাড়াও তারা হত্যা করে সেনাবাহিনীর সহযোগী পাহাড়িদের: অপহরণ করে বাঙ্গালি, সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের। ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি তাঁরা অপহরণ করেছিল শেল তেল কোম্পানির কাজে নিয়োজিত ৫ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে।

www.pathagar.com

বিপুল মুক্তিপণ দিয়ে তাদের পরে ছাড়িয়ে আনা হয়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তারা অপহরণ করে থানচির থানা নির্বাহীকে। শান্তিবাহিনী সেতু ধ্বংস করে, বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন করে, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে উপজাতীয়দের ভারতে শরণার্থীরূপে যেতে বাধ্য করে। উল্লেখযোগ্য সহিংসতার মধ্যে ছিল ১৯৯৬ সালের ২৯ কাঠুরিয়াকে হত্যা। ১৯৮০-১৯৯১ সময়কালে শান্তিবাহিনী ৯৫২ জন বাঙ্গালি ও ১৮৮ জন পাহাড়িকে হত্যা, ৬২৬ জন বাঙ্গালি ও ১৫২ জন পাহাড়িকে জখম এবং ৪১১ জন বাঙ্গালি ও ২০৫ জন পাহাড়িকে অপহরণ করে (M. R. Shelley 1991 : 124)। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় : ১৯৯৭-এর মে পর্যন্ত মারা গেছে ১৭ জন সৈনিক, ৯৬ জন বিডিআর, ৪১ জন পুলিশ...সবমিলে ৩৪ জন; বছরে গড়ে ১৫ জন, আহত হয়েছে ৩৭৩ জন; ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫৬ জন। ...এ সময়ে অসামরিক ব্যক্তিরাই মরেছে বেশি : বাঙ্গালি ১০৫৪ জন, উপজাতীয় ২৩৭ জন; আহত হয়েছে ৫৮৭ জন বাঙ্গালি আর ১৮১ জন উপজাতীয়; অপহৃত হয়েছে ৪৬১ জন বাঙ্গালি আর ২৮০ জন উপজাতীয় (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ :৩২)।

বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ মোকাবেলার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে যত মানুষ মারা গেছে, যত রক্ত ঝরেছে, কোন পরিসংখ্যানই তার পরিপূর্ণ বিবরণ দিতে পারবে না। সংঘাত বা যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ চিত্র কেবলমাত্র বিভীষিকার সঙ্গে কল্পনা করে শিউরে ওঠা যায়; বাস্তব ক্ষতি পরিমাপ করা যায় না। একটি মতাদর্শিক আবেগের উম্মাতাল তাড়নায় মৃত্যু ও রক্তপাত অমীমাংসিত পথে বাড়তে থাকে। বিদ্রোহীর হত্যাযজ্ঞ ও জীবনদান যেমন একটি স্বপ্ন সাধনের কাংখিত প্রেরণায় বৃদ্ধি পায়; তেমনি বিদ্রোহ রোধের নামে যা কিছু ঘটে, সেসবও একটি আকাংখারই বেদিমূলে উৎসর্গীকৃত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ পাহাড়ে রক্তের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার বিস্তার লাভ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ ও রক্তপাতের প্রেক্ষপটে অর্থ একটি বড় নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। কেউ কেউ এমনও দেখতে পেয়েছেন যে...বিপুল অর্থও হয়তো তাদের বিদ্রোহ থেকে সরে আসতে দিচ্ছে না। শুরুর দিকে তাদের আনন্দের সাথে টাকা ও সব কিছু দিয়ে সাহায্য করতো পাহাড়িরা: এখন ওই দরিদ্র মানুষদের দেয়ার মতো আর টাকা নেই, আনন্দের সাথে সাহায্য করার মতো আবেগও নেই। তাই বিদ্রোহীরা চাঁদা তোলে। তারা চাঁদা হিসেবে উঠিয়ে থাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, বছরে প্রায় ২০ থেকে ৩০ কোটি; আর শান্তিবাহিনীর সাথে 'পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ', 'পাহাড়ি নারী পরিষদ'ও চাঁদা তুলে থাকে। ১৯৯২ সালে নিজেদের ঘোষিত 'যুদ্ধ বিরতি'র পর চাঁদা তোলাই হয়ে উঠেছে তিনটি পরিষদের কাজ এবং তারা এমন নিপুণভাবে চাঁদা তুলছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি কর্মচারীরাও চাঁদা দিচ্ছে এবং চাঁদা দিচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশবাসী। যে চন্দ্রঘোনার কাগজ কিনছে, বাঁশ, কাঠ বা অন্য কিছু কিনছে পার্বত্য চট্টগ্রামের, সে-ই চাঁদা দিচ্ছে শান্তিবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীকে। তারা চাঁদা তোলার যে পদ্ধতি বের করেছে, তা কর আদায়ের নিপুণতম পদ্ধতি, যার থেকে কারো রেহাই নেই। সেখানকার চাষী, ব্যবসায়ী, সরকারি

www.pathagar.com

কর্মচারী এবং সবাই নিয়মিতভাবে চিঠি পাচ্ছে চাঁদা দেয়ার, আঁকাবাঁকা বাংলা বর্ণমালায় লেখা সেই সব চিঠি, চিঠিতে অত্যন্ত উচ্চ হারে চাঁদার পরিমাণও বেঁধে দেয়া হচ্ছে, এবং নীরবে ওই চাঁদা তুলে দিতে হচ্ছে তাদের প্রতিনিধিদের হাতে। চাঁদার হার সেখানে একটু বেশিই। এই সুযোগে শান্তিবাহিনীর নামে দেখা দিয়েছে নানা বাহিনী, তারাও চাঁদা বা কর তুলছে: কর না দিয়ে উপায় নেই: না দেয়ার পুরস্কার মৃত্যু। মৃত্যু কেউ পছন্দ করে না, তাই চাঁদা দিতেই হচ্ছে। সরকারের এমন কোন শক্তি নেই, যা দিয়ে চাঁদা বন্ধ করতে পারে। শান্তিবাহিনীর উচ্চ নেতারা বছরে একবার বা দুবার বাজেট তৈরি করে: তাদের প্রত্যেক এলাকার জন্য ধার্য করে বিশেষ পরিমাণ কর। তারা কর ধার্য করে সব ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী, জেলের ওপর, তারা কর ধার্য করে বনের গাছ কাটা, সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ, কৃষির ওপর, এবং মাঝে মাঝে পণ আদায়ের জন্য অপহরণ করে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের। যেমন মে মাসে এক থানা নির্বাহীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় মায়ানমারে, দাবি করে দু কোটি টাকা; কিন্তু সেনাবাহিনী পণ না দিয়েই উদ্ধার করে তাঁকে।

১৯৯২ সালে শান্তিবাহিনী ঘোষণা করে 'যুদ্ধ বিরতি': এরপর তারা ৩৪ বার যুদ্ধ বিরতির সময় বাড়িয়েছে এবং হয়তো ১০০০ বার যুদ্ধ বিরতি লংঘন করেছে– কয়েক দিন আগেও তারা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাড়িয়েছে যুদ্ধবিরতির সময় এবং এ সময়ে চাঁদা তোলাই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান যুদ্ধ। অস্ত্র রেখে তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চাঁদা তোলায়: যুদ্ধ বিরতির সুযোগে তাদের চাঁদা তোলা হয়ে ওঠে অবাধ: কেউ তাদের বাঁধা দিতে পারে না। পাহাড়ি ও অপাহাড়িরা ভয়ে চাঁদা দিতে থাকে: সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিতে পারে না যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুসারে যে নিরস্ত্র কাউকে সেনাবাহিনী ধরতে পারবে না। রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বনভূমি'র ১৫ জুন ১৯৯৭-এর সংখ্যায় বড়ো শিরোনামে সংবাদ বেরিয়েছে যে 'খাগড়াছড়ির ঘরে ঘরে উড়ো চিঠি॥ জনমনে আতংক: এবং সংবাদে বলা হয়েছে : 'খাগড়াছড়ি জেলা শহরের ঘরে ঘরে উড়ো চিঠির কারণে জনমনে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। শহরে ও বেশ কয়েকটি গ্রামে চাঁদা দাবি করে ঘরে ঘরে উড়ো চিঠি বিলি করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী থেকে শুরু করে বিত্তশালী পরিবারসমূহকে বিভিন্ন অংকের চাঁদাপ্রদানের তারিখ নির্ধারণ করে চিঠি দেয়া হচ্ছে। নির্ধারিত তারিখে চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদেরকে অপহরণ করার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। অনেকেই ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। শান্তিবাহিনী বুঝতে পেরেছে অস্ত্র থেকে অনেক শক্তিশালী ও মনোরম অর্থ (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ২৬-২৭)।

অমীমাংসিত রক্তপাতের পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম পেয়েছে ভয়াবহ কিছু অভিজ্ঞতা: যা বাঙ্গলি, পাহাড়ি, বিদ্রোহী ও সেনাবাহিনী– সকলের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক :

ক) পাহাড়ি-বাঙ্গালি সুপ্ত অবিশ্বাস সশস্ত্র রূপ নিয়েছে।

www.pathagar.com

খ) বিদ্রোহী পাহাড়িরা উপদলীয় কোন্দলের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে।

গ) উভয় পক্ষই না জয়: না পরাজয়ের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে। (ভারত ও মায়ানমার জানে বিদ্রোহীদের বিজয়ী করে কোন লাভ নেই, বিজয়ী করা সম্ভব নয়, এবং জুমল্যান্ড বাস্তবসম্মত হবে না। র‍্যাডক্লিফও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেননি এ যুক্তিতে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অর্থনীতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পূর্ববঙ্গের ওপর নির্ভরশীল।) বিদ্রোহীরা আক্রমণ করে পালিয়ে বেড়িয়েছে, স্থায়ী কোন বিজয় পায়নি। সেনাবাহিনীও গভীর অরণ্যে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের নিধন করে পূর্ণ বিজয় পায়নি।

ঘ) চাঁদাবাজি ও অর্থের মোহ পার্বত্য বিদ্রোহী আন্দোলনের আদর্শিক স্খলন ঘটিয়েছে।

ঙ) সেনাবাহিনী যত না বিদ্রোহীদের হাতে মরেছে, তার চেয়ে বেশি মরেছে মশা ও বিরূপ প্রকৃতির কারণে: তাঁদের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে।

চ) উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও জাতীয় সংহতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

শান্তির সন্ধানে দীর্ঘ পথযাত্রা

শান্তিবাহিনীর উত্থান কিংবা তারও আগে, পাহাড়ি জনতার মধ্যে ক্রমেই যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছিল, সে সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণ বলতে গেলে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারেনি। বাঙ্গালি নিজেই তখন ছিল পাঞ্জাবিদের শোষণে নির্যাতিত এবং আন্দোলনরত। অন্য কোন জাতিসত্ত্বার দাবিকে প্রাধান্য দেয়া বাস্তবিকই সম্ভব ছিল না বাঙ্গালিদের পক্ষে। তাছাড়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পাকিস্তানি সামরিক সরকারের কোন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছিল না; তারা পাহাড়িদের ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেয়নি। সর্বোপরি '৬০-এর দশকে পাহাড়িরা নিজেরাও সংগঠিত হয়নি; তাঁদের দাবি-দাওয়া ও সংগ্রাম সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দিকনির্দেশনা পায়নি। এবং পাহাড়ি নেতাদের অধিকাংশই তখন ছাত্র-যুবক নেতা হিসেবে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে লিপ্ত ছিলেন; আর পার্বত্য রাজারা রাজপ্রাসাদে নিরাপদে অবস্থান করছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সর্ব প্রথম সকলের নজরে আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর; যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পাহাড়ি জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সংসদ ও অন্যান্য ফোরামে তাদের অতীত শোষণ-নির্যাতন উল্লেখ করে বক্তব্য রাখছিলেন এবং চাচ্ছিলেন তারা যেন স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে নিজেদের বিকশিত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের 'বাঙ্গালি হয়ে যাবার পরামর্শ' তাদের মধ্যে আপাত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল এবং তারা তাদের দাবির ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পার্বত্য জনতা তাঁদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকারকে যথেষ্ট সাহায্যকারী ও আগ্রহী হিসেবে পায়নি। তারা মনে করেন ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সরকার পাহাড়িদের দাবি মানার বদলে কোণঠাসা করেছিল প্রবল বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের রাষ্ট্রীয় চর্চার মাধ্যমে (Amena Mohsin 1997)। এমনও অভিযোগ আছে যে মুজিব সরকার কোনই মনোযোগ দেয়নি পাহাড়িদের ব্যাপারে। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নতুন তথ্য : পার্বত্য সংকুল সমস্যার মধ্যে শূন্য হাতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে অধিকতর মনোনিবেশ করায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আকাংখা ও নানা সমস্যার প্রতি যথোচিত নজর দেয়া যে সম্ভব ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা হোক,

www.pathagar.com

এরপরও তাদের আস্থায় এনে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফরম গঠন করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাঁর সদিচ্ছায় সাড়া দিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে জনসংহতি সমিতির টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য চেই খোয়াই রোজা 'স্বেচ্ছায়' এতে যোগদান করেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে এর কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের জেলা কমিটির সেক্রেটারি পদে তিনজন সিনিয়র উপজাতি নেতাকে বসানো হয়। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে নয়া সৃষ্ট বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর পদে যথাক্রমে মং ও প্রু চৌধুরী এবং মাং প্রু সেইন চৌধুরী অধিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে করণীয় সম্বন্ধে সুপারিশ পেশের জন্য তৎকালীন সচিব আবুল আহসানকে প্রধান করে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতক চক্রের হাতে নিহত হওয়ায় জাতির জনকের সকল ইচ্ছারই পরিসমাপ্তি ঘটে (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)। সন্দেহ নেই উপরোক্ত মন্তব্যে আওয়ামী লীগ দলীয় মনোভাবই উপস্থাপিত হয়েছে; কিংবা বলা যায়, প্রবন্ধকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটে আওয়ামী লীগ গৃহীত 'লাইন অব অ্যাকশন' অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধকারের মতে : ... জেনারেল জিয়ার আমলে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালির পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের অতিমাত্রায় সক্রিয় তৎপরতার ফলে উপজাতীয়দের মধ্যে বেশি করে বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মায় এবং বেশ কয়েক হাজার উপজাতি সুদস্য দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্ন একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ... সমস্যার সাময়িক সমাধানের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার কারণে জিয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্য পদক্ষেপসমূহ প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাঙ্গালির স্থলে জাতীয়তাবাদের 'বাংলাদেশী' নতুন সংস্করণকে অনেকে উপজাতি জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন হিসেবে দেখার চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মধ্যে কোন সংশ্রব ছিল না। জাতীয়তাবাদের 'বাংলাদেশী' ধারণার মধ্যে ধর্মীয় উপাদান টেনে এনে নতুন রাজনৈতিক সমর্থন-বলয় সৃষ্টিই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)।

জিয়াউর রহমানের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতির অন্যরকম ব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায় : জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতাসীন হন, তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত সামরিক শাসন জারি রাখতে হয়েছিল। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক খুনোখুনি তো ছিলই, সেনা ছাউনিগুলোতেও সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। তাছাড়া সীমান্তের ওপার থেকে চোরাগুপ্তা হামলা তাঁর সরকারকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখে। সশস্ত্র পাহাড়িরা সীমান্তের ওপার থেকে দল বেঁধে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে নাশকতামূলক কাজের

www.pathagar.com

আয়োজন করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের সরকার পুরো বিষয়টি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেন। ভারতীয় সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাহাড়িরা-গেরিলারা যদি এভাবে ক্রামাগত হামলা পরিচালনা করতে থাকে, এমন একটা সময় আসা বিচিত্র নয়, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে জিয়াউর রহমান দু'রকম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রথমত, পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র সেনাছাউনি বানালেন। দ্বিতীয়ত, সমতল ভূমি থেকে দরিদ্র বাঙ্গালি জনসাধারণকে নিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসনের ব্যবস্থা করলেন। রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট দুর্বল সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্যে অন্য এলাকা থেকে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে এসে অভিবাসনের ব্যবস্থা করতেন। একদিকে সেনা ছাউনি স্থাপন এবং অন্যদিকে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর অভিবাসনকেই জিয়াউর রহমান পার্বত্য এলাকা বাংলাদেশের দখলে রাখার একমাত্র পন্থা বলেই অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর অভিবাসন পাহাড়ি জনগণের সে বিপুল অংশটিকেও ক্ষেপিয়ে তুলছিল, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি যাদের কোন অনুরাগ বা আস্থা ছিল না। দিনে দিনে পারিস্থিতি জটিল এবং ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে।

জিয়াউর রহমানকে নানা চাপের মুখে এ রকম একটি সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তাঁর জানতে বাকি ছিল না, ভারতের তৎকালীন সরকারটি তাঁর প্রতি অনুকূল নয়। তাঁকে শারীরিকভাবে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্রের কথাও পরবর্তী সরকার ফাঁস করে দিয়েছিল (আহমদ ছফা ১৯৯৮ :২০)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান যে বেশ উৎসাহি, সচেতন ও ওয়াকেবহাল ছিলেন, কয়েকটি ঘটনা সেটা প্রমাণ করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত হবারও আগে, ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জিয়াউর রহমান চলে গিয়েছিলেন পার্বত্য অঞ্চল সফরে, সে সময় তিনি রাঙ্গামাটি শহরে উপজাতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে 'ট্র্যাইয়াল কনভেশন' নামে বিদ্রোহীদের বিকল্প শক্তি হিসেবে পাহাড়িদের একটি সংগঠন খাড়া করেছিলেন। পার্বত্য সমস্যা মোকাবিলায় জিয়াউর রহমান অনুসরণ করেছিলেন 'Carrot and stick' নীতি। এ নীতির অংশ হিসেবে একদিকে তিনি ঐ অঞ্চলের সেনাবাহিনীর 'জিওসি'কে চেয়ারম্যান করে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' (CHTDB) গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ, ট্র্যাইবাল কালচারাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, উপজাতীয়দের মধ্য থেকে (বিনিতা রায়, সুবিমল দেওয়ান, অং শু প্রু চৌধুরী) সরকারের উপদেষ্টা/মন্ত্রী নিয়োগ, রাজা ত্রিদিব রায়ের ছেলে দেবাশীষ রায়কে চাকমাদের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অপরদিকে, প্রতিরোধক/প্রতিশোধক ব্যবস্থা হিসেবে উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে বসতি, সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার, প্রচুর সংখ্যক সেনা ছাউনি

www.pathagar.com

বা অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, পরিকল্পিতভাবে নতুন বাঙ্গালি বসতি স্থাপন, পরিকল্পিতভাবে নতুন বাঙ্গালি বসতির উদ্যোগ এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা উপায়ে বিভেদ ও ভাঙন সৃষ্টি– এ সবের আশ্রয় নেন (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)।

শেখ মুজিবের আমলে গণতান্ত্রিক অবস্থায় পাহাড়িরা তাঁদের দাবি উত্থাপনের যে সাংবিধানিক অধিকার পেয়েছিলেন, সামরিক শাসন আমলে সে সুযোগ ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। পাশাপাশি পাহাড়িরা ততদিনে (১৯৭২-'৮১) সুসংগঠিত হয়ে সশস্ত্র পথে দাবি আদায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন এবং বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা শান্তিবাহিনীর জন্যে নিশ্চিত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে লিপ্ত হলেন; আলোচনার ব্যাপারটি ছিল তাদের গুরুত্ব ও আস্থার বাইরে। জিয়াও 'কাউন্টার-ইন্সারজেন্সি' বা বিদ্রোহ প্রতিরোধের সামরিক সমাধানের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিদ্রোহীদের প্রতি; পাশাপাশি ব্যাপক সংখ্যক বেসামরিক পাহাড়িদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে কিছু নিয়ন্ত্রিত সুবিধাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (CHTDB) গড়ে তুলেন, তাদের আস্থায় কিংবা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন; পরিস্থিতিকে একতরফা পাহাড়িদের দখল থেকে নিজের ভারসাম্যে নিয়ে আসতে প্রতিস্থাপন করতে লাগলেন সমতলের ব্যাপক সংখ্যক বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমানের নীতি ছিল সামরিক-অর্থনৈতিক-কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের এক বিচিত্র মিশ্রণ; যার মাধ্যমে সমস্যার কোন আশু সমাধান আসেনি; (কারণ ১৯৮১ সালে জিয়া নিহত হলে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি পরিবর্তিত হয়নি, তবে হুবহু তাঁর মডেল অনুসৃত হয়নি এরশাদ আমলে; এরশাদ শান্তিবাহিনীতে ভাঙন, উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি, ভীতি ও ক্ষমার দ্বৈত চর্চা প্রভৃতি নীতি নিয়েছিলেন।) জিয়ার কঠোর নীতি একদিকে ছিল জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে; অন্যদিকে সেগুলো ছিল চরম অমানবিক।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এই এলাকার উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; যে লক্ষ্যে আরো অনেক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাঙ্গামাটিতে গঠন করা হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড'। এই বোর্ড সামাজিক সুবিধাদির ব্যবস্থা নিমিত্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপাসনালয় নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতায়ন, টেলিযোগাযোগ, রাবার চাষ, হরটিকালচার চাষসহ বহু পদক্ষেপ নেয় (সুনীতি বিকাশ চাকমা ১৯৯১ : ১১৫)। চেষ্টা করা হয়েছিল উন্নয়ন কাঠামোয় নিয়ে এসে পাহাড়িদের বিদ্রোহের পথ থেকে সরানোর; জাতিসত্ত্বার অধিকারের দাবিতে আন্দোলনরত ব্যাপক পাহাড়ি আলোচ্য সরকারি উদ্যোগে তুষ্ট হননি এবং তাঁদের বৃহত্তর অংশ এতে সম্পৃক্ত বোধ করেননি। অশান্ত পাহাড়ে নেমে আসেনি শান্তির সুবাতাস।

www.pathagar.com

আশি দশকের প্রথম দিকে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জেনারেল এরশাদও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে মূলত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য ছাড়া এরশাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি ছিল মূলত পূর্ববর্তী নীতির মৌলিক অনুরূপ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনেতিক সমস্যা আখ্যা দিয়ে এরশাদ বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে সমস্যা সমাধান কর'র পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে এরশাদের ক্ষমতাকালীন সময় পর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউএনডিপি এবং ইউনিসেফের সাহায্যে ৪৫৬ কোটি টাকার শতাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৯-৯০) আওতায় সরকার ২৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করে। উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যে সরকার শিক্ষা খাতে বেশ খানিকটা অগ্রগতিরও সূচনা করে; নিম্নের ছক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় শিক্ষা-উন্নয়নকে নির্ণয় করা যায় :

ছক ২

পাকিস্তান আমল থেকে (১৯৪৭) ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৪৭	১৯৯১	মন্তব্য
কলেজ	০১	০৯	(তিনটি সরকারি)
মাধ্যমিক স্কুল	০১	৬২	
নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল	ছিল না	৩৩	
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০	৯৩৮	
উপজাতীয় ছাত্রাবাস	ছিল না	০৯	
রেসিডেন্সিয়াল স্কুল	ছিল না	০২	
শিক্ষার হার	২-৩%	২০% (চাকমা ৫০%)	

সূত্র : (Khaled Belel 1992)

বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেবলমাত্র শিক্ষা খাতের উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বিপুল বরাদ্দ ও উন্নয়ন সাধিত হয়। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উন্নয়ন যত না পাহাড়িদের স্পর্শ করেছে, তার চেয়ে বেশি উপকৃত করেছে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিদের। কারণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালিরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে তাদের পক্ষে নিয়েছে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ঠিকাদারি, সরবরাহসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে একচ্ছত্রভাবে সুবিধা পেয়েছে। এ জন্যেই উপজাতীয়রা বলেন :

www.pathagar.com

প্রচুর অর্থ হয়তো দেয়া হয়েছে, তবে সেগুলো হয়তো কাপ্তাই হ্রদে ফেলে দেয়া হয়েছে; পাহাড়িদের কোন উপকারে আসেনি; আর পথঘাট যা হয়েছে, তা সামরিক বাহিনীর জন্যে,পাহাড়িদের জন্যে নয় (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ : ৩২)।

এরশাদ সরকারের আমলে পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার পরও যখন উত্তেজনা কমছিল না, বিদ্রোহীরা লড়াই থেকে বিরত হচ্ছিল না– তখন প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক উদ্যোগ গৃহীত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট নিরসনের লক্ষ্যে। রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করবার উদ্দেশ্যে এরশাদ ১৯৮২ সালের ১৩ জুন শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ক্ষমার মেয়াদকাল কয়েক ধাপে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ইতোমধ্যে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে নেতৃত্বের লড়াই এবং সশস্ত্র উপদলীয় কোন্দল বিস্তৃতি লাভ করে; একদিকে লারমা ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যদিকে প্রীতি গ্রুপ এমনই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় যে বিদ্রোহের চেয়ে অন্তঃদ্বন্দ্বই প্রাধান্য পায়। লারমা গ্রুপের হাতে ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী নেতা অমৃত লাল চাকমা বা বলি ওস্তাদসহ অনেকেই নিহত হয়। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রীতি গ্রুপ একই বছর ১০ অক্টোবর জনসংহতি সমিতির নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে হত্যা করে। এ সকল কারণে সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ বাড়িয়ে এরশাদ দ্বন্দ্বে ক্লান্ত ও বিরক্ত সশস্ত্র বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এ উদ্যোগ সফল হয়েছিল। কারণ, সাধারণ ক্ষমতার মাধ্যমে প্রীতি গ্রুপকে নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়েছিল এবং প্রীতি গ্রুপের প্রায় ২৫০০ সদস্য অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছিল। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে সশস্ত্র পন্থা ত্যাগ করে।

শান্তিবাহিনীর উল্লেখযোগ্য শক্তিসম্পন্ন একটি গ্রুপকে নিরস্ত্র করার সাফল্যে এরশাদ শক্ত লারমার নেতৃত্বাধীন প্রধান অংশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ও বৈঠকের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) একে খন্দকারের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিও গঠন করা হয়। সরকারের সঙ্গে প্রথমবারের মতো শান্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'কে আলোচনায় আনা সম্ভব হয় ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর। উভয় পক্ষ বৈঠকে বসে সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত জনপদ পূজাগাংয়ে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৬টি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সীমান্তবর্তী গহীন অরণ্যের বাইরে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ পর্যন্ত চলে আসে। এসব আলোচনায় পাহাড়ি বিদ্রোহীদের পক্ষে মেজর রিপ, নীতিশ দেওয়ান, সুধা সিন্ধু খীসা, রঞ্জন বিকাশ চাকমা, স্নেহ বিকাশ চাকমা প্রমুখ অংশ নেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাহিনী সহিংস হত্যাকাণ্ডও অব্যাহত রাখে।

এরশাদ আমলে অনুষ্ঠিত ২য়তম বৈঠকে (১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭, পূজাগাং কমিউনিটি সেন্টার, চেংগি ইউনিয়ন, পানছড়ি থানা, খাগড়াছড়ি জেলা) জনসংহতি

www.pathagar.com

সমিতি পাঁচদফা দাবি উত্থাপন করে। এই দাবিগুলো হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ। যা মানলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে এক চমৎকার 'জুমল্যান্ড', যা বাঙ্গালির জন্যে নিষিদ্ধ দেশ: বাংলাদেশের ভেতরে থেকেও বিদেশ (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭ :৩৫)। জনসংহতির পাঁচ দফার মধ্যে ছিল :

১. পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা ও দেশরক্ষা, বৈদেশিক, মুদ্রা ও ভারী শিল্প ছাড়া সকল বিষয়ে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'জুমল্যান্ড' নামপ্রদান করা।

২. গণভোট ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন না করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীবাসী নয় এমন কোন ব্যক্তি যাতে বিনানুমতিতে এই এলাকায় প্রবেশ এবং বসতি স্থাপন করতে না পারে তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

৩. ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট হতে যারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে এবং স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়া। জনসংহতির সদস্যদের বিরুদ্ধে দেওয়া মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা বিনা শর্তে প্রত্যাহার করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং এই এলাকার উন্নয়নকল্পে শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম জনগণের জন্যে নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

৫. সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন ও আটককৃত সকল জুম নরনারীকে বিনা শর্তে মুক্তিদান এবং সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করা।

বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় জনসংহতির পাঁচ দফা দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না: দাবিগুলোর মধ্যে ছিল বিচ্ছিন্নতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। জনসংহতির দাবিনামাকে বাংলাদেশ সরকার শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে ১৯৮৮ সালে জেলা পরিষদের ভিত্তিতে নয় দফা রূপরেখা প্রদান করে। জনসংহতি সরকারে প্রস্তাব না মেনে পাঁচ দফার সঙ্গে আরো ৩০ দফা দাবি পেশ করে (ইত্তেফাক ১৯৮৮)।

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সিদ্ধান্তহীন আলোচনার প্রেক্ষাপটে এরশাদ পাহাড়ি জনগণের এক অংশের সমর্থন নিয়ে ১৯৮৯ সালের মার্চে জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' বিল পাস করে (পার্লামেন্ট এক্ট নং ২৮.২.৮৯)। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। প্রতিটি পরিষদেরই চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতি এবং এতে বিভিন্ন উপজাতীয় অংশগ্রহণ রাখা হয়। ৩০ সদস্যের ২০ জন হবেন উপজাতি আর ১০ জন অউপজাতি। জেলা প্রশাসকগণ হবেন পরিষদের সদস্য সচিব আর চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

হবেন উপমন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন। নির্বাচনের মাধ্যমে এই পরিষদ গঠিত হবে। নিম্নের ছক থেকে স্থানীয় সরকার পরিষদের গঠন কাঠামো অনুধাবন করা যাবে :

ছক -৩
তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের গঠন

নির্বাচিত উপজাতিসমূহ	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান
চেয়ারম্যান (অবশ্যই উপজাতি সদস্য)	০১	০১	০১
চাকমা	১০	০৯	০১
মারমা	০৪	০৬	-
তনচংখ্যা	০২	-	০১
ত্রিপুরা	০১	০৬	-
লুসাই	০১	-	-
পাংখু	০১	-	-
খিয়াং	০১	-	-
মারমা ও খিয়াং	-	-	১০
মুরং	-	-	০৩
ত্রিপুরা ও উখাই	-	-	০১
বোম, পাংখু ও লুসাই	-	-	০১
খুম	-	-	০১
চক	-	-	০১
মোট	২১	২২	২০
বাঙ্গালি	১০	০৯	১১
সর্বমোট	৩১	৩১	৩১

সূত্র : (M.R Shelley 1992 : 143)

পরিষদকে ২২টি বিষয়ে ক্ষমতা প্রত্যাপন করা হয় : ১. আইন-শৃঙ্খলা: ২. উন্নয়ন সমন্বয়: ৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা: ৪. স্বাস্থ্য: ৫. জনস্বাস্থ্য: ৬. মৎস্য: ৭. কৃষি ও বন: ৮. গবাদি পশু সম্পদ: ৯. সমবায়: ১০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: ১১. সমাজকল্যাণ: ১২. সংস্কৃতি: ১৩. সড়ক ও সেতু: ১৪. বিনোদন, ক্রীড়া ও উদ্যান: ১৫. বিশ্রামাগার: ১৬. ফেরি: ১৭. সরকারি উন্নয়ন বাস্তবায়ন: ১৮. যোগাযোগ: ১৯. পয়ঃনিষ্কাশন: ২০. স্থানীয় বহুমুখী উন্নয়ন: ২১. ধর্ম ও নৈতিক বিষয় এবং ২২. ভূমির ওপর স্থানীয় কর্তৃত্ব। পরিষদকে নিজস্ব বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতাও দেয়া হয় (M. R. Shelly 1992 : 143-145)।

তিনটি পার্বত্য জেলার জন্যে বিশেষভাবে গঠিত জেলা পরিষদকে স্থানীয় বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হলেও জনসংহতির প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের

www.pathagar.com

দাবি এবং 'জুমল্যান্ড'-এর স্বপ্ন এতে বাস্তবায়িত হয়নি। জনসংহতি সরাসরিভাবে পরিষদকে প্রত্যাখান করলেও সরকার বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠিত করে (Bertil Lintner 1990 : 23)। ১৯৮৯ সালে ২৫ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিন শান্তিবাহিনী বয়কটের ডাক দেয়। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার; ভোট প্রদানের জন্যে জনপ্রতি ৫০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল সরকারিভাবে (Amena Mohsin 1997 : 203)।

মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ সরকার উপজাতীয়দের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমারা সংখ্যায়,শিক্ষায়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করলেও এ নির্বাচনের আসন সংখ্যা বন্টনের প্রক্রিয়ায় তারা অন্যান্য উপজাতীয়দের চেয়ে কম আসন পায়। ফলে সরকার চাকমা ছাড়া অন্যান্য উপজাতীয়দের কাছে টানতে সক্ষম হয়।

গণআন্দোলনের কারণে বিব্রত এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আর কোন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনাও নতুন করে শুরু হয়নি। বরং শান্তির পক্ষে অগ্রসর হতে না পেরে পূর্ববর্তী জিয়া সরকারের মতোই এরশাদও পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প অবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এতে বিদ্রোহী কার্যক্রম বন্ধ করা যায়নি; একদল পাহাড়িকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-ব্যবস্থার অধীনে আনা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৯০-এর শীতকালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন হলে তিনজোটের প্রার্থী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরিষদ ছাড়া দেশের সকল জেলা পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয় (গিয়াসউদ্দিন মোল্যা ১৯৯২ : ১১৩)।

খালেদা জিয়ার আমল থেকেই একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী মোতায়েন রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটটির সমাধান সম্ভব নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে। খালেদা জিয়া সরকার একটি আপোষ প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ২১)। খালেদা জিয়ার আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক কমিটি (প্রধান, যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমদ), যার প্রথম বৈঠক বসে ৫ ডিসেম্বর ১৯৯১, খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউজে; কমিটি ১৯৯৪ সালের মে মাসে শান্তিবাহিনীর সাথে সাতটি বৈঠকে বসে; এবং তৈরি হয় একটি উপকমিটি (প্রধান, সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন), যেটি দুদুকছড়ায় শান্তিবাহিনীর সাথে বসে সাতবার, শেষ বৈঠকটি হয় ২৫ অক্টোবর ১৯৯৫ (জনকণ্ঠ ১৯৯২-১৯৯৫)। পার্বত্য সংকটের প্রেক্ষাপটে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়া উপজাতি শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের

www.pathagar.com

ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক উদ্যোগে খালেদা জিয়া সরকারের পক্ষে ভারতের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের ৯ মে একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৭৯টি পরিবারভুক্ত পাহাড়ি শরণার্থীদের প্রথম ব্যাচ সুষ্ঠুভাবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে (জনকণ্ঠ ১৯৯৪)। আরো প্রত্যাবাসন অব্যাহত থাকে।

ক্ষমতায় এসেই খালেদা জিয়ার সরকার হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে একটি লিয়াজো কমিটি গঠন করে, যারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। ১৯৯১ সালের ৬ জুন Hill District Local Government Parishad Act 1989 কে পরিবর্তন করে Hill District Zilla Local Government Councils করা হয়; পরিষদের ক্ষমতাসমূহ কাউন্সিলে প্রত্যাপন করা হয়। একই বছর ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধান করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন : মীর্জা গোলাম হাফিজ, মজিদ-উল-হক, মোস্তাফিজুর রহমান, সাইফুর রহমান, আবদুস সালাম তালুকদার,অলি আহমদ ও আবদুল মতিন চৌধুরী। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ২২টি বিষয়ের অতিরিক্ত আরো ৮টি বিষয় স্থানীয় সরকার কাউন্সিলকে দেয়া হয় (Syed Murtaza Ali 1996 : 145-146)।

এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য অরুণাচল, ত্রিপুরা প্রভৃতিতে শরনার্থী বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। সেসব রাজ্যে অসংখ্য চাকমা শরনার্থীর অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রত্যাবাসনের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে; কোথাও কোথাও চাকমা খেদাও আন্দোলন শুরু হয় (Syed Murtaza Ali 1996 : 147)। ফলে বাধ্য হয়ে শান্তিবাহিনীকে আপোষমূলক মনোভাব গ্রহণ করতে হয়। ১৯৯২ সালের ২২ মে শান্তি আলোচনাকালে জনসংহতি সমিতি তাদের পুরনো পাঁচ দফা দাবিকে সংশোধিত ও নমনীয় আকারে পেশ করে (জনকণ্ঠ ১৯৯২)। সরকারও আলোচনাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য এবং বিদ্রোহীদের আস্থা বাড়ানোর স্বার্থে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়াতে থাকে।

খালেদা জিয়ার আমলেই জনসংহতি পূর্বের অবস্থান থেকে দৃশ্যত সরে এসে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ সংশোধিত দাবিনামা উত্থাপন করে। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত দাবিনামার ব্যাপারে স্পষ্টত লক্ষণীয় যে,খালেদা জিয়া সরকারের অবস্থান ছিল বহুলাংশে নমনীয় বা সম্মতিসূচক। বিশেষ করে নিরাপত্তাজনিত কারণে আবশ্যক সেনাবাহিনীর অবস্থান ব্যতীত সকল অস্থায়ী সেনা ছাউনি এক পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের ব্যাপারে বিএনপি সরকারের সম্মতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আমলে পার্বত্য সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের পথ স্পষ্ট রূপ লাভ করে; দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় ভারতকে শান্তিবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সরানো সম্ভব হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের অনুকূলে ইতিবাচক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচনী ইশতেহারে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া' এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা' মর্মে অঙ্গীকার করে ১৯৯৬ সালের মধ্যভাগে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার, পার্বত্য জনগণের ম্যান্ডেট (পার্বত্য চট্টগ্রামের আসনগুলো আওয়ামী লীগ পায়) এবং এরশাদ-খালেদা জিয়া সরকারের ধারাবাহিকতায় সরকার গঠনের ৬ মাসেরও কম সময়ে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক 'জাতীয় কমিটি' গঠন করা হয়। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ষষ্ঠ দফা বৈঠকের পর উভয়পক্ষ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তিতে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে। পরিশেষে ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সরকারের পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতির পক্ষে সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) স্বাক্ষর করেন (জনকণ্ঠ ১৯৯৭)। সমাপ্তি ঘটে শান্তির সন্ধানে দীর্ঘ পথযাত্রার।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সশস্ত্র পথে দাবি আদায়ের আন্দোলনরত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে; আনুষ্ঠানিকভাবে তারা অস্ত্র সমর্পণও করে। সুদীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে যে রক্তের উত্তরাধিকার অশান্ত করে তুলেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে, সেখানে আপাত শান্তি নেমে আসে। বিদেশী বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সংস্থা উৎসাহ দেখায় পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে। রাজনৈতিকভাবে উত্তাপ ও বিরোধিতার পরেও পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে সংঘাত ও রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। একবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামনে সম্ভাবনার বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করে এ চুক্তি খুলে দিয়েছে সম্পদশালী জনপদকে। সুযোগ এসেছে উন্নয়নের ও সমৃদ্ধির প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টির (মাহফুজ পারভেজ ১৯৯৮)।

www.pathagar.com

উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি

সরকার ও বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর পরই সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় থেকে জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতি ছিল পার্বত্য ইস্যু ও শান্তিচুক্তির প্রেক্ষিতে আলোড়িত। কিছুটা উত্তাপও ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনীতিতে।

শান্তিচুক্তিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ওয়াদার বাস্তবায়ন এবং শাসনকালের অন্যতম সাফল্য বলে চিহ্নিত করে: দলীয় পর্যায়ে সাফল্যের জন্যে আনন্দ-উল্লাস-সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান করায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে অভিনন্দন জানাতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের State Department চুক্তি-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে : (এই চুক্তি) ' will put an end to a longstanding conflicts that has claimed may lives over more than two decades'. অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ঘটনাকে 'Significant achievement for Bangladesh' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় : 'this (accord) will bring peace and prosperity to the people of chittagong Hill Tracts in particular and the people of Bangladesh in general'. আওয়ামী লীগ সঙ্গত কারণেই দাবি করে যে, পার্বত্য চুক্তি সম্বন্ধে দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের যে স্বতঃস্ফূর্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, তা এই চুক্তির যথার্থতাকেই উর্ধ্বে তুলে ধরে (জনকণ্ঠ ১৯৯৮)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিচুক্তির ফলে সৃষ্ট অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করার জন্যে দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তা, দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহকে আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে ইতিবাচক সাড়াও পাওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্যে বিশেষ কর্মসূচি ও অর্থ বরাদ্দ করে। জুন মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি ও বাজেট নেয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশনও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামনে রেখে (জনকণ্ঠ ১৯৯৮)।

www.pathagar.com

শান্তিচুক্তিকে কার্যকর করার জন্যেও সরকার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আইনগত ভিত্তি ও সংস্কার কর্মসূচিও চলতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পন্ন হয় শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান। প্রকাশ্যে সাধারণ জনজীবনে ফিরে আসেন বিদ্রোহীরা। বিএনপিসহ বেশ কিছু বিরোধী দলের সদস্যদের বর্জন এবং জাতীয় পার্টির বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে পার্বত্য সংক্রান্ত চারটি বিল পাস হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনসহ চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের আইনগত ভিত্তি রচিত হয়। তবে ১৯৯৮-এর দিকে চুক্তি বাস্তবায়নে কিছু সঙ্কট দেখা দেয় (দ্রষ্টব্য: ঘটনাপঞ্জি)।

শান্তিচুক্তি এবং চুক্তিকে সফল করতে সরকারের উদ্যোগের বিপরীতে বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা ৭ দল তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। তাঁদের ভাষায় : এই চুক্তি দেশ বিক্রির দলিল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও হরতাল, এমপিদের অনশন, অবরোধ ও দেশে দ্বিতীয়বারের মতো 'লংমার্চ' কর্মসূচি গ্রহণ করে বিরোধী দল। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মাধ্যমে হরতাল-অবরোধসহ চরম কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় পাহাড়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে। পার্বত্য পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকাশ পায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া; খোদ পার্বত্য অঞ্চল থেকে দেখা যায় বিপরীতমুখী চিত্র : সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে পার্বত্য জেলাসমূহে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল সমাবেশ অব্যাহত থাকে। যেমন গতকাল (৩ ডিসেম্বর) রাঙ্গামাটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শহরে এক বিরাট শান্তি মিছিল বের করা হয়। অন্যদিকে পার্বত্য ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকেও শান্তিচুক্তির বিপক্ষে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে তারা বলেন, সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তাতে পার্বত্য বাঙ্গালিদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। আমরা যে কোন কিছুর বিনিময়ে হলেও এ চুক্তি বাস্তবায়ন করতে দেবো না। অপরদিকে পাহাড়ি-বাঙ্গালি সংমিশ্রিত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ শান্তিচুক্তিকে স্বাগতম জানিয়ে মিছিল-সমাবেশ করা হয়েছে। তারা স্লোগান দেন 'পাহাড়ি-বাঙ্গালি ভাই-ভাই, মিলেমিশে থাকতে চাই।' বান্দরবানে শান্তিচুক্তির পক্ষে এক বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। খাগড়াছড়িতে শান্তিচুক্তির বিপক্ষে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিরাট মিছিল বের করা হয়। পরবর্তী সময়ে শাপলা চত্বরে এক সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, এ চুক্তিতে পার্বত্য বাঙ্গালিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এ চুক্তি সংবিধান বিরোধী, তা কোনদিন জাতি মেনে নিতে পারে না। সমাবেশ শেষে শান্তিচুক্তির একটি কপি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েও সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমিরন দেওয়ান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, চুক্তি সফল বাস্তবায়নে পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক

www.pathagar.com

অভিনন্দন। এ চুক্তিকে সফল করতে পরিষদের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তিনি এ ব্যাপারে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেন। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা বলেন, দীর্ঘ ৬ বছর এ শান্তি প্রক্রিয়ার জন্যে কাজ করতে গিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। ত্যাগের বিনিময়ে আজকের সফলতা দেখতে পেয়ে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন, চুক্তি বড় কথা নয়, তা বাস্তবায়ন হলে আমি বেশি খুশি হবো। সাবেক খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্য নক্ষত্র ত্রিপুরা বলেন, সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে ৬ লাখ বাঙ্গালি আর ২ লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চাকমা সম্প্রদায়ের জন্যে করা হয়েছে। এ চুক্তিতে শুধুমাত্র চাকমা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। এ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় অশান্তির আয়োজন করা হয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শশীকান্ত তংচঙ্গা ও প্রদীপ খীসা বলেন, এ চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের মুক্তির আকাংখাকে পদদলিত করা হয়েছে। আমরা এ চুক্তি মানি না। এ কথিত চুক্তিতে অশান্তির বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। তারা বলেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য এলাকার প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। 'পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ ২২ বছরব্যাপী বিরাজমান হিংসা, হানাহানি, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক অস্থিরতা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাকে সাধুবাদ জানাই। জাতীয় পার্টি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পক্ষে বলা হয়, এরশাদ আমলে অনুষ্ঠিত ৬ বার আলোচনার সূত্র ধরে বর্তমান সরকার যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে তার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাঙ্গামাটি জেলা শাখা চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে এ চুক্তিকে অভিনন্দন জানানো হয় (শামসুল আলম ১৯৯৭)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতোই রাজধানী ঢাকাতেও মুখরিত হয় শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গ। আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে স্বাগত জানাতে থাকে। অন্যদিকে, বিএনপিসহ সাত দল এবং সমমনা দলগুলো তীব্র বিরোধিতা শুরু করে: মিছিল-সমাবেশ ছাড়াও বেশ কয়েকটি হরতাল, লাগাতার একটার পর একটা কর্মসূচি, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে স্মারকলিপি পেশ, পল্টন ময়দানে বিএনপি সংসদ সদস্যদের সকাল-সন্ধ্যা অনশন এবং ৯ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চের আয়োজন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির পক্ষে বলা হয় : এ চুক্তি দেশের স্বার্থ বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক নীল নকশার অংশ। এ নীল নকশা অনুযায়ী দেশের মোট ভূ-খণ্ডের এক-দশমাংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। জাতীয় পার্টির মতে, চুক্তিতে এমন কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া ঠিক নয়, যাতে তারা এক সময় বাংলাদেশকেই অস্বীকার করবে। সংসদে উত্থাপিত পার্বত্য বিল আলোচনাকালে তারা বলেন, এটি রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিকতা বিরোধী, এর ফলে বিচ্ছিন্নতা ও দেশের

www.pathagar.com

মধ্যে আলাদা-আলাদা এলাকার অস্তিত্ব রক্ষার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির আইন সারাদেশে অশান্তি ছড়িয়ে দিতে পারে (রাশীদ উন নবী ১৯৯৮ : ২৭)।

(১২ এপ্রিল) যেদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত চারটি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়, সেদিন সকল বিরোধী দল সংসদে সাধারণ আলোচনার দাবি উত্থাপন করে। অন্যদিকে পার্বত্য সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের পর সশস্ত্র পার্বত্য বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক শাখা 'জনসংহতি সমিতি'র প্রধান শন্তু লারমা আপত্তি উঠালে সরকার তা অতীব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। পরবর্তীতে ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল শন্তু লারমাকে ঢাকায় নিয়ে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় তার সঙ্গে সরকার পক্ষে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে ৩ মে থেকে ৬ মে, এ ৪ দিনে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল ও বহুল আলোচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল (মোট ৪টি বিল) কণ্ঠভোটে সংসদে পাস হয়। বিএনপি, জামাত ওয়াক আউট করে আর সংসদে উপস্থিত জাতীয় পার্টি বিপক্ষে ভোট দেয়। এ বিল চারটির ওপর বিরোধী দলের সদস্যরা জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও দফাওয়ারি সংশোধনী প্রস্তাবের মোট ৬ হাজার ৬শ' ৯৫টি নোটিশ দেয় (রাশীদ উন নবী ১৯৯৮)।

এরই মাঝে সংবাদপত্র প্রতিবেদনে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়। বলা হয় : পাহাড়ি সশস্ত্র বাহিনী তথা শান্তিবাহিনীর সৃষ্টিকারী ও মদদদাতা হলো প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ অনিচ্ছুক একটি গ্রুপ এখনও ভারতের মাটিতে রয়েছে। যারা 'প্রীতি গ্রুপ' নামে পরিচিত। 'শন্তু লারমা গ্রুপ' ও 'প্রীতি গ্রুপ'- দুইটি দলই অভিন্ন ঐ বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার মদদপুষ্ট। যারা ২৩ বছর ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়ে, সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে, রেশন খেয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়েছে। ... প্রতিদিন খবর আসছে, পার্বত্য এলাকায় অচেনা-অজানা পাহাড়িরা এসে নিরাপদে বসত গড়ছে। স্থানীয় জেলা প্রশাসন এক ঝাঁক লোককে ধরেছে (রশীদ উন নবী ১৯৯৮ : ২৬)।

মাঝখানে একবার উত্তাপ দেখা দেয় শান্তিচুক্তি এবং পার্বত্য প্রসঙ্গে সংসদে পাসকৃত ৪টি বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে। সরকার পক্ষ, সকল কার্যক্রমের পূর্ণ ধারাবাহিকতা ও সাংবিধানিক বৈধতা রক্ষা হয়েছে বলে দৃঢ় মত পোষণ করে: বিরোধী দল নানা পয়েন্ট বের করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। ৫ মে আইন ও বিচারমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বিলগুলো কোনক্রমেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী নয় উল্লেখ করে এও বলেন যে, ... সুপ্রিম কোর্টের দরজা খোলা রয়েছে (জনকণ্ঠ ১৯৯৮)।

বস্তুতপক্ষে শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য বিল পাসকে কেন্দ্র করে জুন মাস পর্যন্ত উত্তেজনা বহাল থাকে। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে বিরোধীদলগুলোর লংমার্চ (৯ জুন)। লংমার্চকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ

www.pathagar.com

করে বিএনপি। লংমার্চের প্রাক্কালে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এ লংমার্চ দেশ রক্ষার; এতে বাধা দিলে গণআন্দোলন। প্রায় এক মাস আগে ১২ মে ঢাকার পল্টন ময়দানে এমপিদের নিয়ে অনশন শেষে 'সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী পার্বত্য কালো চুক্তি ও আইন প্রতিহত' করার লক্ষ্যে লংমার্চ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৪০০ কিলোমিটারব্যাপী লংমার্চে প্রায় ২০০০ হাজার মোটরযান ও এক লাখ লোকের সমাগম হয় বলে দল দাবি করে। লংমার্চটি পথে বেশ কয়েক স্থানে সরকারি প্রতিপক্ষের হাতে আক্রান্ত হলেও ব্যাপক কোন সংঘর্ষ বা সহিংসতা ঘটেনি। লংমার্চ শেষে খাগড়াছড়ির জনসভা থেকে বিএনপি ১৮ জুন দেশব্যাপী পূর্ণ দিবস হরতাল আহ্বান করে। লংমার্চের অন্যান্য শরীকরাও অভিন্ন কর্মসূচি নেয়। হরতাল শেষে ২২ জুন বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। শান্তিপূর্ণভাবে এ সকল কর্মসূচি প্রতিপালিত হয় (জনকণ্ঠ ১৯৯৮)।

জুলাই মাসে বিএনপি'র উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি না থাকলেও চুক্তির পক্ষাবলম্বীরা পল্টন ময়দানে সফলভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গণসংবর্ধনা দেয় ১৫ জুলাই তারিখে। ধারণা করা হয় যে, লংমার্চের মাধ্যমে বিরোধী দল শান্তিচুক্তির ব্যাপারে যে প্রচারণা চালিয়েছিল, সেটার জবাব দেয়ার জন্য আয়োজন করা হয় এই গণসংবর্ধনা।

জুলাই মাস থেকেই দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুম ও বন্যার কারণে বিরোধী আন্দোলনে ভাটা এবং শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য ইস্যু চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে সরকার চুক্তি এবং তৎপরবর্তী পার্বত্য বিলের আলোকে কার্যক্রম শুরু করে; আলাদা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। যদিও বছরের শেষ দিকে কিছু অচলাবস্থা লক্ষ্য করা যায় (দ্রষ্টব্য : কালপঞ্জি)।

নব্বই দশকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ইস্যুতে রূপ নেয়। যে সমস্যা ছিল দূর পাহাড়ের অরণ্যে, সেটা চলে আসে বাংলাদেশের সর্বত্র। বিরোধী দলগুলো চেষ্টা করেছিল পার্বত্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তুলতে। এ উদ্যোগ খুব একটা সফল হতে পারেনি। কারণ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি শেখ হাসিনার আমলে সফলভাবে সম্পন্ন হলেও শান্তি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল এরশাদ আমলেই। বেগম জিয়ার সরকারও শান্তির লক্ষ্যে বশ খানিকটা এগিয়ে ছিলেন। শেখ হাসিনার সরকারের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি এ সমস্যাটি নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও দ্রুততার মধ্যে নিহিত।

চুক্তির সাংবিধানিক ও আইনগত বিতর্ক নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, সকলেই শান্তি চাচ্ছিলেন। বিদ্রোহীরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিদের জন্যেও নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশের, তাদের নিরাপত্তার। ফলে শান্তিচুক্তি সাধারণের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

www.pathagar.com

শান্তি যে কেবলমাত্র চুক্তি বা রাজনীতির মাধ্যমে আসতে পারে না এখন সম্ভবত সেটা ভাববার সময়। একবিংশ শতকের প্রাক্কালে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বিবদমানেরা যখন মিলেমিশে কাজ করছে, তখন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশের সংঘাত নিরসন জরুরি- উন্নয়নের সম্মিলিত গতিবেগ আনা অপরিহার্য। উপসংহারে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে হালে থিতিয়ে পড়লেও এটার যে মৃত্যু ঘটেনি, তা বলাই বাহুল্য। উন্নয়নের প্রশ্নে পার্বত্য ইস্যু আসবে; আঞ্চলিক রাজনীতি ও জাতীয় রাজনীতিতে তো' আসবেই। সব সময়ই যদি এ ইস্যুটি উত্তাপ নিয়ে আসে, তাহলে আলো পাবার সম্ভাবনা কতটুকু? যে কোন বিষয়ের ভাল ও মন্দ দুটি দিক আছে; রাজনীতির অভিষ্ট হওয়া চাই ভালোটিকে খুঁজে বের করা। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে আরো ভালো বিহিত ব্যবস্থা উপহার দেবেন; এটা কামনা করার সময় এসেছে। যাতে পাহাড়ে বসবাসকারী সকল আদিবাসী-জাতিগোষ্ঠী ও বাঙ্গালি সম্প্রদায় সুখে-দুঃখে একসাথে বসবাস করতে পারে। শান্তিচুক্তি, কেবলমাত্র শুরু করে দিয়েছে- রাজনীতিকে উদ্যোগী হতে হবে সমস্যাটিকে চিরতরে শেষ করে স্থায়ী শান্তি আনতে সকল কিছুর ব্যবস্থা করার জন্যে।

www.pathagar.com

শান্তিচুক্তির নানাদিক

আলোচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : ঙ) বিশ্লেষণ করার আগে চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে :

চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয়েছে : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নেবর্ণিত চারি খণ্ডে (ক, খ, গ, ঘ) সংবলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

চারভাগে বর্ণিত চুক্তির ১ম খন্ড চুক্তি সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াবলী (উভয় পক্ষের তরফ থেকে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন, আইনের আওতায় স্থিরকরণ, চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ইত্যাদি) সংযুক্ত হয়। ২য় ভাগে চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপনের বিষয় ও লক্ষ্য বিধৃত হয়। ৩য় ভাগে পার্বত্য জেলা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয় বর্ণিত হয়। সর্বশেষে ৪র্থ ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং সেই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বালীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অবস্থান ও কার্যক্রমের পথ নির্দেশ উল্লেখিত হয়।

চুক্তির লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে আছে : পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব। আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য

www.pathagar.com

সংখ্যা হবে ২২ জন, সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন উপজাতীয় আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ হবেন বাঙ্গালি। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন একজন উপজাতীয়, যিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদা ভোগ করবেন। পরিষদে ২ জন উপজাতীয় ও একজন বাঙ্গালিসহ মোট তিন জন মহিলা সদস্য থাকবেন। উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মারমা উপজাতি হতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তংচঙ্গা উপজাতি হতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্য হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন।

পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হবে। পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হবে। পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করবে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবে। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ, সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করা সহ এদের আওতাধীন ও তাদের ওপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।

www.pathagar.com

বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত কোন বাঙ্গালিকে পার্বত্য এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে না। এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল বাঙ্গালি অধিবাসীর ভোটাধিকার থাকবে।

শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অব্যাহত থাকবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করত; উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা হবে। জায়গা জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যে সব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এ কমিশনের থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলে ভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে : ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট); গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার; ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)। কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হবে, তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে এর মেয়াদ বাড়ানো যাবে। কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আসন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিরদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি, সে ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হবে।

চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি দেবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ সরকারের কাছে দাখিল করবেন। নির্ধারিত তারিখে যে সব সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবে সরকার তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও দায়েরকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করবেন। সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি ৫০,০০০/= টাকা দেয়া হবে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা,

www.pathagar.com

হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি দেয়া হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাকেও মুক্তি দেয়া হবে। অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য থাকার কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না। জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির কারণে গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বর্তমান স্থায়ী সেনাবাহিনী সমূহ থাকবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর শুধু অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করা হবে।

উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তাদানের জন্য ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে।

সরকার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দেবে।

চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যের নেতৃত্বাধীনে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটি।

বিএনপির প্রতিবাদের আগেই পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিরা শান্তিচুক্তির তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। তারা চুক্তিকে সংবিধান বিরুদ্ধ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। এমনকি তারা চুক্তির এক-একটি ধারা উল্লেখ করে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন স্বার্থ লংঘিত হয়েছে, সেটা উল্লেখ করেন (এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া অদুদ ১৯৯৮ : ২১-২৩)।

তাঁদের ভাষায় : 'চুক্তির খ-খণ্ডের ৯ ও ৩ নং ধারা ও শর্ত অনুযায়ী শতকরা ৯৫ জন পার্বত্য বাঙ্গালিকে ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। খ-খণ্ডের ৩০এর ঘ-ধারা অনুযায়ী বাঙ্গালিদের নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেবেন উপজাতীয় রাজা এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে বাঙ্গালিদের ক্ষেত্রে অনুমতিপত্রও দেবেন পাহাড়ি রাজা, যা সংবিধান সম্মত নয়। খ-খন্ডের ২৬ ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোন জমি-ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ও ইজারা পর্যন্ত দিতে পারবে না কেউ। এমনকি স্বয়ং সরকারও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঐ অঞ্চলের ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবে না। চুক্তিতে নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়েছে বাঙ্গালিদের।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যপদসহ গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিত্ব পাহাড়িদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে, অথচ সেখানে বাঙ্গালিরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। যা কোনভাবেই

www.pathagar.com

সংবিধান সম্মত হতে পারে না। যে শান্তিবাহিনী দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে দেশদ্রোহী তৎপরতার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালিদের হত্যা করে আসছে তাদের বিচারের পরিবর্তে চুক্তির খ-খণ্ডের ১৬ ধারায় শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুরস্কারস্বরূপ নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ বিভিন্নভাবে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ এতদিন যারা শান্তিবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে আহত/নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাতৃভূমি রক্ষা করলো তাদের জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি এ চুক্তিতে।

চুক্তির গ-খণ্ডের ৭ নং ধারায় পরিষদসমূহের তিনটি উপ-সচিব ও একটি যুগ্ম সচিব পদ-মর্যাদার চারটি মাত্র মুখ্য কর্মকর্তার পদ, সিভিল সার্ভিসের সকল নিয়ম লংঘন করে, শুধুমাত্র বাঙ্গালি হওয়ার কারনে বাঙ্গালি অফিসারদের বদলে উক্ত পদগুলো পাহাড়িদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য বাঙ্গালিদের অধিকার রক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তির জন্য আর কোন প্রশাসনিক স্তরই রইলো না। চুক্তির খ-খণ্ডের ৩২ ধারায় দেশের সর্বোচ্চ আইনি প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদে পাসকৃত বা উত্থাপিত আইনের ওপর ভেটো দেয়ার ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদকে প্রদান করে, মহান জাতীয় সংসদকে অপমান করে এই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য আরেকটি অবৈধ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। যা কোন অবস্থায় সংবিধানসম্মত হতে পারে না। আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো ও নির্বাচনী পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের প্রচলিত গণতন্ত্রের ভেতর আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে।

চুক্তির খ-খণ্ডের ২৪ ধারায় দেশের প্রচলিত সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে সিপাই থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত পুলিশের সকল সদস্য, প্রত্যাগত শান্তিবাহিনীর মধ্য থেকে (উপজাতি) নিয়োগের ক্ষমতা পরিষদকে দেয়া হয়েছে। যারা এতদিন অবৈধ অস্ত্র দিয়ে দেশের সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার ভিডিপিসহ সাধারণ বাঙ্গালি জনতাকে দেখামাত্র হত্যা করেছে, এ চুক্তির ফলে তারা বৈধ অস্ত্র ও ক্ষমতা দিয়ে হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য কাণ্ড ঘটাতে দ্বিধা করবে কেন? চুক্তির খ-খণ্ডের ১৪ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী উপজাতীয় থেকে নিয়োগ, বদলি ও শাস্তি ইত্যাদির ক্ষমতা পরিষদকে দেয়া হয়েছে। চুক্তির খ খণ্ডের ২৬ ধারায় (গ) অনুযায়ী চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শান্তিবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিষদের উপর দেয়া হয়েছে। তা পার্বত্য বাঙ্গালিদের ভূমি থেকে বঞ্চিত ও ভূমি কেড়ে নেয়ার লক্ষ্যেই করা হয়েছে।

চুক্তির গ-খণ্ডের ৮ ধারায় পৌরসভা, স্থানীয় বিভিন্ন পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন অর্থাৎ জেলা প্রশাসন, কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সমবায় বিভাগ, সমাজসেবা বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ইত্যাদি, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে দেয়া হয়েছে। ফলে এদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ সরকার অখণ্ডত্ব নাশ করে, দেশের মধ্যে আরেকটি সরকার প্রতিষ্ঠা করলো। এটা সংবিধান বিরোধী ও অবৈধ। এটি ইউনিটারি বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কনসেপ্টের বিরোধী।

www.pathagar.com

স্পেশাল স্টেটাস, স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক পরিষদ, রিজিওনাল কাউন্সিল, আলাদা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, আলাদা পুলিশ নিয়োগের ক্ষমতা, জনপ্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ, জমির মালিকানা ও কর্তৃত্ব, ট্যাক্স আদায়ের ক্ষমতা ও সর্বময় প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ সংবিধান স্বীকৃত নয়। চুক্তির গ-খণ্ডের ১০ নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব ও চেয়ারম্যানের পদ শান্তিবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চুক্তির ঘ-খণ্ডের ৭ ধারা এবং ১৬ ধারার (ঘ) অনুযায়ী শান্তিবাহিনী ও উপজাতীয়রা সরকারের ব্যাংক ও বিভিন্ন সংস্থা হতে এ যাবত যে সকল ঋণ নিয়েছিল তা সুদসহ মওকুফ করা হয়েছে। অথচ যে শান্তিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কারণে পার্বত্য বাঙ্গালিরা ঋণ নিয়েও তা প্রয়োগ করতে পারেনি বা করলেও তা শান্তিবাহিনীর ঘাতকরা নষ্ট করে দিয়েছে, সেই সকল বাঙ্গালির ঋণ বহাল রাখা হয়েছে এবং সার্টিফিকেট মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুক্তির ঘ-খণ্ডের ৮ ধারা অনুযায়ী পার্বত্য বাঙ্গালিরা যে সকল বৈধ জায়গা-জমি/টিলা/পাহাড়ে দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করতে বা থাকতে পারেনি শান্তিবাহিনীর ভয়ে ও অত্যাচারে এবং সরকারি নির্দেশে নিরাপত্তা এলাকার বাইরে যেতে, চাষাবাদ করতে বা থাকতে দেয়নি, সেই সকল ভূমিতে কেন গত ১০ বছর যেতে পারেনি বা চাষাবাদ করেনি, সেই অপরাধে পার্বত্য বাঙ্গালির জমি/ভূমির মালিকানা স্বত্ব বাতিল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এই চুক্তিতে; যা সম্পূর্ণ অবৈধ, অন্যায় ও অমানবিক। চুক্তির ঘ-খণ্ডের ১৮ ধারা অনুযায়ী দেশের ভূ-খণ্ড রক্ষার অতন্দ্র প্রহরি সেনাবাহিনীর প্রায় ৫৪৫টি সেনাক্যাম্প, সেনাকাঠামো ভেঙে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং আনসার-ভিডিপিকে স্থায়ীভাবে নিরস্ত্র করে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চুক্তির খ-খণ্ডের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুব কল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনী কারবার ইত্যাদি সকল কর্তৃত্বের ক্ষমতা পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে; যার স্বীকৃতি সংবিধান দেয়নি।

চুক্তির খ-খণ্ডের ৩৫ ধারা অনুযায়ী বিক্রয়ের উপর কর, সামাজিক বিচারের ফিস, সরকারি-বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর হোল্ডিং কর, বনজ সম্পদের উপর কর, রয়্যালটি, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির কর, খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশনের ওপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ, ব্যবসার ওপর কর, লটারির ওপর কর, মৎস্য ধরার ওপর করসহ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের কর, রেইট, টোল এবং ফিস নেয়ার ক্ষমতা শান্তিবাহিনী কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত পরিষদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যাতে সরকার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চূড়ান্তভাবে খর্ব করা হয়েছে এবং এতে বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পার্বত্য বাঙ্গালিদের বহিষ্কারের পথ সুগম করা হয়েছে। ... সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের এবং ২৮(১, ২, ৩)

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে ও পশ্চাৎপদ জনগণের (পাহাড়ি) ধুঁয়া তুলে চুক্তির বৈধতার সাফাই দেয়া হচ্ছে। যদি ঐ ধারার প্রয়োগ করতেই হয় তাহলে সেটির সুযোগ তো চাকমারা পেতে পারে না। কেননা, চাকমারা ৮৬% ভাগ শিক্ষিত, বাঙ্গালিরা ১-২% ভাগ, অন্যান্য উপজাতীয়রা ২-৩% ভাগের বেশি নয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিকভাবে চাকমারা এগিয়ে। তাহলে পশ্চাৎপদ অংশ তো' বাঙ্গালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিরা। তাছাড়া একই পাহাড়ে, একই আবহাওয়ায়, একই প্রতিকূল অবস্থায় বাঙ্গালিরা তো' বসবাস করছে। সুতরাং পশ্চাৎপদ অংশের উন্নয়নের নামে চাকমাদের নয়, পার্বত্য বাঙ্গালি ও ক্ষুদে উপজাতীয়দের উন্নয়নে সংবিধানে উল্লেখিত ধারা প্রয়োগ ও চুক্তি করা উচিত ছিল।'

পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙ্গালিরা চুক্তিকে নিজেদের প্রতিকূলে ধরে নিয়েছে, সন্দেহ নেই। চুক্তির পর পরই তারা চুক্তির নানা দিক পর্যালোচনা করে সভা-সমাবেশ ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ ও বিরোধিতা প্রকাশ করেন। এমনকি আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ব্যাপক প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ করে তারা তাদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, শান্তিচুক্তি কি অশান্তির নতুন বীজ বপন করলো? শান্তির সপক্ষে যথেষ্ট প্রচারণা ও প্রেষণা প্রদানের ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায়নি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে চুক্তি পরবর্তী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পার্বত্য চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতা প্রতিপন্ন করেও বক্তব্য এসেছে (হারুন-অর-রশিদ ১৯৯৮)। বলা হয়েছে : পার্বত্য চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতা সম্বন্ধে কোন কোন মহল সংশয় প্রকাশ করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কোন কোন দল এটিকে সম্পূর্ণ 'সংবিধান পরিপন্থী' বলে আখ্যা দেয়। এদের মূল বক্তব্য হলো, চুক্তিতে পার্বত্য অঞ্চলে জমি ক্রয় ও বসতি স্থাপনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ, প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক চরিত্র বিনষ্ট করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা ইত্যাদি সংবিধানের ধারা ও চেতনার পরিপন্থী। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ধারা বা চেতনা এই চুক্তির দ্বারা লংঘিত হয়নি। বরং সংবিধানের আওতা ও আলোকেই এটি সম্পাদিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তার জনগোষ্ঠীর চলাফেরা, বসবাস, সম্পত্তি ভোগ ইত্যাদি অধিকারের কথা বলেছে, পাশাপাশি ৩৬ নং অনুচ্ছেদে এ কথাও বলা হয়েছে, 'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশ করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকে।' সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করবার অধিকার থাকবে।' অনুচ্ছেদে দু'টি শর্তসাপেক্ষে অর্থাৎ রাষ্ট্র তার বৃহত্তর নিরাপত্তা নিশ্চিত কিংবা জাতীয়

www.pathagar.com

সংহতিকে শক্তিশালী করতে নাগরিকের চলাফেরা, বসবাস, বসতি স্থাপন, সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং তা' সংবিধানেরই এখতিয়ারভুক্ত। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ সম্বন্ধে যে সমালোচনা হচ্ছে, সে ব্যাপারে সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। দেখা যাবে, সংবিধানের কোথাও কোন পরিবর্তন না এনে এবং রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্র (যা এককেন্দ্রিক) ঠিক রেখে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ দু'টির আওতায় স্থানীয় শাসন প্রশ্নে প্রদত্ত বিধান বলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' গঠন এবং এই পরিষদের নিকট কতিপয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা সম্ভব। সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১. আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে;

২. এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করবেন এবং অনুরূপ আইনের নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে–

ক. প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

খ. জনশৃংখলা রক্ষা;

গ. জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সংবিধানের ৬০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিষয়াবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার, ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন দ্বারা ঐ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা বুঝায় না, বরং বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ নং অনুচ্ছেদের আওতায় তা গঠন বিধিসম্মত হিসাবে পরিগণিত হয়। একই কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক চরিত্রও বিঘ্নিত হওয়ার কোন আশংকা থাকে না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ভূখণ্ডগত ঐক্যের ব্যাপারেও কোন সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ নেই। কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সীমান্তরক্ষী এবং স্থায়ী সেনানিবাসসমূহ (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালায় তিনটি সহ মোট ছ'টি) চুক্তি অনুযায়ী সেখানে বহাল থাকবে। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ সরিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। চুক্তির চতুর্থ ভাগে অনুচ্ছেদ ১৭ (ক) অংশে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে– আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ

www.pathagar.com

করা যাবে। এই সেনাবাহিনী নিয়োগ যথাযথ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। তাই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে সেনাবাহিনীর যে ঐতিহ্যগত যোগসূত্র আছে, তা চুক্তিতে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে।

চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষের উত্তপ্ত বিতর্কের এক পর্যায়ে সবচেয়ে অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে বিএনপির ১৮টি অভিযোগের বিপরীতে সরকারের বক্তব্য। পার্বত্য শান্তিচুক্তির পরদিনই অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে দলীয় অবস্থান নেয়ার ১৮টি কারন তুলে ধরেন। বিএনপি'র এই ১৮টি দফার বিপরীতে সরকার বক্তব্য প্রদান করে। ১৮টি অভিযোগের বিপরীতে ১৮টি ব্যাখ্যায় সরকার যা বলেছে, তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো (আজকের কাগজ ১৯৯৮) :

১. বিএনপি'র অভিযোগ : এই চুক্তির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল হতে স্বাধীন সার্বভৌম এককেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে; এটি দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সংকট সৃষ্টি করেছে।

সরকারের বক্তব্য : অভিযোগটি সর্বতোভাবে সত্যবিবর্জিত এবং অপপ্রচার। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বটে। কেননা, সংবিধানের আওতায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আস্থা রেখেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২. বিএনপি'র অভিযোগ : এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'বিষবৃক্ষ' রোপিত হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য : এটি একটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অপপ্রচারমূলক অভিযোগ। বরং এ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও জাতিসত্ত্বার মধ্যে বিরাজমান বিভেদ দূরীভূত হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান ঘটবে। শান্তিবাহিনীর বৈরি তৎপরতা বন্ধ হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য ও উন্নয়নের স্রোতধারায় উপজাতিদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৩. বিএনপি'র অভিযোগ : চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য : এ অভিযোগটা পূর্ব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য জিইয়ে রেখে বেআইনি ফায়দা লুটার অপকৌশল ও অপপ্রয়াস মাত্র।

৪. বিএনপি'র অভিযোগ : সংবিধানের ১ নং ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। সুতরাং সংবিধানে পৃথক কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা প্রদেশ করার বিধান নেই। চুক্তির 'গ' অধ্যায়ের ১ নং পংক্তিতে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের ১ নং ধারার পরিপন্থী।

সরকারের বক্তব্য : বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। সংবিধান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন কেউ এ বক্তব্য রাখতে পারেন না। আঞ্চলিক পরিষদ মূলত

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি স্থানীয় পরিষদের সমন্বয়কারী সংস্থা: যা আমাদের সংবিধানের পরিপন্থী তো' নয়ই, বরং সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৯ নং এবং ১১ অনুচ্ছেদের তৃতীয় ভাগের ২৮(৪) অনুচ্ছেদ ও চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯(১) এবং ৬০ অনুচ্ছেদের পরিপূরক। সুতরাং অভিযোগটি বিভ্রান্তি ছাড়ানোর একটি অপকৌশল মাত্র।

৫. বিএনপি'র অভিযোগ : বাংলাদেশের সংবিধানে অঞ্চল ভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের কোন বিধান নেই। চুক্তির মাধ্যমে একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্যে একটি বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রণালয় সৃষ্টি এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট ঐ অঞ্চল ভিত্তিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার অধীনে একটি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাহী ও সর্বময় ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলাদেশ সরকারের বিপরীতে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের শামিল বিধায় এই চুক্তি অবৈধ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারের বক্তব্য : সংবিধানে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল শর্তাবলী রয়েছে তা কোনক্রমেই কোন অঞ্চল ভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের পথে অন্তরায় নয়। বিশ্বের অনেক উন্নত ও গণতান্ত্রিক দেশে উপজাতি, আদিবাসী ও অঞ্চল বিশেষের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন ও মন্ত্রী নিয়োগের বিধান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুক্তরাজ্যে: স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড বিষয়ক মন্ত্রী আছেন। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রী রয়েছেন। এমনকি মরহুম রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী) নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত : সংবিধানের নবম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদের ১৩৬ অনুচ্ছেদের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, মন্ত্রণালয় গঠন ও পুনর্গঠনে বিষয়টি সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত। বর্তমানে যে 'বিশেষ কার্যাদি বিভাগ' রয়েছে– যা বিএনপি শাসনামলেও পুর্ণরূপে কর্মরত ছিল, তা' কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য বিশেষ অঞ্চল বিষয়ক একটি কর্ম বিভাগ বা মন্ত্রণালয়। অতএব বিএনপি'র এ বিষয়ক বক্তব্য কার্যত তাদের কৃত কর্মকাণ্ডের বিপরীত অবস্থান এবং পরস্পর বিরোধী।

৬. বিএনপি'র অভিযোগ : এই চুক্তি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে পাল্টা বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যা সংবিধানের ২৯ নং ধারার পরিপন্থী।

সরকারের বক্তব্য : তাদের এ বক্তব্যটি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং ২৮(৪) অনুচ্ছেদের পরিপূরক। এ বক্তব্যে তারা 'তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে' কথা কয়টি উল্লেখ করে কার্যত বিশেষ বিধান প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুত অনগ্রসর শ্রেণী গোষ্ঠীর জন্য কোন বিধানই ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হতে পারে না। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, উপজাতি এবং জেলা কোটা–এই বিশেষ বিধানের অধীনেই কার্যকর আছে এবং এ কোটা পদ্ধতি সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এ কথা কেউ কখনো বলেননি

www.pathagar.com

বা বলার অবকাশও নেই। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্যে কোন বিশেষ বিধান করা হলে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমনটি ভাবা অবান্তর।

৭. বিএনপি'র অভিযোগ : চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১৩ ধারার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এবং জাতীয় সংসদের প্রধান ক্ষমতা খর্ব করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত। জাতীয় সংসদের সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার এই প্রচেষ্টা দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারের বক্তব্য : এটা কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে যে কোন আইনের খসড়া সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে মন্ত্রণালয়, আন্তঃমন্ত্রণালয়, আইন বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মহল এবং মন্ত্রিসভা প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এমনকি সংসদে আইনের খসড়া উপস্থাপনের পরও কমিটি পর্যায়ে তা যাচাই-বাছাই আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, আইন প্রণয়নের এ সকল কর্মকাণ্ড সংসদের সার্বভৌমত্ব খর্ব করে। এমনকি সংসদও যে কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করতে পারে। বর্তমান সংসদেও বিএনপি'র সংসদ সদস্যরা প্রায়শই বিভিন্ন আইনের খসড়া জনমত যাচাইয়ের জন্যে প্রেরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুতরাং তাদের এ বক্তব্যটি স্ববিরোধী।

৮. বিএনপি'র অভিযোগ : সংবিধানের ৩৬ ধারা বলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন একটি মৌলিক অধিকার। চুক্তির 'গ' অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তি সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার লংঘন করেছে।

সরকারের বক্তব্য : বক্তব্যটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছে তা' সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অজ্ঞতাপ্রসূত। সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সর্বত্র চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।' বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির 'খ' অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তিতে বা চুক্তির অন্য কোথাও এমন কিছু নেই যা সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ৩৬ অনুচ্ছেদের বক্তব্য পাঠকালে সর্বদাই একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, 'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ' বলে যে কথা কয়টি রয়েছে তা গুরুত্বহীন নয়।

৯. বিএনপি'র অভিযোগ: সংবিধানের ৪২(১) ধারার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। চুক্তির ২৬ নং পংক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে।

সরকারের বক্তব্য : এ অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। তাদের ৮ দফায় যা বলা হয়েছে এটিও অনুরূপ একটি বক্তব্য। কেননা,

www.pathagar.com

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২(১) এ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কথা কয়টি দিয়ে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকারকে শর্তাধীন করা হয়েছে। অধিকন্তু চুক্তির কোথাও অবাধ চলাচল বা সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা বিলি-বন্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। আইনের অধীনে কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তা' যথারীতি বহাল রাখা হয়েছে।

১০. বিএনপি'র অভিযোগ : বাংলাদেশ সরকারের যে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি অধিগ্রহণ, ইজারা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর রয়েছে সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এই সরকার এই চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে সমর্পণ করেছে। এতে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য : বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ মাত্র। এ বক্তব্যের সাথে চুক্তির কোন ধারা-উপধারা বা বক্তব্যের কোন মিল নেই। তাদের অভিযোগের ৯ নং ধারা সম্পর্কে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি– ১০ নং অভিযোগ সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য একই রকম। চুক্তির কোথাও ভূমি বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়নি। দেশের অন্যত্র ভূমি ব্যবস্থাপনায় সরকারের যে কর্তৃত্ব রয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে। কোনরূপ ছাড় দেয়া হয়নি। পার্বত্য জেলাসমূহের কর আদায়ের পদ্ধতি পূর্বে যা ছিল বর্তমানেও তাই রয়েছে।

১১. বিএনপি'র অভিযোগ : এ চুক্তির মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষী নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার হরণ করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করে চাকরি, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি করে এ দেশের সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য : এ বক্তব্যটিও একটি মিথ্যা বিবৃতি। কেননা, এই চুক্তির মাধ্যমে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়নি। বাঙ্গালিদেরও কোন নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এর নির্দেশানুসারে কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। তাদের চাকরি, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই কারো কোন মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়নি।

১২. বিএনপি'র অভিযোগ : জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্তি ও কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সীমিতকরণ ও সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, শান্তি-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীদের সরকারের অধীনে না রেখে বস্তুত পার্বত্য পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে এক দেশে দুইটি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি এবং সরকারি/আধা-সরকারি কর্মচারীদের মর্যাদা নিম্নমুখী করা হয়েছে। সরকারি প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের বাকী অংশেও জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

সরকারের বক্তব্য : এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যা ভাষণ! জেলা প্রশাসন পদ বিলুপ্ত করা হয়েনি বা কমিশনারের দায়িত্ব, ক্ষমতা বা কর্তব্যও সীমিত করা হয়নি। আমরা

www.pathagar.com

দেশের প্রত্যেক জেলা-উপজেলা পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নিচ্ছি। এসব পরিষদ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এবং সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে। বিবেচ্য ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। একটি সমতল জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি যেমন জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন, তেমনি পার্বত্য জেলা পরিষদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক থাকবেন এবং তিনি তার ওপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাবেন। কমিশনারে দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা কোনক্রমেই খর্ব বা সীমিত করা হয়নি। শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের বিষয়ে কমিশনারের পরিবর্তে একজন বিচারপতি শপথ পাঠ করাবেন। এতে কমিশনারের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য কি করে খর্ব করা হলো তা আদৌ বোধগম্য নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না বা তিনি কোন উপজাতির সদস্য সে সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে সার্কের চিফের ওপর দেয়া হয়েছে এবং এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এতে জেলা প্রশাসকের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে মর্মে যারা উচ্চকিত হচ্ছেন, তারা বস্তুতপক্ষেই বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে যাচ্ছেন মাত্র।

১৩. বিএনপি'র অভিযোগ : উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ এই চুক্তিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চলাচল সীমিতকরণ এবং তাদের পার্বত্য পরিষদের পরোক্ষভাবে অধীনকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের সম্মান এবং মর্যাদা হানিকর।

সরকারের বক্তব্য : বিএনপি উত্থাপিত ৫ নং অভিযোগ ও এ অভিযোগটি কার্যত একই অভিযোগ। মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ওপর কোনরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি। এ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য তাদের অভিযোগনামার ৫ নং ধারার উত্তরে যা বলেছি সেটাই এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৪. বিএনপি'র অভিযোগ : সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চলাচল সীমিতকরণ এবং তাদেরকে পরোক্ষভাবে পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ করণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর।

সরকারের বক্তব্য : অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। সামরিক, আধা-সামরিক বা শান্তি-শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন বাহিনীর চলাচলের ওপরই কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। বা সীমিতকরণ করা হয়নি। সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনী বা প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীসমূহ সর্বদাই তাদের নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের আওতায় চলাচল করে থাকেন। যুদ্ধকালীন অবস্থা বা সিভিল কর্তৃত্বের সহায়ক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় তাদের যে চলাচলে সর্বত্রই পার্থক্য

www.pathagar.com

থাকে। যে কোন আইনানুগ সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল সর্বত্রই ও সবসময়েই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম করা হয়নি।

১৫. বিএনপি'র অভিযোগ : এ অঞ্চলের প্রোটেকটেড বনাঞ্চলসহ বহু জমির ওপর সরকারের অধিকার থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে বহু স্থানে এই সরকারি স্বার্থ তথা সমগ্র দেশের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এমনকি সরকারের নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সরকারের বক্তব্য : এ বক্তব্যটি সর্বৈব মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার। চুক্তির কোথাও এমন কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে নতুনজমি অধিগ্রহণের ক্ষমতাও পূর্ববতই রয়েছে।

১৬. বিএনপি'র অভিযোগ : সরকার কর্তৃক নানা ধরনের ট্যাক্স, খাজনা, টোল আদায়ের ক্ষমতা প্রত্যাহার, ভূমি, পুলিশ, পর্যটন, বিচারের বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের অনুমতি সংরক্ষণ, খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে লাভের কমিশন ব্যবস্থায় ইত্যাদি বহু বিষয়ে সরকার নিজস্ব অধিকার, ক্ষমতা ও রাজকোষে অর্থ উপার্জন সংকুচিত করেছে।

সরকারের বক্তব্য : এটি উদ্ভট, কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। চুক্তির কোথাও এমন কথা নেই।

১৭. বিএনপি'র অভিযোগ : সরকার সহিংসতাবাদীদের পুরস্কার দিতে রাজি হয়েছে, নগদ অর্থ দান, জীবিকার ব্যবস্থার এবং মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছে—অন্যদিকে নিরীহ অ-উপজাতীয়দের মধ্যে যাদের স্বজন নিহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সরকারের বক্তব্য : প্রত্যাবাসন প্রত্যাশীদেরকে পূর্বের সরকারসমূহও নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, জীবিকার ব্যবস্থা প্রদান করেছে। বর্তমান চুক্তিতেও তাই আছে। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের সময়ে কোনরূপ স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছাড়াই প্রত্যাবাসন প্রার্থীদের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। চুক্তিতে সে ব্যবস্থাই অব্যাহত রাখা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, পূর্বে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান ব্যতিরেকেই আলোচ্য ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয়েছিল আর বর্তমানে শান্তি স্থাপনের নিশ্চয়তা বিধান করে এ সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য তাদের পূর্বকৃত কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৮. বিএনপি'র অভিযোগ : পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া জমি, পাহাড়, বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সরকারের নিজস্ব ক্ষমতা পরিষদের কাছে সমর্পণ করেছে।

সরকারের বক্তব্য : অভিযোগের ১৫ নং ধারায় যা বলা হয়েছে এ ধারাটি তার পুনরাবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট। তারা একটি কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন।

www.pathagar.com

সরকারের বক্তব্যে আরো বলা হয় : তাদের ১৮ দফা অভিযোগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শান্তি স্থাপনে তাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সফলতা তাদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দলগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, সংস্থা, সরকারি-বেসাকারি প্রতিষ্ঠান শান্তিচুক্তির নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেছে। এমনকি, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় মুখর শান্তিচুক্তি নিয়ে।

সরকার বিভিন্নভাবে চুক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে; নিরোধীদল চুক্তির ব্যাপক সমালোচনা করেছে। শান্তিচুক্তি নিয়ে জনমতের পক্ষ-বিপক্ষ, দুটি মত দেখা গেছে। কেউ কেউ পার্বত্য শান্তিচুক্তির ব্যাপারে রেফারেন্ডামের কথা বলেছেন। এ সকল বিপরীতমুখী মতের মধ্যেও একটি ব্যাপারে সকলেই একমত হয়েছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক; আর রক্তপাত নয়,আর হানাহানি নয়। এ কথা তো সত্যি যে পাহাড়ি আদিবাসীদের ওপর নানা সময়ে নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ হয়েছে এবং মূলতঃ এরই ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল তারা। বিদ্রোহের অশান্ত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী বাঙ্গালি-পাহাড়ি নির্বিশেষে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; রক্তপাত কারো জন্য মঙ্গল নিয়ে আসেনি। শান্তিচুক্তির বড় সাফল্য হলো, দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পর বিদ্রোহীদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছে; এজন্য তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছে। এতে অন্যান্যরা, বিশেষ করে বাঙ্গালি বঞ্চিত ও ভীত বোধ করছেন। সরকারকে পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে হলে, এই ভীতি ও বঞ্চিত হবার মনোভাব দূর করতে হবে। নইলে স্থায়ী শান্তির আশা সুদূরপরাহত হবে।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ তিনটি বিকল্প প্রস্তাবনা

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগে ও পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে নানা মতের নানা জন অসংখ্য লেখালেখি করেছেন। '৯০ দশকের পত্রপত্রিকার উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে ছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা' প্রসঙ্গটি। এই লেখালেখি এখনও জোরদার ভাবেই চলছে এবং কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশ পেয়েছে এ সম্পর্কিত বিষয়ে। এইসব লেখাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে : ১. কিছু লেখা অন্ধভাবে পাহাড়িদের পক্ষে; ২. কিছু বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালি সম্প্রদায়ের পক্ষে; ৩. কিছু এনজিও কর্মীদের মতামত-নিরপেক্ষ সংকলন মাত্র। এসবের বাইরে তিনটি গ্রন্থের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গভীরতার কারণে। গ্রন্থ তিনটি হলো ১. আমেনা মোহসীনের (১৯৯৭) 'The Politics of Nationalism : The Case of the Chittagong Hill Tracts' ২. হুমায়ুন আজাদের (১৯৯৭) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা'; এবং ৩. আহমদ ছফার (১৯৯৮) 'শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ'।

ড. আমেনা মোহসীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুর ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত গবেষক। সম্ভবত তাঁর আগে আর কেউ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে সফল পিএইচডি গবেষণা করেননি। মৌলিক গবেষণার নিরিখে প্রকাশিত এ গ্রন্থকে বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু প্রসঙ্গে অপরিহার্য ও অবশ্য পাঠ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটকে তিনি দেখেছেন জাতীয়তাবাদের সমস্যা হিসেবে; বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের একচ্ছত্র প্রভূত্বের ফলে সংখ্যালঘুদের সমস্যা হিসেবে তিনি পার্বত্য সংকটকে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হলো, তিনিই আমাদের জানা মতে প্রথমবারের মতো জাতীয়তাবাদের মতো একটি শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত দর্শনকে ঢেলে সাজাতে এবং পুনর্গঠিত করতে চেয়েছেন। এবং এরই ভিত্তিতে সন্ধান করেছেন শান্তির, বলেছেন : অ-উপনিবেশিক মানসিকতায় স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়নের কথা।

ড. হুমায়ুন আজাদের গ্রন্থটি একটি সংক্ষিপ্ত সফরের ভিত্তিতে রচিত হলেও যথেষ্ট গবেষণা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করে, কেবলমাত্র সাধারণ ভ্রমণকাহিনীতে তো পরিণত হয়ইনি–বরং হয়ে ওঠেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাহিত্য বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাব্য।

www.pathagar.com

হুমায়ুন আজাদ পার্বত্য সমাজ কাঠামো ভেঙে স্বাধীন-গণতান্ত্রিক ও আধুনিক পাহাড়ি মানবমণ্ডলীর উদ্বোধন প্রত্যাশা করেছেন; চেয়েছেন সেখানে হৃদয়ের চুক্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, সুন্দর-সবুজ-পাহাড় সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত, ভয়হীন ও নিরাপদ হোক।

আহমদ ছফা এককালে পাহাড়ে বসবাসের সূত্র ধরে পৌঁছুতে চেষ্টা করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের গভীরে। এবং সেই আলোচনার ধারা অনুযায়ী সংকটের অন্যান্য মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছেন তিনি, যদিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। তাঁর গ্রন্থে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক অনুসঙ্গ এসেছে– আবার শান্তিচুক্তি নিয়ে সরকারি-বেসরকারি দলের অবস্থান ও তৎপরতা আলোচিত হয়েছে। শান্তিচুক্তি পরবর্তীতে সুপ্ত অশান্তির আশঙ্কাও তিনি করেছেন। আহমদ ছফা গ্রন্থটিকে কোন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে না নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন; ভাবনার খোরাক দিয়েছেন।

এ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো গ্রন্থ তিনটির মূল ভাবকে বিশ্লেষণ করা। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সেটা উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়েই। লক্ষণীয় বিষয় হলো : তিনটি গ্রন্থই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করেছে এবং সমাধানের ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছে। সকলের সুপারিশেরই কেন্দ্র বিন্দুতে আছে 'মানুষ'– এটাই তাদের প্রধান কৃতিত্ব। তারা জানতেন যে চুক্তি হচ্ছে; কিন্তু চুক্তিকে নির্ভর করে শান্তির প্রত্যাশা স্থায়ীভাবে করতে পারেননি। এ কথা তো খুবই সত্য যে, চুক্তি করা হলে চুক্তি ভাঙবারও একটি সুযোগ থেকেই যায়। তাই চুক্তি করা বা ভাঙা আসলে উত্তেজনাকে বাড়াতে ও কমাতে পারে মাত্র, স্থায়ীভাবে শান্তি আনতে পারে না।

তবে, এ কথা তো' মানতেই হবে যে, চুক্তি স্থায়ী শান্তি আনুক বা না আনুক– শান্তির সুযোগ করে দিতে পারে। ভালো হলো চুক্তির সাফল্যকে ধরে রেখে স্থায়ী শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়া–মানুষের সংঘাত প্রবণ অতীতকে মুছে ফেলা এবং ঐক্যবদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

'বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি' গ্রন্থের উপসংহারে স্থায়ী শান্তির পক্ষে কিছু সুপারিশ লক্ষ্য করা যাবে। সমাজ ও মানুষকে নিয়ে ঐশ্বরিক পন্থা ছাড়া ব্যক্তি-মানুষের কোন সুপারিশ বা সুপারিশমালারই সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ঐশ্বরিক পন্থা যেভাবে হোক মানতে হবে– এমন একটি বাধ্যবাধকতা সকল ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে কাজ করে। মানবিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সুপারিশ মানতে বাধ্য না হবারও পথ গণতন্ত্রই উন্মুক্ত রেখেছে। যেটি করা যায়, তা হলো সামাজিক চুক্তির মতো একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া– যাতে সকলকেই শত মত-ধ্যান-ধারণার মধ্যেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শে উজ্জীবিত করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়– এবং পর্বতে-জঙ্গলে বসবাসকারী পাহাড়ি বা বাঙ্গালি কেউই এই রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বাইরে নন– সেহেতু সকলের মধ্যেই চুক্তির শর্তসমূহের বাইরেও শান্তি সম্পর্কে একটি বোধ

www.pathagar.com

জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাবনাগুলো সেই বোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়। প্রস্তাবগুলো পাঠ করার পর এই গ্রন্থের উপসংহারের যে অনুসিদ্ধান্ত, তা'ও বোধগম্য ও সহজবোধ হবে। এজন্য এই পূর্ব আলোচনা :

ক) পার্বত্য সমস্যা ॥ জাতীয়তাবাদের সংকট (মাহফুজ পারভেজ ১৯৯৮)

জাতীয়তাবাদের রাজনীতি আধুনিককালে নতুন তো নয়ই, বরং বহুল ব্যবহৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও জাতীয়তাবাদই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। মূলত ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামমুখর হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কথা। সে সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যানারে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক একই অবস্থা দেখা না গেলেও এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে বাঙ্গালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ও আন্দোলন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

জাতি, জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্র প্রত্যয়গুলো এখন ব্যাপক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ সকল প্রত্যয়ের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দেখা গেছে, এ সকল আদর্শ তার উদারনৈতিক তাড়না হারাচ্ছে এবং জাতি-রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এ সকল আদর্শ প্রভাবশালী শক্তির হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। ফলে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধীনস্থ সম্প্রদায়সমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ঘটিয়েছে উপরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের (Sbu-state nationalism) (Amena Mohsin 1997)।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিমণ্ডলে এই তাত্ত্বিক নবমূল্যায়নের সূত্রপাত করেছে একটি গবেষণালব্ধ গ্রন্থ, যার নাম "The Politics of Nationalism : The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh." যুক্তরাজ্যের বিশ্বনন্দিত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণা নিরীক্ষার ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচনা করেছেন ড. আমেনা মোহসীন। যিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। ঢাকার ইউপিএল থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৭ সালে।

গবেষণা গ্রন্থের মূল অভিষ্ট লক্ষ্য হলো বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী ও শাসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। এটা দেখতে গিয়েই লক্ষ্য করা যায় যে, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার মূল শিকড় বাঙ্গালি এলিট শ্রেণী সৃষ্ট জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় : বাঙ্গালি এলিটদের জাতীয়তাবাদের রাজনীতিই পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে বাঙ্গালি রাজনৈতিক নেতাদের একটি হাতিয়ার হিসাবে– যে হাতিয়ার দিয়ে বাঙ্গালিদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হয় এবং রাষ্ট্র গঠন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে রাষ্ট্রীয় সকল নীতি যেমন– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রণীত হয় প্রভুত্বকে সংহত করার জন্য, যাকে বলা যায় বাঙ্গালিদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এর ফলে সংখ্যালঘু পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে এক কোণে নিক্ষিপ্ত এবং রাষ্ট্রের নীতিমালার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অপরপক্ষে, তারাও নিজেদের জাতীয়তাবাদের পক্ষে মুখ খোলে এবং নিজেদের জাতি হিসাবে দাবি করে, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধীনে বাঙ্গালি জাতি থেকে আলাদা।

পার্বত্য জনগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদকে একচ্ছত্রতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং তাদের সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য সেটা সঠিক সমাধান নয়। কারণ পার্বত্য জনগোষ্ঠী একচ্ছত্র সম্প্রদায় নয়, তাদের আছে ১৩টি বিচিত্র বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী। তাদের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে বিচ্ছিন্নতা জেগে ওঠার আশংকাও থেকেই যাচ্ছে।

এ ধরনের প্রেক্ষাপটে ড. আমেনা মোহসীন জাতি সম্পর্কে একটি বিকল্প ধারণা উপস্থাপন করেছেন, যা পার্বত্য ও বাঙ্গালিদের জন্য সমাধান হিসাবে কাজ করতে পারে। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে গবেষকের সেই আকাঙ্খাই অনুরণিত হয়েছে: তিনি তার গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন তাদের, যারা জাতীয়তা-উত্তর বিশ্বের স্বপ্ন দেখেন।

গ্রন্থে ছক, মুখবন্ধ, মানচিত্র সংযোজনের বাইরে মূল অধ্যায় ৮টি যেখানে বিষয়বস্তুকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। ভূমিকায় জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সে অঞ্চলের জাতিসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে জাতীয়তার রাজনীতি, ৩য় অধ্যায়ে বাংলাদেশ আমলে জাতীয়তার রাজনীতি, ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে উন্নয়নের রাজনীতি, ৫ম অধ্যায়ে বাংলাদেশ আমলে উন্নয়নের রাজনীতি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে নিরাপত্তার রাজনীতি, ৭ম অধ্যায়ে বাংলাদেশ আমলে নিরাপত্তার রাজনীতি এবং ৮ম অধ্যায়ে উপসংহার– যেখানে জাতি সম্পর্কে একটি বিকল্প ধারণার রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

বস্তুত ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ছিল ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য পরাধীন দেশে ব্যাপকভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে– যে আন্দোলনে স্বাধীনতার বৃহত্তম প্রত্যাশায় ডান, বাম, উগ্র, মধ্যপন্থী এবং বিভিন্ন জাতিসত্তা একত্রিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আদর্শের প্রশ্নে বিভাজন দেখা দেয়। যেমন, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে বিভক্ত হয়। আবার জাতিগত প্রশ্নেও বিভাজন দেখা যায়। যেমন, শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতার পর সিংহলি ও তামিলরা বিভক্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। বৃহত্তর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের নামে পাঞ্জাবিরা যখন শোষণ শুরু করে

www.pathagar.com

তখন বাঙ্গালি জাতিসত্তা বিদ্রোহ করে– যার রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

তাই একথা বলা যায় যে, বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘু জাতিসত্তার নিপীড়িত হবার আশংকা থেকেই যায়। আর থাকে বলেই এখন একটি বিকল্প পথের সন্ধান করা তাত্ত্বিক মহলে জরুরি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ড. আমেনা মোহসীন জাতীয়তাবাদের রাজনীতির বিকল্প পন্থা উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন 'জাতি' এবং 'রাষ্ট্র'কে একাকার করা ঠিক হয়নি। এটা পৃথক থাকা আবশ্যক। কারণ 'জাতি' হলো সাংস্কৃতিক এবং 'রাষ্ট্র' হলো রাজনৈতিক। তার ভাষায়, In other words in this reorganisation the idea of nation would retain its present connotation of a culturally homogenous Population, but it would not be used interchangeable with 'State'. (Amena Mohsin 1997).

এই প্রেক্ষাপটে তিনি আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কিছু পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন– যে পরিবর্তন সম্ভব কেবলমাত্র অ-ঔপনিবেশিক মানসিকতা জাগ্রত করার মাধ্যমে। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়নের তাগিদ জানিয়েছেন। যার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতেও সকলের অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

ড. আমেনা মোহসীন বস্তুত একটি কালজয়ী স্বপ্নের পূর্বাভাস করেছেন; যে স্বপ্নে মানুষ মানুষের পরিচয়ে ও অধিকারের আলোক শিখায় খুঁজে পাবে নিজস্ব নিরাপত্তা ও অধিকার। তিনি এমন একটি সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন, যা মুক্তমনের মানুষদের আশাবাদে উজ্জীবিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুকে গবেষণার মাধ্যমে ড. আমেনা মোহসীন মূলত রাজনৈতিক দর্শনের জগতে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছেন। প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদকে নবরূপে এবং সমকালীন করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক যুগের সূচনায়, মধ্যযুগ পরবর্তীতে মেকিয়াভেলী যে জাতীয়তাবাদকে রাজনীতিতে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন– সেই জাতীয়তাবাদ যখন ঐক্য ও সংহতির বদলে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা ও অভ্যন্তরীণ শোষণের কারণ হয় তখন সে মতবাদকে পুনর্গঠন ও পুনঃমূল্যায়ন করা অপরিহার্য। 'জাতীয়তাবাদী' নামক আদর্শটিকে নবমূল্যায়নের মাধ্যমে বিকল্প রূপরেখায় উপস্থাপনকে একটি মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য বলে অভিহিত করা যায়। যে চিন্তার অবতারণা ড. আমেনা মোহসীন করলেন তা চিন্তাশীল– বোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত-উৎসাহিত এবং আরো অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে বাতিঘরের মতো পথ দেখিয়ে যাবে।

খ) পার্বত্য সমস্যা : বিকল্প মানবিক সমাধান (মাহফুজ পারভেজ ১৯৯৭)।

বাংলাদেশের দূরপ্রান্তে, পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা চলছে, এ কথা এখন প্রায় সকলেই জানেন। কেউ সমস্যাটিকে বলছেন সংকট, কেউ

www.pathagar.com

সংহতিহীনতা, কেউ বিপ্লব-বিদ্রোহ-স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং কেউ কেউ বলছেন জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। যে নামেই চিহ্নিত করা হোক, সমস্যাটি ছিল এবং আছে। পরিতাপের বিষয়, সমস্যার সমাধানে কোন ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও মানবিক উদ্যোগ নেই। তাই সেখানে 'সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত (হচ্ছে) হিংসার ঝরনাধারা' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭)। রক্তের আলপনায়, অস্বচ্ছতার ঘেরাটোপে আবৃত সেই সমস্যা। একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সকল নাগরিকমণ্ডলী তো বটেই-সাধারণ পার্বত্যবাসীর কাছেও স্পষ্ট নয় সমস্যা ও সমাধানের উপায়। ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির ধোঁয়াটে রহস্যের আবর্তে ক্রমেই রক্তাক্ত হচ্ছে একটি শান্ত, সমাহিত, সবুজ জনপদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটিকে অনুধাবণ করতে না পারায় এর সমাধান চিন্তাও বাস্তবভিত্তিক হবে না বলে ধরে নেয়া সঙ্গত। রাষ্ট্রতাত্ত্বিক সেখানে সংহতির স্বপ্ন রচনা করেন; নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি ও লোকচার উদ্ধারে ব্যস্ত হন; সমাজতাত্ত্বিক সমাজকাঠামোকে দৃঢ় করতে অগ্রসর হন; অর্থনীতিবিদ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বুনিয়াদ তৈরি করেন এবং অলস ও নিরাপদ মানবতাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্যাশন করেন সমস্যাটিকে নিয়ে– যাকে শুধু তুলনা করা যায় ক্লাসিক ট্র্যাজেডির সঙ্গেই, অন্য কোন ভাবেই নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, সমস্যার রক্তাক্ত বহিঃপ্রকাশ, সমাধানের সীমাহীন ব্যর্থতা এবং সমস্ত বিষয়টিকে জটিল ও বিভ্রান্তিমূলক প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করার দায়ভার কার? কোন সমস্যার যেমন অনেক কারণ থাকে, থাকে অনেক দায়ভারও। তাহলে প্রধান দায়ভার বহনকারী কর্তৃপক্ষকে চিহ্নিত করতে বলা হলে, কাকে খুঁজবো আমরা? রাজনীতিবিদ? সেনাপতি? বিদ্রোহী? এই তিনটি প্রধান প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির জন্য রক্তপাত ছাড়া কিছুই করতে পারেনি।

এই তিনটি পক্ষই সমস্যাটিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করে তৎপর শান্তির সন্ধানে। ত্রিভূজ প্রেমের মতোই এই ত্রিভূজ শান্তি-সন্ধানের ধারা অশান্তির করুণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ১০টি ভাষাভাষী ১৩টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ত উদ্বাস্তু ও আক্রমণের এবং প্রতি-আক্রমণের মুখোমুখি করেছে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষকে দেশমাতৃকার প্রিয় একটি অংশ সম্পর্কে করেছে বিভ্রান্ত। পাহাড়ি নাগরিকদের সমতলের নাগরিকদের সম্পর্কে করেছে ভীত ও সন্দেহপ্রবণ। এই দুবৃত্ত-মনস্তত্ত্ব রচনাকারীরা জানে না শান্তি কেবল আসতে পারে মানবিক পথে।

রক্তাক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে এসে এমন মানবিক সমাধানের আলোকশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ, চিন্তক-কবি-গবেষক-অধ্যাপক-উপন্যাসিকের চেয়ে তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় আধুনিক মানবতাবাদী এবং স্বচ্ছ-প্রথাবিরোধী বিশ্লেষক হিসেবে। যিনি একদা দশ বছর আগে লিখেছিলেন, 'রক্তাক্ত বিপন্ন পাহাড়' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯২), তিনিই যখন আবার লিখেন : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭), তখন

www.pathagar.com

কবুল করতে হয়– পার্বত্য চট্টগ্রাম তাঁর প্রিয় আগ্রহ এবং অনুসন্ধানের বিষয়। রক্তপাত তাঁর যন্ত্রণার, শান্তি হলো কামনার এবং এ কারণেই তিনি সকল পক্ষের চেয়ে দূরে সরে নিরপেক্ষ অবস্থানে চলে গিয়ে পার্বত্য শান্তির জন্য উপস্থাপন করতে পারেন একটি বিকল্প মানবিক সমাধানের প্রস্তাবনা।

পেশাগত কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আমার অপরিহার্য পাঠ্য অনুষঙ্গ। ছাত্র জীবনে পাঠ্য তালিকায় ছিল এ সমস্যার নানা দিক নিয়ে আলোচনা। বলা বাহুল্য, এসব একাডেমিক তত্ত্ব পাঠে অন্ধের হস্তি-দর্শন ছাড়া কিছুই হয়নি। গত পাঁচ বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অনুধাবনের সুযোগ খুঁজেও সফল হইনি পুরোপুরিভাবে। যে কয়বার পার্বত্য জনপদে গিয়েছি, চাপা উত্তেজনা আর ভীতির সংস্কৃতি দেখে আমি আহত হয়েছি। মনে হয়েছে, কি আদিবাসী, কি আভিবাসী, কি অসামরিক, কি সামরিক, কি সরকারি, কি বেসরকারি– সকলেই যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের দাহ নিয়ে গুমোট হয়ে আছে। আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরযোগ্যতার অভাবে একটি সবুজ প্রকৃতি ও মানুষের জনপদকে শরীরের একটি অচল, বোধহীন অঙ্গের মতো যন্ত্রণাদগ্ধ মনে হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। কখনও কখনও আবেগতাড়িত হয়েছি কোন আদিবাসী ছাত্র কিংবা ছাত্রীর বিবরণ শুনে। তাদের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত নিজেকে অপরাধী মনে হতো। আবার কখনও পাহাড়ে বসবাসরত বাঙ্গালি নিধনের তথ্য শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এ কোন আদিম ক্রুসেড, রক্তপাতই কেবল যার বিধেয়- এক সমাধানহীন রক্তপাত ...।

লক্ষ্য করে দেখেছি, সাম্প্রতিক অতীতে কোন শান্তিদূত ছিলেন না। রাজনীতিবিদগণ ছিলেন, যারা নিজেরাই ছিলেন না বৈধ এবং গণতান্ত্রিক। আর ছিল সামরিকতন্ত্র (সামরিক বাহিনী নয়, সামরিক বাহিনী আর সামরিকতন্ত্র এক কথা তো' নয়ই, বরং বিশাল পার্থক্যপূর্ণ)। এসব অবশ্য আশি দশকের কথা। সে সময় কপট রাজনীতিবিদগণ, সামরিকতন্ত্রের অশুভরা এবং আমলাতন্ত্রের আমানবিকরা (এরা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, পেশার সামগ্রিক অংশ ছিলেন না) সমগ্র বাংলাদেশের মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামকেও উপর্যুপরি নির্যাতন করেছে–তাত্ত্বিক ও আক্ষরিক উভয় অর্থেই। সে সময় যে বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে, নব্বই দশকে তারই যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাহাকার আমাদের কানে এসেছে-তাও বন্ধ জানালা দিয়ে চকিতে।

এখন বলা হচ্ছে গণতন্ত্রের কথা। রাজনীতিকবর্গও বৈধ জনপ্রতিনিধি সাধারণ বিবেচনায়, সামরিকতন্ত্রও নেই– এখনও তবে কেন পার্বত্য কান্নার শব্দ? হুমায়ুন আজাদের কৃতিত্ব এখানেই অনন্য যে, তিনি নিপীড়িত মানবমণ্ডলীর কান্নার ভাষা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। পেরেছেন মানবিক আর্তিতে সমস্যাটিকে ভাসিয়ে দিতে, যা পারেনি রাজনীতিবিদগণ, আমলাবর্গ ও সেনাপতিবৃন্দ।

হুমায়ুন আজাদ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, সকল বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে। মানুষকে মানুষের হৃদয়স্পর্শে জেগে ওঠতে। বাস্তব সমস্যার ঐতিহাসিক, জাতিগত, রাজনীতিক কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন মানবিক সমাধানের

www.pathagar.com

দলিল : একটি কাম্য স্বপ্নের কথা। গ্রন্থটিকে তিনি বলেছেন রাষ্ট্র বিজ্ঞান সাহিত্য। কিন্তু আমি এটাকে নাম দিতে চাই : রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাব্য– যেখানে ভাষায়, তত্ত্বে, তথ্যে, ব্যঞ্জনায় শুধু মানুষেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে–শোষণহীনতার জয়গান। এ রকম মানবিক দায়ভার কেবলমাত্র কবিরাই বহন করতে পারেন।

জাতিগত পশ্চাৎপদতাকে পুঁজি করে যারা বিদ্রোহ করেছেন কিংবা স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন তারা কারা? আধুনিক, শিক্ষিত, সমাজ পরিবর্তনে আকাঙ্ক্ষী আদিবাসী। কিন্তু তারা কি করে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র-নির্ভর শাসনের দাবি করেন? চাঁদাকে প্রয়োগ করেন অস্ত্র হিসেবে? এ প্রশ্নে হুমায়ুন আজাদ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা কাউকে কাউকে আহত করতে পারে বটে, কিন্তু সত্য এটাই যে, তিনি চান গণতান্ত্রিক ও আধুনিক পার্বত্য জীবনের উত্থান–যা সময় ও বাস্তবতার অনিবার্য দাবি। এ দাবির সঙ্গে আদিবাসী এলিটদের দাবি মিলবে না।

পার্বত্য এলিটরা চাচ্ছে বাঙ্গালিদের কাছ থেকে নিজেদের কাছে শাসন ক্ষমতা নিতে। পার্বত্য সৌন্দর্যকে বাঙ্গালিদের জন্য নিষিদ্ধ করতে। এটা নিছক ক্ষমতা দখলের স্বার্থতাড়িত লড়াই। এখানে অবহেলিত, নির্যাতিত পার্বত্য মানবমণ্ডলীর উদ্ধারের, অগ্রসরতার প্রশ্ন অনুপস্থিত। কোন মানবিক সমাধান এ পথে আসতে পারে না– কেবল শাসকের বদল হতে পারে মাত্র।

শুধুমাত্র শাসক বদলের লড়াই করে অসংখ্য মানুষকে রক্তের ঝুঁকির মধ্যে ও পশ্চাৎপদতার শিকলে বেঁধে রেখে কথিত স্বায়ত্তশাসন হবে অর্থহীন। সমস্যার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার মতো। অন্যদিকে সামরিক সমাধান বা ব্যর্থ রাজনীতিক উদ্যোগও কোন বাস্তব সমাধান এনে দেবে না। সমাধান কোন পথে, সেটা উৎসর্গে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি এভাবে : 'পাহাড়ি মানুষদের উপজাতীয় ও বাঙ্গালিদের হাতে, যারা শুধু হৃদয়ের চুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন শান্তি, যা পারবে না রাজনীতিকেরা, সেনাপতিরা, বিদ্রোহীরা।' পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত অশান্তি এবং রক্তপাতের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটে সম্ভবত সে পথে শান্তির সন্ধান করার সময় এসেছে। সময় এসেছে শেষ চেষ্টার মতো হৃদয় ঘষে শান্তি স্থাপনের।

আপাতত মনে হতে পারে এ প্রস্তাব কাল্পনিক, বাস্তবে প্রয়োগের অযোগ্য। বিশেষ করে উন্মত্ত শক্তিবাদীরা এতে ক্ষিপ্ত হবেন। এমনকি, কেউ কেউ একে বলতে পারেন ইউটোপিয়া। সব কিছু স্বীকার করে নিয়েও আমরা জানি স্বপ্নই অমর, শুদ্ধতাই অজেয়, শুভ্রতাই অবিচল। যে স্বপ্ন হুমায়ুন আজাদ পার্বত্য ক্ষুদ্র ভূমির শান্তির জন্য দেখেছেন–এমন স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই টিকে আছে শক্তিধর রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ধারণ করেছে এই নীতি 'ইউনিটি উইদিন ডাইভারসিটি'। সেখানে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তায় টিকে আছে সমগ্র পৃথিবীর অসংখ্য রুচি, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের জাতিগোষ্ঠী। কারণ, চূড়ান্তভাবে সকলেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, পৃথিবীটা প্রকৃত অর্থে কোন একক জনগোষ্ঠীর নয়–সমগ্র মানুষের। পার্বত্য চট্টগ্রামকে নানা শক্তিশালী পক্ষ এবং অবহেলিত জাতিগোষ্ঠীর অস্থির-রক্তাক্ত জনপদ

www.pathagar.com

না করে রেখে যুক্তিবাদী ও আধুনিক মানুষের বসতিতে রূপান্তরিত করা হলে সম্ভব হবে মুক্তি; আশা করা যাবে শান্তি।

সকল পক্ষের নানা উদ্যোগ এবং সফলতা ও ব্যর্থতার মুখে আমরা এমন আশাবাদ করতেই উৎসাহিত বোধ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ড. আমেনা মোহসীনের অধীনে 'Ethnic Conflics in South Asia: The Case of Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক পিএইচডি গবেষণায় অন্ততঃপক্ষে আমি এই মানবিক সমাধানের নানা দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে তাগিদ অনুভব করছি। সক্রেটিসকে উল্লেখ করে বলা যায় : 'আমরা জানি যে আমরা কি জানি না'। সম্ভাব্য সকল পথে চূড়ান্ত পার্বত্য শান্তি নিশ্চিত করার পথ বের করতে হবে। এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য যে, সততা ও আন্তরিকতার কাছে শান্তি কোন অধরা বস্তু নয়; বরং হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা অর্জন করা গেলে অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে সৎ ও আন্তরিক পথ। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামগ্রিক ও স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের এ কথাটুকু মনে রাখতে হবে।

গ) পার্বত্য সংকটের নানা মাত্রা ও ভবিষ্যৎ (মাহফুজ পারভেজ ১৯৯৮)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি সম্পর্কে প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থটি সংযোজন করেছেন উপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক-কবি আহমদ ছফা। অনেকের হয়তো জানা নেই আমহদ ছফা মূলতঃ একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ঘরানার লোক এবং সেই সূত্রে একজন সমাজ বিশ্লেষক। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো মেধাবী ও তীক্ষ্ণ লেখার মাধ্যমে তার যে স্বতন্ত্র ও বিশেষ অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে, শুধুমাত্র সে কারণেই নয়, বরং আরো একটি কারণে পার্বত্য বিষয়ে আহমদ ছফার মতামত প্রণিধানযোগ্য। কারণ সম্ভবত তিনিই একমাত্র লেখক যিনি অবলীলায় বলতে পারেন, 'বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না, আর এখন যা বলছেন শুনলে দেশের সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবে না।' (বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, ঢাকা ১৯৭২); এবং তিনিই আবার বলেন, 'আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালরা সমাজকে কিছু দিতে পারছেন না। একটা ক্রাইসিস চলছে।' (আহমদ ছফার সাক্ষাৎকার, বাংলাবাজার পত্রিকা, ৭ আগস্ট, ১৯৯২, ঢাকা)। ফলে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে অভিনব একটা কিছু তিনি বলবেন, পার্বত্য সমস্যা ও শান্তিচুক্তিকে নতুন বীক্ষণে জারিত করবেন, এমন আশা সহজেই করা যায়।

বলে রাখা ভালো যে, বাজার গরম ইস্যু পেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে খ্যাত-অখ্যাতরা কমপক্ষে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রাতারাতি রচনা করে ফেলেছেন। এসকল বইয়ের অধিকাংশই চর্বিত চর্বন। বিশেষ করে বিগতকারে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরে আসা সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ যে গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন, সেগুলোকে ব্যর্থ ভ্রমণকাহিনীর চেয়ে অধিক

www.pathagar.com

মূল্য দেয়া যায় না। ভাষা ও উপস্থাপনার ত্রুটি বাদ দিলেও সেগুলোতে তথ্য-উপাত্তের ব্যবহারে ও বিশ্লেষণে কোন মননশীলতারই ছাপ নেই। যা আছে তা হলো সেনা-সরবরাহকৃত বিবৃতি-বিবরণের অবাধ ব্যবহার এবং সেই সূত্রে কাগজ ও কালির অবাধ অপব্যবহার। মূলতঃ এসব হলো সরকারি ভাষ্যের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, অথচ অক্ষম সংস্করণ।

আহমদ ছফার 'শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ' গ্রন্থটি ছাড়া বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আর মাত্র দু'টি বই পাঠকদের সত্যিকার অর্থে মুগ্ধ ও উপকৃত করেছে। প্রথমটি ১৯৯৭ সালে ইউপিএল থেকে প্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ড. আমেনা মোহসীনের লেখা 'The Politics of Notionalism : The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.' ক্যাম্ব্রিজে সম্পন্ন পিএইচডি গবেষণার ভিত্তিতে রচিত এ গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক দর্শনের জগতে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা এবং জাতীয়তাবাদের সংকটগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শান্তির জন্য পার্বত্য মানুষের স্থায়ী ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি লিখেছেন ড. হুমায়ুন আজাদ, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা' নামে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুখ পাঠ্য, তথ্যবহুল গ্রন্থটির মূল বক্তব্য হলো : 'চুক্তি করে নয়, পাহাড়িদের অবস্থার উন্নতি করেই শুধু সেখানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব শান্তি।'

আহমদ ছফার গ্রন্থের (ইনফো পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৮) মূল বক্তব্য হলো : 'পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সকল দাবি যদি মেটানোও হয়, তারা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিযুক্ত থাকলে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাদের দারিদ্র্য তাদেরকে বিচ্ছিন্নতার পথে টেনে নিয়ে যাবে। প্রচলিত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, সেগুলো পার্বত্য এলাকার শান্তি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবে না' (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ২৫)।

এমন একটি সামগ্রিক মন্তব্য করার পেছনে কাজ করেছে আহমদ ছফার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পার্বত্য সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বিবেচনা। জানা মতে সম্ভবত তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি পাঁচ দিন সাত দিনের সরকারি মেহমান হয়ে পার্বত্য অঞ্চল সফর করেননি; ষাটের দশকে সর্বমোট এক বছর তিন মাস পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অংশে বসবাস করেছেন এবং পায়ে দলে অনেকাংশ সফর করেছেন। পুলিশের চোখ এড়ানোর জন্যই যেহেতু পার্বত্য জনপদে তিনি থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেহেতু তার অবস্থান ছিল গভীর-নিভৃত অঞ্চলে এবং অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তাকে আদিম সমাজের ভেতরে গিয়ে মিলেমিশে থাকতে হয়েছিল। ফলে পাহাড়িদের বঞ্চনা, জীবন-সংগ্রাম এবং বাঙ্গালিদের প্রতি মনোভাবের একটি প্রত্যক্ষ বয়ান তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। তার ভাষায়, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ধারণায়: 'বাঙ্গালিরা চোর, প্রতারক, লম্পট। তাদের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানেরা

www.pathagar.com

বাঙ্গালিদের কাছে নিরাপদ নয়। তারা কৌশলে তাদের ভূ-সম্পত্তি দখল করে নেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ঠকায়। তাদের কাছ থেকে জিনিস কেনার সময় পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে টাকা ধার দিয়ে চড়াসুদে আদায় করে সর্বশান্ত করতে বাঙ্গালিদের বাঁধে না। আমি বাঙ্গালিদের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অত্যাচার, বিশ্বাসভঙ্গের এতো কাহিনী শুনেছি তার সবগুলো যদি বিস্তারিতভাবে বয়ান করি, বিশাল কলেবরে একটা গ্রন্থ দাঁড়িয়ে যাবে' (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ১১)।

ফলে আহমদ ছফা সরকার বা বিরোধী দল বা কোন প্রতিষ্ঠিত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে পার্বত্য জনপদের সমস্যাটিকে দেখেননি: দেখেছেন মানবিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে, বেদনার্ত ভালবাসায়।

পরবর্তীভাগে, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে দেখেছেন। আলোচনা করেছেন প্রতিবেশী ভারতের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট সাতটি অস্থির রাজ্যের সমস্যার সূত্র ধরে: ভূপ্রকৃতি ও নৃতত্ত্ব অনুসারে যেসব রাজ্যের অভিন্নতা আছে। সেসব এলাকার বিচ্ছিন্নতা, কেন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতা এবং বিদেশী শক্তির উস্কানী ও গোপন সহায়তাকে টেনে নিয়ে আহমদ ছফা পার্বত্য রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাকেই মূলত উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান আমলে ভারতীয় উপজাতি বিদ্রোহীদের মদদ ও চট্টগ্রামের পার্বত্য বিদ্রোহীদের ভারতীয় মদদের প্রসঙ্গেও কিছু কথা আছে। নির্যাতিত পাহাড়িদের রুখে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আহমদ ছফার মতে, '...পার্বত্য সংকট ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বিরাজমান সংকটের একটি সম্প্রসারিত রূপ' (পৃ : ১৫)। তিনি মনে করেন : 'প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে আলোচিত হোক না হোক ভারত এ চুক্তির শক্তিশালী পক্ষ। ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ না পেলে পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহীরা পূর্ব থেকে শর্ত আরোপ করে বাংলাদেশকে আলোচনার টেবিলে আনতে বাধ্য করতে পারতো না' (পৃ: ১৫)। তিনি মনে করেন শান্তিচুক্তির দুটি দিক: ১. পার্বত্য জনগোষ্ঠী যেন সকল আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে শান্তিতে বাস করতে পারে: এবং ২. বাংলাদেশের আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি যেন সুনিশ্চিত হয়। এচুক্তির মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে প্রতিবেশী ভারত পূর্ব ভারতীয় রাজ্যসমূহের সংকটের সাথে বাংলাদেশের পার্বত্য গোষ্ঠীকে জড়িত করে বাংলাদেশের ওপর অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার ভেতরের সংকট বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দেবার সুযোগ না পায়। পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করার সামান্যতম অবকাশও যদি থাকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুদূর পরাহত হয়ে উঠবে। বড়জোর একটা ব্যালেন্স অব টেরর হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে' (পৃ: ১৬)।

বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সকল পর্যায়ে ভারত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে বলেও মনে করেন আহমদ ছফা (পৃ: ১৯) পার্বত্য জনগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

সংগ্রামের ধারাবাহিকতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন : ১. বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্যোন্নয়নের কোন ইশারা খুঁজে পাননি: ২. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব কাজ করেছিল: যদিও পাহাড়িদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন: ৩. পাহাড়ি এলিটদের পাকিস্তানি শাসকবর্গ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেয়ায় রাজকীয় প্রভাবে পার্বত্য সাধারণগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন: ৪. স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বাঙ্গালি হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, এ ঘোষণা থেকেই নতুন বাস্তবতার সূত্রপাত: ৫. চীনপন্থী বাম চরমবাদীদের অবস্থান গ্রহণের ফলে তাদের প্রভাব: ৬. ভারতপন্থী ধারার সৃষ্টি: ৭. উপদলীয় কোন্দলে ভারতপন্থীদের বিজয় ও দৃঢ় সামাজিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহকে।

১৯৭৫ সালে ক্ষমতার পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পার্বত্য বিদ্রোহীদের চোরাগুপ্তা হামলা ও নানা ধরনের চাপের মুখে একটি সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছিলেন: পরবর্তী শাসক এরশাদও পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ মোকাবেলা করার জন্য সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একচুল সরে আসেননি। আহমদ ছফার মতে, বিগত বিশ বছর ধরে সেনাবাহিনীর নির্যাতন, বিদ্রোহীদের প্রতি-আক্রমণ ইত্যাদির ফলে 'বিরোধ সেনাবাহিনী এবং শান্তিবাহিনীকে ছাড়িয়ে পাহাড়ি এবং বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে' (পৃ: ২০)। বিএনপি'র বেগম খালেদা জিয়ার আমলে সেনা সমাধান নয়,আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের যে ধারা বিএনপি শুরু করেছিল, ১৯৯৮ সালে এসে আওয়ামী লীগ সেটাকে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করে। ইতোমধ্যে চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে নানা জনমত গড়ে ওঠেছে, এসব পরস্পরবিরোধী মতামতকে পাশ কাটিয়ে ছফা মনে করেন : 'পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাথে যে কোন চুক্তি সম্পাদনের বেলায় ভারতীয় কূটকৌশলের ফাঁদে আমরা যেন জড়িয়ে না যাই।' এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন : 'মনে রাখতে হবে যেখানে চুক্তি করা হয়, চুক্তি ভঙ্গ করার একটি অবকাশও সেখানে থেকে যায় (আহমদ ছফা ১৯৯৮)। বস্তুত তিনি চেয়েছেন : 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টগুলোতে যুদ্ধাবস্থা বজায় রেখে এ পর্যন্ত যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সেই অর্থটাই মূলধন হিসেবে পার্বত্য জনগণকে প্রদান করা হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ অনেকখানি প্রসারিত হবে।' কারণ তিনি পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে দেশের ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত করে সমস্যার সমাধান কল্পনা করেছেন।

গ্রন্থটিতে পার্বত্য রাজনৈতিক আঞ্চলিক মাত্রাগুলোই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখা বইগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম। শান্তিচুক্তিকেও তিনি একতরফা মেনে নেয়া বা প্রত্যাখ্যান করার বদলে গণতান্ত্রিক রেফারেন্ডামে দেয়ার প্রস্তাব করেছেন। তার আশংকা : 'পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির মধ্যে এমন কিছু বিস্ফোরক উপাদান আছে, যা উপজাতি-অউপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির

www.pathagar.com

পরিমাণ বাড়াবে, দেশের অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলে এবং নানা অংশে ছড়িয়ে দেবে অশান্তির আগুন।'

অবশেষে রেফারেন্ডাম ছাড়াই যখন শান্তিচুক্তি গৃহীত হলো তখন আহমদ ছফা চুক্তিটিকে কেন বিরোধিতা করেন সেটা উল্লেখ করলেন : ১. শান্তিচুক্তি বিভেদ বাড়িয়েছে: ২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; ৩. আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে যতগুলো চুক্তি করা হয়েছে তার কোনটিতেই জাতীয় স্বার্থের প্রতি সুবিচার করা হয়নি; ৪. এই ক্ষেত্রে ভারত জুজু নয়, মূর্তিমান প্রবল উপস্থিতি: ৫. পার্বত্য অঞ্চলে গ্যাস-তেল উত্তোলনের জন্য মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি: ৬. মার্কিন কোম্পানি কর্তৃক ভারতে গ্যাস-তেল সরবরাহের চুক্তি ইত্যাদি বিষয়কে। যেসব বিষয়কে তিনি অত্যন্ত জটিল, স্পর্শকাতরতা ও অনুপ্রবেশের উপযুক্ত ছুতা বলে মনে করেন (আহমদ ছফা ১৯৯৮ : ৩৪)।

আহমদ ছফার অনেকগুলো নিবন্ধের সমন্বয়ে এ গ্রন্থ। এতে বহু নতুন নতুন মাত্রা স্পর্শ করা হয়েছে। কিন্তু সে সকল মাত্রাকে আলাদা আলাদাভাবে গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আওতায় আনা হয়নি। হতে পারে চুক্তি পরবর্তীতে অতিদ্রুত কেবলমাত্র নানা দিক ও মাত্রাকে উন্মোচিত করা হয়েছে; পরে বিস্তারিত লিখার পরিকল্পনা হয়তো আহমদ ছফার রয়েছে। সন্দেহ নেই, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও চিন্তার সংযোজন করবে।

www.pathagar.com

একবিংশ শতকের বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিশ্বব্যাপী শুরু হয়ে গেছে ব্যাপক তোড়জোড়। ইউরোপের দেশে দেশে গ্রহণ করা হয়েছে নানা আয়োজন। সকলেই এখন ব্যস্ত একটি নতুন শতককে আমন্ত্রণ জানাতে। এটি শুধুমাত্র একটি নতুন শতকই হবে না– হবে নতুন সহস্রাব্দও। ২০০০ সালের সূচনায় ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায়ই সূচিত হবে।

যে সময়কে আমরা অতিক্রম করেছি, ঐতিহাসিকরা সেটাকে ভাগ করেছেন তিনটি স্বতন্ত্র পর্বে : ক. এজ অব এগ্রিকালচারাল রেভিলিউসান বা কৃষি বিপ্লব কাল; খ. এজ অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভিলিউসান বা শিল্পবিপ্লব কাল এবং গ. এজ অব অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাল।

আগামী শতক বা সহস্রাব্দকে কী নামে অভিহিত করা হবে, সেটা এখন পর্যন্ত স্থিরভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও বলা যায় যে, অনাগতকাল হবে তথ্য প্রযুক্তির, যোগাযোগ প্রযুক্তির দাস; এবং আগামীদিনে পৃথিবীর মানুষের সামনে যে সীমাহীন চ্যালেঞ্জ থাকবে, তার জন্য প্রয়োজন হবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির; প্রয়োজন হবে শান্তি, ঐক্য এবং স্থিতির।

আগামী শতকে পৌঁছুবার প্রাক্কালে সে সময় ও বাস্তবতার মূল আবেদন আমরা এখনও অনুধাবন করতে পারিনি। কারণ, এক সময় অবিভক্ত বাংলা যা ভাবতো– সমগ্র ভারতই সেটা ভাবতো পরে। চিন্তার নেতৃত্বে ছিল বাঙ্গালির অধীন। সেদিন গেছে। আমরা আধুনিক দুনিয়ার ভাবনা ভাবি অনেক পরে। পশ্চিমা দুনিয়া থেকে আমরা শত বছর পিছিয়ে আছি।

তাহলে আমরা করছিটা কি? 'বাংলাদেশের বেকারদের আমেরিকায় কাজের সুযোগ' শিরোনামের প্রচ্ছদ কাহিনীতে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে এর যুৎসই জবাব দিয়েছিলেন তরুণ কম্পিউটার-প্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন। তার লেখা থেকেই কিঞ্চিত তুলে ধরি, "... ইংরেজিতে জনপ্রিয় একটি গালি হলো–'হোয়াট দি হেল ইউ আর ডুয়িং?' বাংলাতে অনুবাদ করে ঠিক কাছাকাছি তেমন কিছু পাওয়া গেল না। তাই বলা হলো আমরা আসলে করছিটা কি? প্রশ্নটা যদিও সামগ্রিক হয়ে গেল তারপরেও উত্তরটা দেয়া কঠিন।...কিন্তু সত্যিকারভাবেই যদি বুকে হাত দিয়ে বলতে হয় তাহলে আমরা যে কি করছি তা বোধ করি বলতে লজ্জা লাগবে। বাংলাদেশের মতো হত-দরিদ্র একটি দেশের ভবিষ্যৎ কি? জনসংখ্যা যে হারে

www.pathagar.com

বাড়ছে, জমির পরিমাণ যে হারে কমছে, বেকারত্ব যে হারে বাড়ছে তাতে আগামী দশ বছর পর গিয়ে এই দেশটি দাঁড়াবে কোথায়?"

এটা আগামী শতকের শত চ্যালেঞ্জের সময়ের বড় চিন্তা হলেও কার্যত এ বিষয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সরকারি দল বলছে সব ঠিক আছে, জোয়ার বইছে উন্নয়নের ও বিরোধী দল বলছে কিছুই হচ্ছে না—সবই রসাতলে যাচ্ছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার চরমপন্থী দুটো ধারা এখন বাংলাদেশে। এই দুই ধারা বাস্তব থেকে, সত্য থেকে শত-সহস্র যোজন দূরে। আবেগ আর বিরাগের শক্তিতে এদের পথ চলা। এদের কাছে সত্য বড় নয়, বড় হলো নিজ নিজ অবস্থান এবং সেই অবস্থানের আপাত বাস্তবতা।

স্বাধীনতার পর ২৭ বছর কেটে গেছে। সাতাশ বছর কম সময় নয়। এ সময়ের একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা আছে। আছে দলীয় ব্যাখ্যা। আওয়ামী লীগ দলগতভাবে এক রকম, আবার বিএনপি দলগতভাবে আরেক রকম ব্যাখ্যা দিচ্ছে বিগত সময়ের। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণে পরিমাপ করা হচ্ছে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির। কিন্তু সামাজিকভাবে বিগত ২৭ বছরে আমরা কি পেয়েছি? সামাজিক গতিশীলতার ব্যাখ্যায় ২৭ বছরকে বিচার করলে কি দেখতে পাবো আমরা? ২৭ বছরের অধিকাংশ সময়ই গেছে নিদারুণ অস্থিরতায় আর ভয়াবহ উদাসীনতায়। কখনও আলস্যের 'কালা পাহাড়' আমাদের উপর চেপে বসেছে। কখনও আমরা ছিলাম সামগ্রিক অস্থির পরিস্থিতির প্রভাবে তীব্র অস্থিরতার শিকার। আবার কখনও দাসত্ব গ্রহণ করেছিলাম নৈরাজ্যের। আমাদের উপর প্রভুত্ব করেছে অজ্ঞতার অচলায়তন। কেউ আমাদের পথ দেখায়নি, আবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ আমাদেরকে দেখানো পথের শেষ সাফল্যে নিয়ে যেতে পারেননি। ঘুরপাক খেয়েছি আমরা, প্রচণ্ড ঘুরপাক। কর্মের বদলে কথায় বিশ্বাস করে আমরা মরেছি। গোটা কতক প্রজন্ম নষ্ট হয়ে গেছে; এখনও অবিরাম চলছে নষ্ট হবার পালা। আমরা বলিষ্ঠ হবার বদলে রুষ্ট হতে শিখেছি। ব্যর্থ ক্রোধে জীবনের সৌন্দর্য বিনির্মাণ করা হয়নি। অথচ জীবনকে ভালবাসে বলেই মানুষ জীবনের সৌন্দর্যের জন্য যুদ্ধ করে, একথা তো বলে গেছেন 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' খ্যাত জুলিয়াস ফুচিক। আমরা জানি না জীবনকে ভালবাসার প্রকৃত অর্থ, জানি না জীবন-সৌন্দর্যের নান্দনিক ব্যাখ্যা।

জীবনকে ভালবাসতে গিয়ে ব্যক্তিক জীবনের দায় শোধ করতে লেগেছে কেউ কেউ। পদ-পদবী-ক্ষমতা ব্যবহার করে গড়ে নিচ্ছে নিজস্ব জীবন। ব্যাংক ঋণ, তছরূপ, অবৈধ পথে রাঙিয়ে তুলছে ব্যক্তিগত জীবনের সুন্দরতম(!) আলো। অথচ এই ব্যক্তিরা জানে না, নগরে আগুন লাগলে খোদ দেবালয়ও রক্ষা পায় না। পচনশীল, নিয়তিবাদী, নিমজ্জিত সমাজের সংকটাপন্ন কাঠামোয় দাঁড়িয়ে ব্যক্তিক জীবনের সৌন্দর্য ছারখার হয়ে যেতে বাধ্য। তাদের অন্ধ ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ প্রলয় বন্ধ করতে পারবে না। না হবে তাদের উপার্জন নিরাপদ, না হবে তার উপভোগ নিশ্চিত। তারা হবে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার অধঃপতনের বলির পাঁঠা।

www.pathagar.com

কেনেথ ক্লার্কের একটি মন্তব্য আজ বড় প্রাসঙ্গিক– 'সর্বস্তরে আস্থার অভাবে একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়।' আস্থার অভাব লেগেছে সর্বত্র। ছাত্র হতাশ, জানে না সে ভর্তি হতে পারবে কি-না! ভর্তি হয়ে পাস করতে পারলেও জানে না চাকরি পাবে কি-না! চাকরিজীবী জানে না, বাঁধা বেতনে তার মাস চলবে কি-না! বেকার জানে না কবে তার কর্মের সংস্থান হবে! অভিভাবক জানে না তাঁর সন্তানের ভবিষৎ কন্টকমুক্ত হবে কি-না! এই যে সর্বব্যাপ্ত আস্থাহীনতা, হতাশা– এর শেষ কোথায়? হতাশার মুক্তি আর আস্থার বিকাশ না হলে সমাজ-সংসার-মানুষ অধঃপতন থেকে উঠে আসতে পারবে না। আর এই অধঃপতিত স্রোতে উন্নত রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি কিছুই প্রত্যাশা করা যাবে না।

কেন এমন হচ্ছে, সেটা অনুসন্ধান করে আমাদের দেখা দরকার। কারণ আশা হয়তো মরে গেছে: মানুষ ভুলে গেছে সৎ প্রত্যাশা করতে; ভুলে গেছে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে। শিক্ষা আর আলোকিত মানুষ তৈরি করছে না; করছে শুধু শিক্ষিত লোক। শিক্ষকের লক্ষ্য শুধু ছাত্র বা শিক্ষা নয় আরো কিছু। রাজনীতির লক্ষ্য সুশাসন নয়, গণিতের পরিসংখ্যানের গণতন্ত্র।

ইউরোপ তথা পশ্চিমা বিশ্ব আদর্শ ঠিক করেছে যে, তারা নেতৃত্ব দেবে, নাম্বার ওয়ান হয়ে থাকবে সকল ক্ষেত্রে। আমরা কোন আদর্শ গ্রহণ করেছি সেটাও জানি না। কেন যে অবিরাম পিছিয়ে যাচ্ছি সেটাও পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারছি না।

এই অবস্থা চলতে থাকলে কোনভাবেই বিশ্বাস করবার উপায় নেই যে, জাতি হিসাবে আমরা কখনও সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছুতে পারবো! আদর্শহীন সমাজ দিক-নির্দেশনাহীন জাহাজের মতোই দিকভ্রান্ত। আমরা হলাম সেই জাহাজের হতভাগ্য যাত্রী।

আদর্শ বলতে এখানে আমরা কোন রাজনৈতিক আদর্শকে বুঝাচ্ছি না। রাজনৈতিক আদর্শ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লেখা থাকে। রাজনৈতিক আদর্শ সময় ও বাস্তবতায় বদলায়, পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত-সংস্কারকৃত হয়। কিন্তু সামাজিক আদর্শ? যে আদর্শ সমাজের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, শক্তিশালী করে– সেটা কোথায়? সে আদর্শ না থাকলে জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে, অন্তর্গত সম্পদে জেগে ওঠা সম্ভব হয় না। সে আদর্শ ছিল বলেই ১৯৭১ সালে বাঙ্গালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল। সে রকম কোন আদর্শ এখন নেই বলেই জাতিকে হতাশামুক্ত করে সম্মানজনক স্থানের অভিমুখী পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

একবিংশ শতকের পদধ্বনিতে জেগে উঠেছে সারা বিশ্ব। বিশ্বের কেন্দ্র ও প্রান্তে প্রান্তে সকল জাতি তৈরি হচ্ছে অনাগতকালের সীমাহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য। সে সময় মানবজাতি মুখোমুখি হবে কিছু ভয়ঙ্কর সমস্যার–ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্যহীনতা, বিপর্যয়, প্রতিকূলতার। এসকল সমস্যাকে পরাজিত করেই মানব প্রজাতিকে টিকে থাকতে হবে: অর্জন করতে হবে শিক্ষা, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মেধার চরমতম উৎকর্ষ। সমগ্র বিশ্বে সাজ সাজ রবে সবাই

www.pathagar.com

তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশে আমরা কি করছি? আমরা স্বাধীন হয়েছি, গণতন্ত্র পেয়েছি– বিনামূল্যে নয়, শত-সংগ্রাম আর রক্তদানের বিনিময়ে। স্বাধীন হয়েছি বলেই আমরা মুক্ত, গণতন্ত্র পেয়েছি বলেই আমরা বাঁধাহীন। কিন্তু আমাদের কর্মকাণ্ড কোন স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মানুষের মতো নয়, কারণ সকল ক্ষেত্রে আমরা স্থবির হয়ে গেছি। সামনে যাবার দিক-নির্দেশনা বা আদর্শ আমাদের কাছে নেই। একবিংশ শতকের পদধ্বনিতেও যদি আমাদের ঘুম না ভাঙে তাহলে সেটা হবে জাতির জন্য চিরনিদ্রার মতোই অভিশপ্ত। একটি স্বাধীন-গণতান্ত্রিক জাতি সাময়িক হতাশ হতে পারে, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। আমাদের ঘুম ভাঙতে হবে– বিপুল বিক্রমে, সঠিক পথে চলার লক্ষ্যে জেগে উঠতে হবে (মাহফুজ পারভেজ ১৯৯৮ : ৫৮-৫৯)।

একবিংশ শতকের অভিমুখে জেগে উঠার প্রয়োজনে অপরিহার্য অনুসঙ্গ হলো শান্তি ও স্থিতি। বিশৃঙ্খলদের জেগে উঠা মানে বিশৃঙ্খলতা আরো বৃদ্ধি পাওয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি সকলের কাছেই কাঙ্ক্ষিত এই জন্য যে, পার্বত্য অশান্তি ক্ষুদ্র বাংলাদেশকে এগুতে দেয়নি। হত-দরিদ্র ললাটে আরো দারিদ্র্যের অভিশাপ নিয়ে এসেছে। পার্বত্য অশান্তির কারণে বছরের পর বছর বেড়ে গেছে সামরিক বাজেট; নিম্নের ছকে সেটা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে :

ছক -৪
ক্রমবর্ধমান সামরিক বাজেট

বছর	ডলার (মিলিয়ন)
১৯৭৫	৪২
১৯৭৬	৮৬
১৯৭৭	১৩৬
১৯৭৮	১৪০
১৯৭৯	১৩৫
১৯৮০	১৩৮

সূত্র : (II SS. 1985 : 172)

ক্রমবর্ধমান সামরিক বাজেটে ব্যয়কৃত টাকা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে কাজে লাগানো গেলে দরিদ্র বাংলাদেশের জন্য কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার হতো। শান্তি ও স্থিতি বিরাজমান থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে ও পাহাড়ের গভীরে, ভূ-গর্ভে সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ, তেল, গ্যাস, খনিজ আহরণ ও কাজে লাগানো যেতো। বন্ধ করা যেত ভ্রাতৃঘাতী লড়াই, মৃত্যু, ধ্বংস, রক্তপাত ...। এবং ইতিবাচক শক্তিতে সম্মিলিতভাবে একবিংশ শতকের দিকে বিজয়ী পদভারে এগিয়ে যাওয়া যেত। যা

www.pathagar.com

হয়নি, সেজন্য হাহাকার না করে ভবিষ্যতকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায়; অতীতের সংঘাতকে কিভাবে সম্প্রীতিতে রূপ দেয়া যায়– সে পথ সন্ধান করে স্থায়ী সমাধান আনয়নই হবে জরুরি।

শান্তিচুক্তি সম্পাদনকারী আওয়ামী লীগ সরকার এবং চুক্তির বিরোধিতাকারী বিএনপি– কেউই শান্তির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করছে না; মতভেদ হলো শান্তি অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে। কোন প্রক্রিয়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভূল হতে পারে না; প্রক্রিয়াটি চলতে চলতে এর প্রায়োগিক সমস্যাগুলো বেরিয়ে আসে; পরিবর্তিত সময় ও বাস্তবতায় প্রয়োজন হয় নানা অদল-বদলের। ফলে অনাগত ভবিষ্যতেও যদি সর্বমহলের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব দেখা না দেয়, তাহলে যে কোন শুভ ও শান্তিকামী উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হতে বাধ্য। তবে তাত্ত্বিকরা বলছেন : Conflict resolution demands participation of all the parties in reaching the outcome (D.R.Z.A Nazneen 1996 : 34). অর্থাৎ সংঘাত নিরসনে কাংখিত ফল পেতে হলে বিবদমান সকল পক্ষকেই অংশ নিতে হবে বা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংঘাত নিরসনে সকল পক্ষের অংশগ্রহণ পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হয়নি; বাঙ্গালিরা বঞ্চিত বোধ করছেন; শান্তিকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আরেকটি আশংকার কথাও বলা হয়েছে পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে : ... Conflicts cannot be totally eliminated, This can be minimized and their occurrences can be greatly prevented with a view to achieving stability in the society and body politics, and to having economic prosperity (D.R.Z.A Nazneen 1996 : 33). সংঘাত চিরতরে নির্মূল করা যায় না; নিয়ন্ত্রণ করা যায়–এটাও অতীতে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। যে জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে শোনা যায় 'হৃদয়ের চুক্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আকুতি' (হুমায়ুন আজাদ ১৯৯৭)। কারণ চুক্তি করা হলে সে চুক্তি ভাঙারও একটি পথ খোলা থেকেই যায়। ইতিহাসে অসংখ্য চুক্তি ও চুক্তি ভঙ্গের ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। চুক্তি একটি লিখিত শর্তমালা মাত্র; অন্যদিকে যাদের জন্য শর্তাবলী, অর্থাৎ মানুষ, তারা ভীষণ স্পর্শকাতর। ফলে স্পর্শকাতরতা কোন সুযোগে কি করে বসবে, সেটা আগেভাগেই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। ফলে কেবল চুক্তিই স্থায়ী শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি নয়। এ লক্ষ্যে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই আরো কিছু কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের তাগিদ উচ্চারিত হয় তিনদিনব্যাপী গোল টেবিল বৈঠকে। এতে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশসহ (আজকের কাগজ ১৯৯৭) : দেশের আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়ে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দান, বিভিন্ন জাতীয় ও গণমাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান, তাদের ভূমি অধিকার

www.pathagar.com

প্রথার আইনগত স্বীকৃতি প্রদান, বিশেষ আদালতের মাধ্যমে তাদের ভূমিচ্যুতি প্রতিরোধ, বনের ওপর আদিবাসীদের প্রথাগত ও ঐতিহ্যগত অধিকারের স্বীকৃতি, তাদের সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞান-মেধা-অধিকার সংরক্ষণ, স্থানীয় সরকার পরিষদ, জাতীয় সংসদসহ প্রশাসনে ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে মহিলাসহ আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সংখ্যাগুরুদের একচ্ছত্রতার কবল থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে হবে (Amena Mohsin 1997)। তা না হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের কারণে আদিবাসীরা প্রান্তিক অবস্থায় চলে যাওয়ায় তারা জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেনা, সুযোগ আদায়ের জন্য তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক পন্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী পথ অনুসরণ শুরু করতে পারে; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পটভূমি পর্যালোচনা করলে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, অন্য কোন উপজাতির ক্ষেত্রে যেন তেমনটি না ঘটে; কারণ উপজাতিদের আছে বিদ্রোহ করবার বহু ঐতিহ্য, সে পথে তাদেরকে ঠেলে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে (Satish Kakti 1993)। এক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরে যে রক্তাক্ত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হচ্ছে সেটা মনে রাখতে হবে। কারণ, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিসত্তার নানা দাবিতে আঞ্চলিক আন্দোলন তীব্র রূপ পেয়েছে। বোড়োল্যান্ড থেকে কাশ্মির, উত্তরখণ্ড, ঝাড়খণ্ড থেকে গোর্খাল্যান্ড সর্বত্র স্বাধিকার, পৃথক রাজ্য, ক্ষেত্র বিশেষে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি সোচ্চার। এ যেন সেই মুঘল আমলের শেষ পর্বের অবস্থা! সবাই পছন্দমতো দাবি করে বসছে এবং দাবি আদায়ে চরম সন্ত্রাসবাদী পথ অনুসরণ করছে। কিন্তু কেন সর্বত্র এই বিক্ষোভ, অসন্তোসের বহ্নি? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী কেউই এর মূল শেকড়ে যেতে আগ্রহী নন। সংবাদপত্রগুলিও এই সমস্যার মূল অনুসন্ধানে ব্যগ্র নয়। কোনও অঞ্চল দীর্ঘ বঞ্চনা ও আবেদন-নিবেদনের পর যতক্ষণ না সন্ত্রাসবাদী পথে বিক্ষোভ প্রকাশে তৎপর হয়, ততক্ষণ সবাই নিরুদ্বিগ্ন। আঞ্চলিক বৈষম্য, ভাষা-সংস্কৃতির অবহেলা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহিরাগতদের চাপ তথা প্রাধান্য রাজ্যের বা বিশেষ অঞ্চলে অবদমিত আগ্রাসনের মানসিকতা সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসবাদ এরই বহিঃপ্রকাশ (সজল বসু ১৯৯৫ : ৯)।

বাংলাদেশের জন্য আশার কথা হলো, ভারতের মতো এতো বহু বিচিত্র ভাষা, জাতিসত্তা এখানে নেই: সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী বিচ্ছিন্নতাও এদেশে নেই। এদেশে আছে একক বাঙ্গালি জাতিসত্তা এবং খুবই অল্প সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। এবং যাদের বেশির ভাগেরই বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংযোগ, অর্থনীতি ও সম্পৃক্ততায় পাহাড়িরা বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজ থেকে কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন একটি সমাজ নয়, বরং ভৌগোলিকভাবেও অঙ্গাঙ্গী জড়িত। পাহাড়িদের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতি-প্রকৃতিতে লক্ষ্য করা গেছে তাদের বিচ্ছিন্নতা যা ইংরেজ-পাকিস্তানি

www.pathagar.com

ও বাংলাদেশেও কার্যকর ছিল। তাদের বিচ্ছিন্নতাকে ভালোভাবে নির্মূল করার জন্য বৃহত্তর সমাজে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসার বদলে বল প্রয়োগ নীতি হিতে-বিপরীত হয়েছিল। অথচ মূল বাঙ্গালি সমাজের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পাহাড়িরা নানাভাবে পথ খুঁজেছে; কিন্তু সোজা পথ তারা পায়নি। নানা কারণে সংযোগের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজের যে সম্পর্ক তাকে মহানদীর সঙ্গে শাখানদীর সম্পর্কের প্রাকৃতিক বিবেচনায় তুলনা করা যায়। উভয়ের মধ্যে গতি-প্রকৃতি ও রূপের পার্থক্য আছে; কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নেই। এবং এই শাখানদীর স্রোত অতীতের ইতিহাসে বার বার বাধা পেয়েছে বলেই মহানদীর ঐশ্বর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বিভীষিকা দৃশ্যত সে অপরূপ অংশটিকে মূল দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করেই রেখেছিল– সমগ্র বাংলাদেশের সৌন্দর্য এতে অতি অবশ্যই ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তাই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে যে মুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে, তাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে দুটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে– যেগুলো আসলে আরো আগেই হওয়া জরুরি ছিল। যে দায়িত্ব পালনের তাগিদ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই বোদ্ধা ও চিন্তাশীল মহল থেকে উত্থাপিত হচ্ছে; এর মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি সামাজিক ভিত্তি পাবে– চুক্তির কঠিন শর্তের আলোকে শান্তি ধরে রাখতে হবে না। আর এ কথা তো' সকলেরই জানা যে, রাজনৈতিক চুক্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বা সরকার পরিবর্তনের ফলে বা বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে যখন-তখন অকেজো হয়ে যেতে পারে; কিন্তু সামাজিক ঐক্য সমাজ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিনই অক্ষুণ্ন থাকার মতো শক্তি ধারণ করে। তাই সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক. আদিবাসী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন; এবং খ. আদিবাসী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ সাধন করতে হবে। এই কর্তব্য একই সঙ্গে পালনীয়। নৃত্যে, গীতে ও রূপকথায় সুললিত প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী সমাজ। তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিরাভরণ মূর্তির অন্তরালে যে বৃহৎ সামাজিক সদগুণের ঐশ্বর্য আছে, তার মর্যাদা কোনভাবেই অবজ্ঞা করা যায় না। আধুনিক সভ্যতার বহু অভিশাপ থেকে মুক্ত পাহাড়ের নিভৃতে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ থেকে বহু শিক্ষণীয় নীতি বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সাদরে গৃহীত হবার উপযুক্ত। আদিবাসীর সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শের দিকে তাকিয়ে দেখলে আধুনিকতা গর্বিত না হয়ে লজ্জিত হতে পারে– কি উদার সামাজিক সমবায়ের মাধ্যমে তারা প্রতিকূল প্রকৃতি, অটল পর্বত আর সংকুল অরণ্যকে পরাজিত করে বিজয়ী জীবনযাপন করছে! সামাজিক সাম্যে সমৃদ্ধ আদিবাসী সমাজে-সংসারে নারী অবলা কিংবা অপমানিত নয়। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার-সমমর্যাদা আদিবাসী সংস্কৃতিকে মহীয়ান করেছে। কোন রকম অবহেলা বা কার্পণ্য ছাড়াই আদিবাসী সমাজের সদ্‌গুণ গুলোকে খুঁজে বের করতে হবে, হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না এবং সমগ্র সমাজে প্রযুক্ত করতে হবে। একই

www.pathagar.com

ধারায় নৃত্য-গীত-সঙ্গীত-চিত্রকলা-শিল্পকলা-সংস্কৃতি-লোকাচারসহ সকল ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে; আদিবাসীদেরকেও সম্মানের সঙ্গে মূলস্রোতে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। মনে রাখা ভাল, তাপিত-পীড়িত-দরিদ্র-অবহেলিত বাঙ্গালির যে সমস্যা, আদিবাসীর সমস্যাও তার চেয়ে ভিন্ন নয়। সামন্তবাদ, উপনিবেশিকবাদ তাদের নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করেছে। দুঃখ, দুর্দশা ও ক্লেশের সম্পর্কেও আদিবাসী সমাজ এবং সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালি উভয়েই পরস্পরের আত্মীয়। একজন বাঙ্গালির কাছে যেমন, একজন আদিবাসীর কাছেও তেমনি বাংলাদেশই হলো প্রথম ও শেষ ভরসাস্থল। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব অবহেলা করা যায় না। কেননা, মূল ভূ-খণ্ডের বাঙ্গালির মতোই ভারতীয় পর্বতমালার প্রান্তীয় অঞ্চলে বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা চট্টগ্রাম বন্দর ও বাংলাদেশের ওপরই প্রাকৃতিকভাবে নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। দিল্লি তাদের জন্য রূপকথার দূরত্বের আশ্রয়, তাদের সহানুভূতি রাজনৈতিক মায়াকান্না। লড়াই করে, শরণার্থী হয়ে, মানবেতর জীবনযাপন ও লাঞ্ছনা শেষে করে অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এ সত্যকে পাহাড়িরা প্রমাণ করেছেন; তাদের দেশপ্রেমিকতার মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। আমরা যখন বুকে জড়িয়ে না ধরি, তখন তারা বাধ্য হয় বিকল্প আশ্রয়ের। এমন ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বৃহত্তর বাঙ্গালি জাতির সঙ্গে পাহাড়ি জাতিসত্তার সম্পর্কহীনতাও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ রাজনৈতিকভাবে পার্শ্ববর্তীরা যেমন নিতে পারে, তেমনি নিতে পারে তৃতীয় কোন পক্ষ। আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল। আদিবাসীদের কাছে ত্রাণকর্তার মতো এলো পাদ্রীরা; তাদের জীবন উন্নত করা হলো, তারা আধুনিক হলেন। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি ও জমি-অধিকার হারালেন। ধর্মে তাদের খৃস্টান করা হলো; সবকিছু দখল করলো উপনিবেশিক প্রভুরা। গারো সমাজসহ বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে এমনটি ঘটছে। উপজাতিরা তাদের নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত হবেন, এটাই প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন পরিবর্তন যদি হয়ও তবে সেটা হওয়া উচিত বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসরাইলের মতো নিউ এশিয়া নামে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র গঠন করে আন্তর্জাতিক শক্তি এ অঞ্চলে তাদের পক্ষে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছে বলে যেসব প্রচার আছে, (আহমদ ছফা ১৯৯৮) তাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না; এবং নিজেদের সংঘাতের মাঝখান দিয়ে তৃতীয় কোন পক্ষের ফায়দা লুটার ব্যবস্থা করে দেয়া কারো জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না।

পরিশেষে কবিগুরুর ভাষায় বলা যায় (Rabindra Nath Tagore 1976) : Man has realised himself in a wider and deeper relationship with the universe. In his moral life, he has the sense of his obligation and his freedom at the same time...the freedom of social relationship he attains

www.pathagar.com

through owning responsibility to his community. Thus gaining collective power for his own welfare. এখানে ব্যক্তি মানুষ, চরিত্র, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সমাজবোধ সব এসে যাবে। সংস্থানিকভাবে সমষ্টি থেকে চাপিয়ে দিয়ে এইসব মানবিক গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। মানবিক গুণাবলীর উদ্বোধন ব্যক্তি স্তরে, গোষ্ঠী ও সামাজিক স্তরে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

এই লক্ষ্যে কেউ কেউ (মজল বসু ১৯৯৫ : ৮৮) রাষ্ট্র সর্বস্যতার বিকল্পে মানবিক সত্তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন। সেটা হলে জাত-সম্প্রদায়, গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সত্তা সঠিক পথে প্রকাশ পেতে পারে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রতন্ত্রের স্তরে সত্তার স্বাধিকার বজায় থেকে দেশ ও জাতির স্বার্থ যথাযথ উপায়ে ব্যবহৃত হতে পারে। রাষ্ট্র তখনই হবে ন্যূনতম পরিধির শাসনযন্ত্র, ঐ যন্ত্র শোষণ ও শাসনের উপাদান না হয়ে হবে স্বাধিকার ও মুক্ত সত্তার প্রতিভূ। সেই দিন ও সেই রাষ্ট্র কবে স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে পদার্পণ করবে!

যতদিন না এমন অবস্থা হচ্ছে, ততদিন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রচেষ্টা নিরঙ্কুশের সংকল্প করতে পারি। শান্তিচুক্তি শুরু করে দিয়েছে, সেখানেই শেষ করলে হবে না; মানবিক গুণাবলীতে এগিয়ে যেতে হবে, রবার্ট ফ্রস্টের চিরায়ত ধ্বনিমালার মতো : And miles to go before I sleep. একবিংশ শতকের পদধ্বনিতে আমরা কল্পনা করতে পারি যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী প্রতিভাকে জাতীয় জীবনের বৃহৎ কর্মভূমিতে আহ্বান করার নতুন আয়োজন হবে; বাঙ্গালি-পাহাড়ি সকলের সম্মিলিত অযুত শক্তিতে অতীতের জরাগ্লানি ঘুচে যাবে; আসবে সমৃদ্ধ-উজ্জ্বল-শান্তিময় ভবিষ্যৎ; সকল ভেদাভেদের চির অবসানের আনন্দে সম্মিলিত দেশবাসীর কণ্ঠে গীত হবে : 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা/ তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা/তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে/তুমি মিশেছ মোর প্রাণে মনে/ তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ও আমার দেশের মাটি / গীত বিতান)।

www.pathagar.com

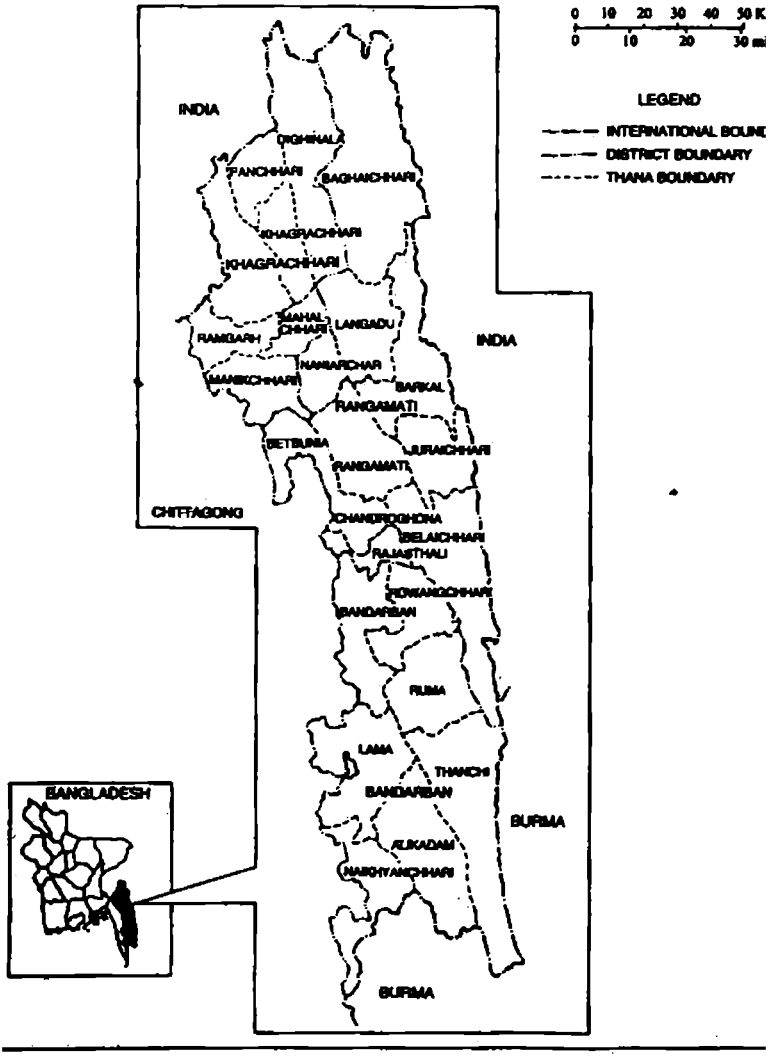

CHITTAGONG HILL TRACTS
Khagrachhari, Bandarban & Rangamati Districts.

(সূত্র : Amena Mohsin 1997 :

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ক

পার্বত্য চট্টগ্রাম : কালপঞ্জি

১৪১৮ চাকমা রাজা মোআন তস্নি ব্রহ্মদেশ থেকে বিতারিত হয়ে আশ্রয় নেন রামু ও টেকনাফে।

১৬৬৬ মুঘল বিজয়; আরাকানরাজের দখল থেকে আসে দিল্লির আওরঙ্গজেবের অধিকারে, সুবা বাংলা থেকে পরিচালিত হয়, অভিবাসী বাঙ্গালিদের বসতি স্থাপনের সূচনা, মুঘলদের অধীনস্থ ছিল ১৭৬০ পর্যন্ত।

১৭১২ মুঘলদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মনোমালিন্যের পর ১২ মন তুলা উপঢৌকনসহ চাকমা রাজার অধীনতা স্বীকার, চাকমা সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন।

১৭৬০ বাংলার নবাব মীর কাশেম আলি খানের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত, চাকমারা এটি মেনে না নিয়ে বিদ্রোহ করে।

১৭৭৭ চাকমা রাজা শের দৌলত খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হন; ইংরেজ শাসন মেনে নিতে তীব্র অস্বীকৃতি, ১৭৮০ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ স্থায়ী ছিল।
: ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুকিদের বিদ্রোহ, কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন।

১৭৮৫ কলকাতায় চাকমা রাজা জান বক্স খান ও ইংরেজের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর, ব্রিটিশ অধীনতা স্বীকার।

১৮৬০ চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম, শাসনের জন্য নিয়োগ করা হয় 'পার্বত্য অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক'; পার্বত্য চট্টগ্রামকে সে সময় তিনটি সার্কেল বা ভাগে বিভক্ত করা হয়, এগুলো ছিল : ১. চাকমা সার্কেল, ২. মোং সার্কেল, ও ৩. বোমং সার্কেল।

১৮৬৩ নির্দিষ্ট করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক সীমা।

১৮৭৩ বৃহত্তর চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার।

১৮৮৪ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত পুলিশ এক্ট' প্রণয়ন, এই এক্টের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়।

১৮৯৮ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

১৯০০ ৬ জানুয়ারি তারিখে হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল বা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধিমালা প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার অনিয়মিত জেলা হিসাবে শাসিত হয়; এই বিধিমালা সাধারণ পাহাড়িদের বিশেষ কোন অধিকার দেয়নি, সামন্ত প্রভুদের অনেক অধিকার দিয়েছিল; বিধি অনুসারে জেলা প্রশাসক বনে যান বিধাতা; এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিধান হচ্ছে : ১.পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি 'এক্সক্লুডেড' বা

www.pathagar.com

'নন রেগুলেটেড এরিয়া' বা 'অশাসিত' বা 'অনিয়ন্ত্রিত' বা 'নিষিদ্ধ এলাকা', যেখানে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া বাইরের কেউ যেতে বা বসতি স্থাপন করতে পারবে না; ২. উপজাতীয়রা পঁচিশ বিঘা জমি ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু মালিক হতে পারবে না; ৩. বিচারালয়ে কোন উকিল থাকবে না; ৪. রাজা, হেডম্যান, কারবারিরা থাকবে; ৫. দরকার হলে বিনা পারিশ্রমিকে উপজাতীয়রা সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ করে দিতে বাধ্য থাকবে; ৬. রাজা, হেডম্যান, কারবারিরাও উপজাতীয়দের বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে পারবে। যদিও এ বিধিতে বৃহত্তর উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হয় দাস আর ইংরেজ-সামন্ত চক্র প্রভু, তথাপি এটাকে বলা হয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার! অধিকার বলতে কিছুই ছিল না পার্বত্য জনতার। অর্থনীতি ও শাসন কর্তৃত্ব পুরোটাই থাকে ইংরেজদের হাতে, কিছুটা সামন্ত- রাজন্যবর্গের হাতে। পার্বত্য অঞ্চলের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য ইংরেজরা হাতির জন্য উপযুক্ত সরু পথ আর ন-মাইল পর পর নির্মাণ করে বিশ্রামাগার, কারণ হাতি একদিনে ন-মাইল পথ হাঁটতে পারে। এই বিধিতে উচ্চবিত্ত চাকমারা ইংরেজদের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা নেয়, এমনকি রাজ পরিবার ও বিলেতিদের মধ্যে দুটি বিয়েও সম্পন্ন হয়।

১৯১৫ চাকমাদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'চাকমা যুবক সমিতি' গঠিত।

১৯১৬ কামিনী মোহন দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'।

১৯২০ 'এক্সক্লুসিভ এরিয়া' বা 'একান্ত এলাকা ঘোষণা'; বাঙ্গালিদের অভিবাসন সহজ করে কিছু আইনগত সংশোধনী গ্রহণ।

১৯২৮ ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা যুব সংঘ' গঠিত।

১৯৪৭ কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে 'জনসমিতি'র একটি প্রতিনিধিদল এবং ভুবন মোহন রায়ের নেতৃত্বে 'পার্বত্য রাজাদের' আরেকটি প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে পৃথক পৃথকভাবে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানান।

১৪ আগস্ট : র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে।

১৫ আগস্ট : রাঙ্গামাটিতে চাকমারা ভারতীয় পতাকা এবং বান্দরবানে মারমারা ব্রহ্মদেশের পতাকা উত্তোলন করেন; তাদেরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে যে ভারত বিভক্তি হয় সেটা তারা মানেননি।

২১ আগস্ট : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্ট তাদের দমন এবং স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৫৪ 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি' গঠিত।

১৯৫৬ অনন্ত বিহারী খীসা ও সুধাংকর খীসা যৌথভাবে উগ্রপন্থী 'পাহাড়ি ছাত্র সমাজ' গঠন করেন।

১৯৬০ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্র সমাজের পুনরুজ্জীবন, মার্ক্সবাদী লাইন গ্রহণ এবং 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি' নাম ধারণ করে চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা।

১৯৬০-৬২ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; ব্যাপক পাহাড়ি প্রতিবাদ ও নিন্দা; জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কারণে ৩৫০ বর্গমাইল উর্বর ভূমি ও জনপদ কৃত্রিম হ্রদের তলে ডুবে যায়; এক লাখ পাহাড়ি আধিবাসী উদ্বাস্তু হন।

www.pathagar.com

১৯৬২ উপজাতীয় এলাকা ঘোষণা।

১৯৬৪ উপজাতীয় এলাকা লোপ করে পুনরায় ১৯০০ সালের বিধিমালা গ্রহণ।

১৯৬৫ পার্বত্য জন সমিতির প্রতিনিধি কামিনী মোহন দেওয়ান এবং বি. এম. রোয়াজা পাকিস্তানের এম. এল. এ নির্বাচিত হন।

: একই বছর রাঙ্গামাটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এ কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে রাঙ্গামাটি শহরে 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি'র প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯৬৬ আনন্দ বিহারী খীসা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ পরিষদ' গঠন।

: মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে মার্ক্সবাদী ছাত্র সংগঠন 'পার্বত্য ছাত্র পরিষদ' গঠন।

১৯৬৯ উনসত্তরের আয়ুব বিরোধী ছাত্র-গণআন্দোলন পার্বত্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে; প্রধান ছাত্র নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার কারাবরণ এবং জেলাখানার ভেতর থেকে পরীক্ষা দিয়ে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন।

১৯৭০ বনায়নের নাম করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দিয়ে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিনা ক্ষতিপূরণে থিগু, গুভলঙ্গ ও রাংখাং থেকে উপজাতীয় বসতি নির্মূল।

: রাঙ্গামাটি কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন; যার সশস্ত্র বাহিনীর নাম 'গণমুক্তি ফৌজ'; নেতৃত্বে থাকেন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা।

:'পার্বত্য কল্যাণ পরিষদ'-এর সমর্থন নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদে বিপুল বিজয়।

১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক পাহাড়ি তরুণের অংশগ্রহণ; চাকমা ও মারমা রাজারা মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সমর্থন করে; ব্যাপক পার্বত্য জনতা মুক্তিযুদ্ধে মূলতঃ নিষ্ক্রিয় ছিল; স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনী কর্তৃক কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ।

১৯৭২ ২৯ জানুয়ারি : চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল কর্তৃক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঢাকায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৫ ফেব্রুয়ারি : চার দফা দাবিতে (যাতে স্বায়ত্তশাসনসহ স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকারের কথা ছিল) মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি যুবকরা শেখ মুজিবকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

: রাজা মং প্রু সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি পার্বত্য প্রতিনিধিদল মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন; তারা তাদের দাবিগুলো রেখে যান।

৭ মার্চ : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠন; বলা হয় এটি 'রাঙ্গামাটি কম্যুনিস্ট পার্টি' এবং আরো অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ রূপ; সদস্য ছিলেন : মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা, চারু বিকাশ চাকমা, বি. কে. রোয়াজা, স্নেহকুমার চাকমা প্রমুখ।

: স্বাধীন চাকমা ভূমির সপক্ষে প্রচারণা।

২৪ এপ্রিল : বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণেতাদের কাছে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা পার্বত্য অধিবাসীদের দাবিগুলো বিস্তৃতভাবে পেশ করেন।

: প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বে 'পাহাড়ি ছাত্র সমিতি'র পুনরুজ্জীবন।

www.pathagar.com

১৬ মে : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র পরোক্ষ সমর্থনে রাঙ্গামাটিতে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন।

১৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জাতীয়তা 'বাঙ্গালি' নির্ধারণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন।

১৯৭৩ ৭ জানুয়ারি : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র পৃষ্ঠপোষকতায় খাগড়াছড়ির ইটছড়ির গভীর অরণ্যে সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী'র প্রতিষ্ঠা; মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ডাকনাম শন্তু বা শান্তি অবলম্বনে এদেরকে ডাকা হতো 'শান্তি বাহিনী'।

: আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

: গোপনে 'শান্তিবাহিনী'তে লোক সংগ্রহের অভিযান।

১৯৭৪ জানুয়ারি : রিজার্ভ আর্মড পুলিশের ওপর অতর্কিতে প্রথম হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে শান্তিবাহিনী; দেশব্যাপী 'শান্তিবাহিনী'র নাম আলোচিত হতে থাকে।

: মানবেন্দ্র লারমার 'বাকশাল'-এ যোগদান। 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) ছিল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত দেশের একমাত্র দল; চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান বদলে ফেলে 'বাকশাল'– এর মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

: ভারতের কাছে শান্তিবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা; ভারত সেটা মুজিব সরকারকে অবহিত করে।

১৯৭৫ শান্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে; কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়।

১৫ আগস্ট : সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদল।

: মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার আত্মগোপন ও বিদ্রোহী "শান্তিবাহিনী'তে যোগদান;

নভেম্বর : রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য নেতাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের বৈঠক; পার্বত্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার যোগাযোগ; ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য নাগরিক প্রতিনিধিদল কর্তৃক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রাষ্ট্রপতি সায়েমের সঙ্গে সাক্ষাৎ; রাঙ্গামাটি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে তরুণ উদীয়মান নেতা প্রীতি কুমার চাকমার অন্তর্ভুক্তি; ভারত কর্তৃক মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে আশ্রয় প্রদান ও সশস্ত্র আক্রমণের ভয়াবহ সূচনা।

১৯৭৬ শান্তিবাহিনীর সর্বাত্মক সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সাধারণের জানমাল হেফাজতের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন।

: সেনাবাহিনী কর্তৃক শন্তু লারমা ও চবরি মারমা আটক।

: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠন; বোর্ডের প্রধান হন চট্টগ্রাম সেনা অঞ্চলের জিওসি।

: নাগরিক ও মৌলিক অধিকারের দাবিতে রাঙ্গামাটিতে প্রথম পাহাড়ি কনভেনশন অনুষ্ঠিত।

www.pathagar.com

১৯৮০ ২৫ মার্চ : শান্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে কমপক্ষে ১০০ জন পাহাড়ি ও বাঙ্গালি বসতি স্থাপনকারী প্রাণ হারান রাঙ্গামাটির কালামপালিতে।

২১ এপ্রিল : কালামপালির নৃসংশ হত্যাকাণ্ড সরেজমিনে দেখে এসে ৩ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন; এরা ছিলেন : শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমা।

১৯৮০ Disturbed Area Bill, জাতীয় সংসদে উত্থাপন।

: রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একটি পার্বত্য প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।

১৯৮১ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার জন্য শন্তু লারমা ও চবরি মারমাকে মুক্তি দান।

৩০ মে : ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত।

: শন্তু লারমার আত্মগোপন।

: আন্তর্জাতিক তেল ব্যবসায়ী সংস্থা 'শেল ওয়েল কোম্পানি' কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল অনুসন্ধান শুরু।

১৯৮২ ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

৯ জানুয়ারি : বান্দরবান জেলা সদরে দ্বিতীয় পার্বত্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত।

১৯৮৩ ১৩ জুন : রাষ্ট্রপতি এরশাদ কর্তৃক শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা; ৩০০ শান্তিবাহিনী সদস্যের আত্মসমর্পণ।

১৪ জুন : শান্তিবাহিনীর লারমা গ্রুপ কর্তৃক প্রতিপক্ষ প্রীতি গ্রুপের ওপর হামলা; প্রীতি গ্রুপের কমান্ডার অমৃত লাল চাকমা, ওরফে 'বলি ওস্তাদ'সহ অনেককে হত্যা করে লারমা গ্রুপ।

৩ অক্টোবর : রাঙ্গামাটির জনসভায় রাষ্ট্রপতি এরশাদ শান্তিবাহিনীর প্রতি আবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন; পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ঘোষণা করা হয়।

১০ নভেম্বর : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ক্ষমতার লড়াই ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিপক্ষ প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

২৭ নভেম্বর : রাঙ্গামাটি জেলার জোড়াছড়িতে ৫ জন বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে শান্তিবাহিনী।

১৯৮৪ ১৯ জানুয়ারি : রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার মারিশ্যা থেকে শেল তেল কোম্পানির ৫ জন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী।

২৯ ফেব্রুয়ারি : মুক্তিপণের বিনিময়ে শেল কোম্পানির ৫ বিদেশী বিশেষজ্ঞকে মুক্তি দেয়া হয়; মুক্তিপণের মধ্যে ছিল : সাড়ে আট লক্ষ বাংলাদেশী টাকা, চার হাজার মার্কিন ডলার, ৬শ' ব্রিটিশ পাউন্ড, ১৯ কেজি স্বর্ণ, একটি রঙিন টেলিভিশন, একটি ব্যাটারি চার্জার, সব আবহাওয়ার জন্য উপযোগী একটি তাবু, একটি ১৬ মি.মি. মুভি ক্যামেরা এবং একটি ডুপ্লিকেটিং মেশিন।

১ মে : নানিয়ারচরের গভীর অরণ্যে উপদলীয় সশস্ত্র লড়াইয়ে শান্তিবাহিনীর ৫ সদস্য নিহত।

www.pathagar.com

৪ মে : খাগড়াছড়ির পানছড়ির কাছে পুসগাও জঙ্গলে লারমা ও প্রীতি গ্রুপের সশস্ত্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ৩০ শান্তিবাহিনী সদস্য নিহত।

৩১ মে : বরকলের ভূষণছড়ায় ১৮৬ বাঙ্গালিকে হামলা চালিয়ে হত্যা করে শান্তিবাহিনী।

জুলাই : ২৬৩ কোটি টাকার বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেয়া হয় তিন পার্বত্য জেলার জন্য।

৯ আগস্ট : বান্দরবান জেলা সীমান্তে কক্সবাজারের চকরিয়া থানার পাসাইখালিতে শান্তিবাহিনীর উপদ্রব।

১৮ আগস্ট : বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে ২ জনকে রাঙ্গামাটিতে হত্যা করে শান্তিবাহিনী।

২৮ নভেম্বর : বান্দরবানের চিম্বুক রেস্ট হাউজ থেকে ৩ উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী।

: পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভাগ করা হয় তিনটি পৃথক জেলায়, প্রশাসনিক ইউনিট স্বতন্ত্র ভাবে তিন জেলায় স্থাপিত হয়। নতুন নাম দেয়া হয় : পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা (উত্তরে), পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলা (মাঝখানে), পার্বত্য বান্দরবান জেলা (দক্ষিণে)।

১৯৮৫ ২০ এপ্রিল : রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ শান্তিবাহিনী সদস্য আত্মসমর্পণ করে এবং সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অধিনায়ক মেজর জেনারেল এম. নূরুদ্দীন খানের কাছে অস্ত্র জমা দেয়।

২৯ জুন : বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের মধ্যে আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের চুক্তি স্বাক্ষরিত; দলনেতা প্রীতি কুমার চাকমা আত্মসমর্পণ করেননি।

২১ অক্টোবর : 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম দফা শান্তি আলোচনা কোন ফলাফল ছাড়াই সমাপ্ত। আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় পানছড়ি থানার তিন কিলোমিটার দূরে চেংগি ইউনিয়ন কমুনিটি সেন্টারে,এলাকাটি গভীর অরণ্যে এবং সীমান্ত ঘেঁষা। ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'জনসংহতি সমিতি'র প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার জামাতা, শান্তিবাহিনীর প্রভাবশালী ফিল্ড কমান্ডার রূপায়ণ দেওয়ান ওরফে মেজর রিপ। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন : নীতিশ দেওয়ান, সুধা সিন্ধু খীসা, রঞ্জন বিকাশ চাকমা, স্নেহকুমার চাকমা; চার সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন কর্নেল ফারুক।

: 'জনসংহতি সমিতি'র সঙ্গে পরে মোট ছয় দফা নিস্ফল শান্তি আলোচনা হয়।

: রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে বাঙ্গালি বসতি স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

১৯৮৬ ২৯ এপ্রিল : ভারতের সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের তবলছড়িতে শান্তিবাহিনী ৩৯ জনকে হত্যা করে।

১৬ মে : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম মহকুমায় বাংলাদেশ- ভারত ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ পক্ষে ছিলেন বিডিআরের চট্টগ্রাম সেক্টর কমান্ডার এবং ভারতের পক্ষে ত্রিপুরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপ-মহাপরিদর্শক।

২৪ মে : শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

www.pathagar.com

২৬ ডিসেম্বর : সরকার ও শন্তু লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত।

: শান্তিবাহিনীর প্রচণ্ড হিংসাত্মক আক্রমণ: ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৮৭ ১৬ এপ্রিল : ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে ৪০০ উপজাতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

২৪ এপ্রিল : ভারতের বাগানবাড়ি শরণার্থী শিবিরে শান্তিবাদী উপজাতি নেতা নিশাধর কারবারি শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত।

৫ জুন : শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও ভীতির মুখে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ব্যাহত।

১৭ জুন : সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: এম. এ মতিন জানান যে ১৯৮১-৮৬ সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪৫২ জন নিহত হয়েছে।

২ জুলাই : ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দেমাগিরিতে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত।

১৮ জুলাই : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় বিদ্রোহী উপজাতি নেতা স্নেহকুমার চাকমার মৃত্যু।

১৬ আগস্ট : পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমহা রাওয়ের ঢাকায় আগমন।

২৭ আগস্ট : ভারতের সাবরুমে জেলা পর্যায়ের আলোচনায় অংশ নেয় বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন ও ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরা প্রশাসন।

১ সেপ্টেম্বর : পার্বত্য সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য পরিকল্পনামন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কাউন্সিল গঠিত।

১৯ সেপ্টেম্বর : উপজাতীয় নাগরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি এরশাদের বৈঠক; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কাউন্সিল গঠনের ঘোষণা; বৈধ ও সাংবিধানিক সকল অধিকার প্রদানের আশ্বাস। ঘোষিত জাতীয় কাউন্সিলের ৬ জন সদস্য ছিলেন যথাক্রমে : চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, গৌতম দেওয়ান, কং সং প্রু চৌধুরী, নুকূল ত্রিপুরা, এ. কে, দেওয়ান ও চারু বিকাশ চাকমা; প্রধান ছিলেন মন্ত্রী এ. কে খন্দকার; এতে অন্যান্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন : পররাষ্ট্র সচিব নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল এম. এ. সালাম, ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ফারুক আহমেদ চৌধুরী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জামিল মজিদ ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার।

১৭-১৮ ডিসেম্বর : দু'দিনব্যাপী শান্তি আলোচনায় প্রথমবারের মতো 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' কর্তৃক ৫ দফা দাবি উত্থাপন।

২৭ ডিসেম্বর : পরিকল্পনামন্ত্রী এ. ভা. মা. (অবঃ) এ. কে, খন্দকারের নেতৃত্বে পার্বত্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য আরো একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি গঠন।

২৮ ডিসেম্বর : রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ের নিকটবর্তী বারিশারি থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অপহরণ।

১৯৮৮ ২৪-২৫ জানুয়ারি : শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ৩য় দফা আলোচনা; সরকার পক্ষ বুঝাতে চেষ্টা করে যে ৫ দফা দাবি সম্পূর্ণভাবে সংবিধান পরিপন্থী।

www.pathagar.com

১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ দফা শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত; জনসংহতি ৫ দফা দাবির সঙ্গে আরো ৩০ দফা দাবিনামা উত্থাপন করে।

৩০ এপ্রিল : এপ্রিল মাসে খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনীর হাতে ৪২ জন নিহত।

: খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ও বাঙ্গালিরা যৌথভাবে গঠন করেন 'গণকল্যাণ সমিতি'।

৯ জুলাই : রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চাকমা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে।

২০ জুলাই : বিভিন্ন স্থানে ১২ জনকে হত্যা করে শান্তিবাহিনী।

৫ অক্টোবর : ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কমিটি থেকে রাজা দেবাশীষ রায়কে বাদ দেয়া হয়।

১৭ অক্টোবর : বাংলাদেশ সরকার ও পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১০ জুন : রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরী আগরতলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ঈশ্বরী প্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯ জুন : পঞ্চম শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত।

১৪-১৫ ডিসেম্বর : খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে ৬ষ্ঠ দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত।

২৭ ডিসেম্বর : একদার বিদ্রোহী, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ানকে হত্যা।

১৯৮৭-৮৮ : এ সময়কালের মধ্যে সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে ৬ বার আলোচনা হয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে বিদ্রোহীরা একতরফাভাবে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দেয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে জাতীয় কমিটি পার্বত্য অঞ্চলের সর্বস্তরে শান্তির রূপরেখা নিয়ে আলাপ চালিয়ে যায় এবং ডিসেম্বরে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে সমর্থ হয়; সাধারণ পার্বত্য নাগরিকদের শান্তির প্রতি আস্থাশীল করতে সরকার সচেষ্ট হয়।

১৯৮৯ ৮ ফেব্রুয়ারি : খাগড়াছড়িস্থ পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি সদস্যদের আলোচনা।

১০ ফেব্রুয়ারি : খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নিহত।

১৫ ফেব্রুয়ারি : পার্বত্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ ফেব্রুয়ারি : চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত; স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪ জন উপজাতীয় নেতা ও ১০ জন অ-উপজাতীয় নেতা।

১৯ ফেব্রুয়ারি : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, জাতীয় কমিটির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে শান্তি আলোচনা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে; কমিটির কাছে চিঠিটি পৌঁছায় ২০ ফেব্রুয়ারি।

মার্চ : তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের বিল উত্থাপিত ও পাস হয় জাতীয় সংসদে।

১২ মার্চ : উপপ্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১৪ মার্চ : রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে বঙ্গভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক।
১৬ মার্চ : শান্তিবাহিনীর নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট উপজাতীয় কমিটি গঠিত হয় খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলা সদরে।
: সংসদে পার্বত্য রক্তপাতের ধারা বন্ধ ও সংঘাত নিরসনে চারটি বিল পাস।
২৩ এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি এরশাদ কর্তৃক শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।
২৪ এপ্রিল : প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এটিএম মাসুদ ঘোষণা করেন যে আগামী ২৫ জুন ১৯৮৯ তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৪ মে : রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ শান্তিবাহিনীর গুলিতে নিহত।
৫ মে : লংগদুতে বাঙ্গালি-পাহাড়ি দাঙ্গা, বেশ কয়েক জনের প্রাণহানি।
৯ মে : খাগড়াছড়ির পানছড়িতে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত।
৩০ মে: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের যতনবাড়ি পরিদর্শন করে ৫ সদস্যের সরকারি প্রতিনিধি দলের নিরাপদে চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন।
৩১ মে : প্রভাবশালী পার্বত্য নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ১৮ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে ভারতে বাংলাদেশীদের শরণার্থী শিবিরে গমন।
১ জুন : শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৫ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি।
৮ জুন : নানিয়ারচর উপজেলা চেয়ারম্যান তিলক চন্দ্র চাকমাকে রাঙ্গামাটি জেলা সদরের বাসভবনে হত্যা প্রচেষ্টা; ভাগ্যক্রমে তিলকের আহত অবস্থায় পলায়ন।
২৫ জুন : শান্তিবাহিনীর বয়কট ও সশস্ত্র প্রতিশোধের হুমকি সত্ত্বেও ব্যাপক ভোটারের উপস্থিতিতে স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন। ৩০০ জন প্রার্থীর অংশগ্রহণ।
২ জুলাই : শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদের কার্যক্রম শুরু।
জুলাই : ত্রিপুরাস্থ চাকমা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের জন্য ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের প্রতিনিধিদলের ভারত গমন; প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়সহ প্রভাবশালী উপজাতীয় নাগরিকবৃন্দ; প্রতিনিধিদল পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায়; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতায় শরণার্থীরা ১২ দফা দাবি উত্থাপন করে, যার মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিও ছিল।
৪ অক্টোবর : বান্দরবানে জাতীয় কমিটির সঙ্গে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের কমিটির প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর।
১৭ অক্টোবর : রাঙ্গামাটিতে দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর।
২২ অক্টোবর : খাগড়াছড়িতে তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষর।
১৪-১৫ ডিসেম্বর : প্রথম পর্যায়ে যে ৬ দফা আলোচনা হয়, তার শেষটি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে; সরকার পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুস সালাম; তার সঙ্গে ছিলেন জেনারেল স্টাফ অফিসার-১ (কাউন্টার ইনসার্জেন্সী) লে. কর্নেল কায়সার,

www.pathagar.com

খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল ইব্রাহিম ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মালেক।

১৯৮৯-৯০এই সময়কালে ৩ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার কাউন্সিলকে তিনটি বিষয় পুরোপুরি প্রত্যার্পন করা হয় : ১. প্রাথমিক শিক্ষা; ২. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; এবং ৩. কৃষি।

১৯৯০ ২৮-২৯ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল ইয়ান মার্টিন আরো ২ জন সহকর্মীসহ পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

জুলাই : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় 'স্পেশাল এফেয়ার্স ডিভিশন' গঠন।

১৯৯১ ফেব্রুয়ারি : শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য খাগড়াছড়ি পাহাড়ি রাজনীতিবিদ হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট লিয়াজো কমিটি গঠিত।

৬ জুন : Hill District Local Government Parished Act 1989-এর অধীনস্থ ২২ টি বিষয় 'Hill District Zilla Local Government Councils' এর কাছে অর্পণ।

২০ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ৮ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ কমিটি পুনর্গঠন; কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন : মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সর্বজনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ, মজিদ-উল-হক, মোস্তাফিজুর রহমান, সাইফুর রহমান, আবদুস সালাম তালুকদার, অলি আহমদ ও আবদুল মতিন চৌধুরী।

১৯৯২ মার্চ : আরো ৮টি বিষয় পার্বত্য স্থানীয় পরিষদের হাতে প্রদান।

মে: লোঘাঙ্গ-এ সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে।

২২ মে : দ্বিতীয় দফা শান্তি আলোচনা শুরু। উভয় পক্ষ প্রথমবারের মতো 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সংশোধিত ৫ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করে।

২৬ মে : বিডিআর কর্তৃক ধৃত ৩ জন মনিপুরী বিদ্রোহী নেতাকে ভারতের বি এস এফ-এর কাছে প্রত্যার্পণ।

৯ জুলাই : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ৯ সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠন; কমিটি প্রধান যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদ।

১০ আগস্ট : শান্তিবাহিনীর চালিকা সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' কর্তৃক অস্ত্র বিরতি ঘোষণা।

২৭ আগস্ট : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য অঞ্চলে গমন এবং আলাপ-আলোচনার সূচনা।

১ অক্টোবর : লোঘাঙ্গ তদন্ত কমিটির ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট প্রদান; বাঙ্গালিদের ওপর শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণই ঘটনার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

৫ নভেম্বর : দ্বিতীয় পর্যায়ের শান্তি আলোচনার প্রথম দফা অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে; পার্বত্য জনসংহতি সমিতির পক্ষে মূল নেতা শন্তু লারমা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন : রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম কুমার চাকমা ওরফে

www.pathagar.com

অশোক, রক্তোৎপল ত্রিপুরা ও সুধা সিন্ধু খীসা; ৯ সদস্যের সংসদীয় কমিটির ৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

২৬ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে।

৩১ মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর অস্ত্র বিরতি ঘোষণা। জনসংহতি সমিতি ৫ দফা দাবির সঙ্গে আঞ্চলিক কাউন্সিলের রূপরেখা উপস্থাপন করে।

১৯৯২ ভারতের অরুণাচল রাজ্যের সংসদে অভ্যন্তরীণ বিপদ ও স্থানীয় জনগণের অসন্তোষের মুখে চাকমাদের অতি দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাবাসনের দাবি পাশ হয়।

: এ বছর শান্তিবাহিনী ৩৪ বার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং সেসব উপর্যুপরি লংঘন করে; শেষ ঘোষণায় সীমা বৃদ্ধি করে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত।

১৯৯৩ ১০ এপ্রিল : লোঘাঙ্গ-এ পার্বত্য-বাঙ্গালি দাঙ্গায় শতাধিক নিহত।

২২ মে : তৃতীয় দফা আলোচনা; সরকার পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিতে জানায় যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তনের মাধ্যমে বহু দাবি আদায় হয়ে গেছে।

১৫ জুলাই : একজন সরকারি কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের খাগড়াছড়ির গভীর জঙ্গলে বিদ্রোহী উপজাতি নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভারতীয় শিবির থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে সম্মতি।

১৮ সেপ্টেম্বর : গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ দফা শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত; সরকার পক্ষ বিদ্রোহীদের ৫ দফা দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাষ্য দেয়।

১৬-২৩ সেপ্টেম্বর : ৬ জন ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে জম্মু শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল সফর; তারা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন।

২৮ অক্টোবর : নানিয়ারচর লঞ্চ জেটি চেক পয়েন্টে পাহাড়ি ছাত্রনেতা ও প্রহরীদের মধ্যে বিতন্ডা, উত্তেজনা।

১৭ নভেম্বর : নানিয়ারচর থানা মার্কেট হত্যাকাণ্ড; ২৭ জন নিহত।

১৯৯৪ ১৬ জানুয়ারি : শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রশ্নে উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের রাঙ্গামাটি সফর।

২২ জানুয়ারি : উপেন্দ্র চাকমা জানান যে, ৪০৫টি পরিবার শরণার্থী হয়েছিল।

১৫ ফেব্রুয়ারি : ফেনী নদী অতিক্রম করে ভারত থেকে ২৮১ জন উপজাতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন; শরণার্থীদের প্রথম দলটিকে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বরণ করা হয়; প্রর্তাবাসন চলে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

৫ মে : সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সপ্তম দফা শান্তি আলোচনা।

২১ জুন : আরো ৬৪৮ জন উপজাতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন; রামগড় ও তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে শরণার্থীদের ২য় দলটি দেশে প্রবেশ করে;

১৭ জুলাই : ত্রিপুরার নতুন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস. বি, চ্যাবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অতি দ্রুত চাকমা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।

২৪ সেপ্টেম্বর : চাকমা শরণার্থীদের কোন চাকরি দেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে অরুণাচল রাজ্য সরকারের আদেশ।

৩০ সেপ্টেম্বর : অরুণাচল প্রদেশে অবস্থানরত চাকমাদের 'অরুণাচল ছাড়' নোটিশ প্রদান; নিখিল অরুণাচল প্রদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক'চাকমা খেদাও' আন্দোলন।

www.pathagar.com

৪ ডিসেম্বর : হংসধ্বজ চাকমার নেতৃত্বে গঠিত লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' তাদের পরিবর্তিত ৫ দফা দাবি উত্থাপন করে; পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা আইন পরিষদ গঠনের দাবি থেকে নতুন ৫ দফা দাবিতে সরে আসা হয়।

১৯৯৫ ৭ ফেব্রুয়ারি : তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময়সীমা আরো ২ বছর বাড়িয়ে অনধিক জানুয়ারি ১৯৯৭-এর মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা; সংসদে তিনটি বিল সংশোধন করে এ সময়সীমা বাড়ানো হয়, যাতে চাকমা শরণার্থীরা দেশে ফিরে এসে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি : পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর শান্তিবাহিনীর প্রথম ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণ। বিদ্রোহীরা রাতের আন্ধকারে আক্রমণ চালিয়ে সামরিক স্থাপনার সকল কিছু ধ্বংস করে অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে যায় এবং ঘুমন্ত সৈন্যদের হত্যা করে; নিহতদের সংখ্যা জানানো হয়নি।

১১ জুন : রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লালিয়াগাও গ্রাম থেকে একদল অজ্ঞাতনামা কর্তৃক হিল উইম্যান ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক, কলেজ ছাত্রী কল্পনা চাকমা (২৪) অপহৃত।

১২ জুন : নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত; পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি আসনে বিজয়ী হন আওয়ামী লীগ প্রার্থী; এরা হলেন : কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার ও বীর বাহাদুর।

১৬ জুন : বোমং প্রধান মং স্রু চৌধুরীর মৃত্যু।

২৭ জুন : পার্বত্য ছাত্র পরিষদ ও হিল উইম্যান ফেডারেশন কর্তৃক বাঘাইছড়িতে অবরোধের ডাক; বাঙ্গালিরা প্রতিরোধ করে; সশস্ত্র সংঘর্ষে বহু হতাহত।

৬ জুলাই : খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত পাহাড়িদের এক সেমিনার থেকে পার্বত্য শান্তির ১৪ দফা নতুন ফর্মূলা উত্থাপন; আয়োজক সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিরোধ কমিটি; নতুন দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এডভাইসারি কাউন্সিল গঠন ও প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদায় একজন উপজাতীয়কে প্রধান পদে নিয়োগ করার কথা বলা হয়।

৮ আগস্ট : ৮ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক প্রথমবারের মতো ঢাকা ও চট্টগ্রাম সফর।

১১ সেপ্টেম্বর : রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে ৩৩ জন বাঙ্গালি কাঠুরিয়াকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণ ও জবাই করে হত্যা।

২০ সেপ্টেম্বর : ৩ পার্বত্য স্থানীয় সরকার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের ঢাকা গমন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন; কমিটির প্রধান হন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।

৭ অক্টোবর : লিয়াজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গে জাতীয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি জেলা সদরে, জাতীয় কমিটি লিয়াজো কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে একটি চিঠি পাঠায়।

১১ অক্টোবর : স্থগিত শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য জাতীয় কমিটি কর্তৃক জনসংহতি সমিতিকে চিঠি প্রদান।

www.pathagar.com

২১ অক্টোবর : জনসংহতি সমিতি কর্তৃক জাতীয় কমিটিকে চিঠির উত্তর প্রদান।
২৬ অক্টোবর : সরকারের স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসংহতি সমিতিকে চিঠি প্রেরণ।
৯ নভেম্বর : কং স্রু প্রু চৌধুরী নতুন বোমং প্রধান পদে অভিষিক্ত।
১৮ নভেম্বর : বান্দরবানের রুমা থানার রাজুপাড়া থেকে ৬ জন বাঙ্গালি ও ৪ জন পাহাড়িসহ মোট ১০ জনকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী; অপহৃতদের মধ্যে ছিলেন থানচি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিমুদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ও থানচি থানা গণস্বাস্থ্য প্রকৌশলী শাহজাহান কবির; ইঞ্জিন বোর্ডযোগে থানচি থানা সদরে যাবার পথে তারা সাংগু নদীতে শান্তিবাহিনীর কবলে পড়েন।
২১ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে শুরু।
২৪ ডিসেম্বর : ২ দিন মুলতবী থাকার পর বৈঠক আবার শুরু; সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে শন্তু লারমা বৈঠকে নেতৃত্ব দেন।

১৯৯৭ 'জীবন আমাদের নয়' শীর্ষক তৃতীয় আপডেট রিপোর্টে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন' (নেদারল্যান্ডস) বলে; 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকারের প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে নিলেই কেবলমাত্র আলোচনা সফল হতে পারে।'
২৫ জানুয়ারি : বিরোধের দুই যুগের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে শন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি প্রতিনিধিদলের ঢাকায় আগমন; রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় উভয় পক্ষের তিন দিনব্যাপী দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
১২ মার্চ : ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে তৃতীয় বৈঠক, চলে দুই দিন।
২৮ মার্চ : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ত্রিপুরা থেকে চাকমা শরণার্থী দলের প্রথম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু; ৭ এপ্রিল পর্যন্ত তিন দফায় মোট ১ হাজার ২৪৭ পরিবারের ৬ হাজার ৭০৮ জন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন।
১১ মে : ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চতুর্থ দফা বৈঠক শুরু; ১৪ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে উভয়পক্ষের সকল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ; শিগগির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত।
১৪ জুলাই : ঢাকায় সরকার ও জনসংহতির ৫ম বৈঠক শুরু; পাঁচ দিন আলোচনার পর শেষ হয় ১৮ জুলাই।
১৪ সেপ্টেম্বর : ঢাকায় সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চারদিনের ৬ষ্ঠ বৈঠক শুরু; বৈঠক শেষে ১৭ সেপ্টেম্বর খসড়া শান্তিচুক্তিতে উপনীত হবার তথ্য প্রকাশ করেন শন্তু লারমা।
১৪ অক্টোবর : বিরোধী দলের নেত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বগুড়ায় এক সমাবেশে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন; সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

www.pathagar.com

১৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করার আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমরা চাই না আমাদের লোকজন, একটি সার্বভৌম দেশের নাগরিকরা, অন্য দেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করুক।

১ নভেম্বর : পার্বত্য শান্তিচুক্তির খসড়া জনসমক্ষে প্রকাশের দাবির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে তা প্রকাশ করা হলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

২১ নভেম্বর : চাকমা শরণার্থীদের চতুর্থ দফায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু; এবারে ১ হাজার ৩৮১ পরিবারের ৭ হাজার ৬২০ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে; ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন চলে; আগামী ১ ডিসেম্বর পঞ্চম দফায় প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত।

২৬ নভেম্বর : ঢাকায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক অব্যাহত।

৩০ নভেম্বর : রাত ১টা ২০ মিনিটে বৈঠকের সমাপ্তি এবং উভয়পক্ষ শান্তিচুক্তির সকল বিষয়ে একমত হয়ে খসড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর।

২ ডিসেম্বর : চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারি জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৭ ডিসেম্বর : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা সাতটি দলের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

১০ ডিসেম্বর : বিএনপির আহ্বানে বৃহত্তর চট্টগ্রামে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত।

১১ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় দিনের মতো শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় এবং হরতাল শেষে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ডাক দেয়।

২১ ডিসেম্বর : খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের আটক নেতা-কর্মীদের মুক্তি ও মাটিরাঙ্গায় সংঘটিত সহিংস ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিরের দাবিতে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত।

২২ ডিসেম্বর : পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবিতে হরতাল।

১৯৯৮ ৩ জানুয়ারি : ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন পার্বত্য চুক্তি বাতিল না হলে এক দফার আন্দোলন।

৭ জানুয়ারি : রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিয়ে সংসদের ভেতরে-বাইরে আলোচনার পরামর্শ, গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব নাকচ।

৮ জানুয়ারি : মার্কিন সাহায্য নীতিতে পরিবর্তন; পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে পিএল ৪৮০ খাদ্যশস্যের একাংশ।

: খাগড়াছড়িতে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ; ১১ জানুয়ারি সমাবেশের ঘোষণা।

: জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ১৫ জানুয়ারি বৈঠকের সরকারি সিদ্ধান্ত।

৯ জানুয়ারি : খাগড়াছড়ি আবার উত্তপ্ত– শান্তিচুক্তির পক্ষের শক্তি মাঠে নেই বলে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত।

: পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে পাহাড়ের মানুষ দ্বিধা বিভক্ত।

www.pathagar.com

: রাঙ্গামাটির সমাবেশে সাঈদীর ঘোষণা, শান্তিচুক্তি বাতিল করা না হলে জামায়াত সংসদ বর্জন করবে।
১০ জানুয়ারি : শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে বিএনপির সংসদে না যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১১ জানুয়ারি : খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা ভেঙে শান্তিচুক্তি বিরোধী সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সমাবেশ।
১২ জানুয়ারি : বিএনপি স্থায়ী কমিটির ঘোষণা, পার্বত্য চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য করা হবে।
১৩ জানুয়ারি : সংশোধনী ছাড়া পার্বত্য চুক্তি নিয়ে বিল আনলে জাপা বিরোধিতা করবে বলে সংসদীয় দলের সভায় সিদ্ধান্ত।
: খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় মিছিল-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা।
১৪ জানুয়ারি : বিএনপি ও জামায়াতের বর্জনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন শুরু।
: অস্ত্র সমর্পণের তারিখ নির্ধারণের জন্য সরকার-জনসংহতি বৈঠক।
: খাগড়াছড়িতে ৪৮ ঘন্টার সড়ক অবরোধ আহ্বান।
১৫ জানুয়ারি : ৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ; শন্তু লারমার নেতৃত্বে ছয়শ' সশস্ত্র সদস্য অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দেবে।
১৬ জানুয়ারি : পার্বত্য পরিষদের খসড়া চূড়ান্ত।
: খাগড়াছড়িতে অবরোধ কর্মসূচির সমাপ্তি।
১৭ জানুয়ারি : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও স্পেশাল এফেয়ার্স মন্ত্রণালয় গঠন; এতে মন্ত্রী ছাড়াও ১ সচিব, ২ যুগ্মসচিব, ৪ উপসচিব, ৮ সহকারী সচিব, ১ সহকারী প্রধান, ১ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ১ গবেষণা কর্মকর্তা ও ৭ প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ৬০ জন কর্মকর্তা– কর্মচারী থাকবেন। মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে শান্তিচুক্তির ঘ (১৯) ধারা বাস্তবায়িত হলো।
১৮ জানুয়ারি : আত্মসমর্পণের পরই শন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, সংবাদপত্রের ভাষ্য।
২০ জানুয়ারি : সংবিধান বিশেষজ্ঞরা পার্বত্য বিল পরীক্ষা করে দেখবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।
২১ জানুয়ারি : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির নামে সার্বভৌমত্ব খর্ব করার অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতা বি. চৌধুরী।
২২ জানুয়ারি : শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের পদ্ধতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক।
২৩ জানুয়ারি : ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শন্তু লারমার অস্ত্রসমর্পণের সিদ্ধান্ত।
২৪ জানুয়ারি : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ১১টি দেশের ২০ জন প্রতিনিধির যুক্ত বিবৃতি।
২৬ জানুয়ারি : পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া জোরদার করতে সরকারের তোড়জোড়।
: ত্রিপুরার বিদ্রোহ দমন করতে ঢাকার সাহায্য কামনা।
: চুক্তি বাতিরের দাবিতে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা।
২৯ জানুয়ারি : চট্টগ্রামের জিওসি কর্তৃক শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ।

www.pathagar.com

৫ ফেব্রুয়ারি : শন্তু লারমার অস্ত্রটি জাতীয় জাদুঘরে রাখার সিদ্ধান্ত।
: কালো চুক্তি আখ্যা দিয়ে পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারি বিএনপির বিক্ষোভের ঘোষণা।
: অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের জন্য বিটিভির সহযোগিতা চেয়েছে ভারতীয় দূরদর্শন।
: অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে খাগড়াছড়িতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
৬ ফেব্রুয়ারি : ১০ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রসমর্পণের দিন চট্টগ্রাম বিভাগে পূর্ণদিবস হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি সহ ৭ দল।
৭ ফেব্রুয়ারি : আত্মসমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের সিদ্ধান্ত।
৯ ফেব্রুয়ারি : তিনটি ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর প্রথম ব্যাচ ৫শ' অস্ত্র জমা দিয়েছে।
: সরকার আত্মসমর্পণের সাজানো নাটক দেখাতে চাইছে, বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভূইয়া।
১০ ফেব্রুয়ারি : বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শন্তু লারমার নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্যের আত্মসমর্পণ:মোট ৪৬৫টি আধুনিক অস্ত্র জমা দান।
: রাইফেল নিয়ে সাদা গোলাপ তুলে দিলেন শন্তু লারমার হাতে প্রধানমন্ত্রী।
: পার্বত্য চট্টগ্রামে নবদিগন্তের সূচনা হলো, সংবাদপত্রের ভাষ্য।
: সমগ্র চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত।
: পার্বত্য শান্তিচুক্তি দেশে অশান্তির সৃষ্টি করবে, মক্কায় প্রবাসীদের উদ্দেশে খালেদা জিয়া।
: শান্তিবাহিনী আপনা আপনি বিলুপ্ত হলো, শন্তু লারমা।
: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার সাহায্যের ঘোষণা।

পার্বত্য 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষরের পর পাহাড়ে ও সমগ্র দেশে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উত্তেজনা ও সহিংসতার ঘটনাও ঘটে। সরকার ও বিরোধী পক্ষ জুন পর্যন্ত ছিল সোচ্চার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয় 'শান্তিচুক্তি' সম্পন্ন করার পর: আর বিরোধী দল লংমার্চসহ ব্যাপক কর্মসূচি নেয়। **'উত্তপ্ত রাজনীতি'** অধ্যায়ে সেসবের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে বছরের শেষ দিকে চুক্তি বাস্তবায়নের পথে নানা জটিলতা এবং মত-পার্থক্য দেখা যায়। ১৯৯৮ সালে এক বছর পূর্তির প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও 'শান্তিচুক্তি' সংক্রান্ত ঘটনাবলীর হাইলাইটস এখানে কালপঞ্জিতে সংযোজিত হল :

পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২০-২১ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সম্মেলন'। 'শান্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম' শীর্ষক সম্মেলন থেকে জানা যায় যে, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন একটি প্রাথমিক প্রকল্প রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। যার আওতায় ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৮৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে। স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৯শ' কোটি টাকা। দাতাগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

প্রতিনিধিরা এ সকল প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদানে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মেলনের চারটি অধিবেশনে ছয়টি কর্মপত্র উপস্থাপন করা হয়। এতে 'আদিবাসী সংঘাত ও শান্তির অন্বেষা' বিষয়ে এইচ. জে. ভেন্ডারগ্রাফ, 'ফিলিপিন্সে সংঘাত অবসান' বিষয়ে সারা এম টিম সেন, 'মালোতে সংঘাত অবসান বিষয়ে' ইব্রাহীম আগা ইউসুফ, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া' বিষয়ে ড. এস.এ. সামাদ, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন এজেন্ডা' বিষয়ে ড. মশিউর রহমান এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা' প্রসঙ্গে ডেভিড ই লকউড কর্মপত্র উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের দু'জনসহ ১০ জন বিদেশী প্রতিনিধি, দেশে অবস্থানকারী ৩০ জন বিদেশী প্রতিনিধি এবং ১২০ জন স্থানীয় প্রতিনিধি অংশ নেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শন্তু লারমা, উপেন্দ্রলাল চাকমা ও সমীরণ দেওয়ানসহ পাহাড়ি নেতৃবৃন্দও এতে অংশ নেন। সম্মেলনে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে মধ্যবর্তী প্রকল্প নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সুযোগ সম্প্রসারণ সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের আওতায় যোগাযোগ প্রসার, কৃষি উন্নয়ন এবং শিক্ষা, বিশেষ করে বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সেখানে শান্তির ফলশ্রুতি হিসাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বস্তুতান্ত্রিক লভ্যতা সবার কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে বলেও আস্থা প্রকাশ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়, সামরিক বাহিনীর আগের ভূমিকা নেই। সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের কাছে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, ... আমরা সেখান থেকে সেনা বা নিরাপত্তা বাহিনীর কোন সদস্যকে প্রত্যাহার করিনি। তবে তাদের সংখ্যা বাড়ানোর যে প্রবণতা ছিল, তা আর নেই। তিনি বলেন, আগে এ অঞ্চলে এ খাতে প্রতিদিন এক কোটি টাকা ব্যয় হতো। এখন সেটা হবে না। এতে যা বাঁচবে, তা সেখানে অন্য প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন মঞ্চে পাহাড়ি নেতা শন্তু লারমার অনুপস্থিতি ও তাঁর বক্তৃতা না দেয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. সামাদ জানান, শন্তু লারমাকে যথাযথ সম্মান দেয়া হয়েছে। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মঞ্চে যেতে রাজি হননি। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শন্তু লারমার দীর্ঘ দু'ঘন্টার বৈঠক হয়েছে বলেও তিনি জানান। বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ সম্মেলনে বিএনপির ১১৪ জন এমপি'র সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কেউ আসেননি। রাম বা লক্ষ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে মঞ্চে আসতে হয়।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ২২ জুন ১৯৯৮)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত

১৫ জুলাই সরকার এক গেজেট নোটিফিকেশনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়' নামে একটি নয়া মন্ত্রণালয় গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। এ মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ১৮টি বিষয় দেখাশুনা করবে। নয়া মন্ত্রণালয়কে নিম্নোক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা; 'সংরক্ষিত বিষয়' সম্পর্কে পার্বত্য এলাকার স্থানীয় সরকারকে পরামর্শ

www.pathagar.com

দান: সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও ডিভিশনসমূহের মধ্যে সমন্বয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটি, স্পেশাল কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে সেক্রেটারিয়েল সহায়তা প্রদান; সরকার ও কমিটিসমূহকে পরামর্শদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটর করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদনা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আইনের অধীনে থানা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম সরকারসহ সকল স্থানীয় সরকার সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা; পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশ এবং ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সকল সরকারি অফিস ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি ও অ-উপজাতি লোকজনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ; তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ঐতিহ্য, প্রথা, ভাষা, ধর্ম, আচরণ এবং স্ব স্ব পরিচিতি সংরক্ষণ। মন্ত্রণালয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মতৎপরতা চালানো ও সমন্বয় সাধন করবে; এলাকার এনজিও তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করবে। স্থানীয় সকল সংস্থার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারক ও সমন্বয় করবে। আঞ্চলিক পরিষদ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধনও করবে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখা, আইসিআই, এমওডির বিষয় দেখা, সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার এবং সকল বিদেশী বিষয়ের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করা, মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয়ে দেয়া সকল বিষয়ের তদন্ত ও পরিসংখ্যান বজায় রাখবে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ জুলাই ১৯৯৮)

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক

৭ আগস্ট অন্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন প্রশ্নে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাড়াই শেষ হয়েছে। তবে বৈঠকে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু গঠনমূলক অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে শান্তিচুক্তির শর্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন, চাকরিতে পুনঃনিয়োগ বিধিমালা তৈরিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা বৈঠকে সংসদে সদ্য পাস হওয়া রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধনী) বিল ১৯৯৮ সম্পর্কেও আলোচনা উত্থাপন করেন। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি শন্তু লারমা, শরণার্থী পুনর্বসান বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, বান্দরবানের এমপি বীর বাহাদুর, জনসংহতি নেতা গৌতম চাকমা, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

(ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট ১৯৯৮)

পার্বত্য অঞ্চলে এনজিও কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ

তিন পার্বত্য জেলা- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সরকার বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর (এনজিও) সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে জেলা প্রশাসন এক পত্রের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এনজিওগুলোর কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা দূর হয়। সেই সুযোগে কিছু সংখ্যক এনজিও কোন অনুমতি ছাড়াই পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের অফিস স্থাপন করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম, সামাজিক বনায়নসহ নানা ধরনের কার্যক্রম শুরু করে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে সমন্বয়হীন এনজিওসমূহের তৎপরতা নিয়ে সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয় করার কথা; কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদ এখনও গঠিত হয়নি। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পার্বত্যাঞ্চলে এনজিও কার্যক্রমের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বিশেষ কার্যাদি বিভাগকে চিঠি দিয়েছে। বিভাগ এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। সরকারি নির্দেশের প্রেক্ষিতে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এনজিও কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

(ভোরের কাগজ, ১২ আগস্ট ১৯৯৮)

'শন্তু লারমার সাথে সরকারের চুক্তি সার্বজনীন নয়'

পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি জনগোষ্ঠী সমন্বয় পরিষদ তাদের একটি বিশেষ উপজাতির দয়া ও একনায়কত্বের কবল থেকে রক্ষার জন্যে সরকার ও বৃহত্তর জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদ কথিত 'আঞ্চলিক পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা, সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠনের দাবি জানান। ১৪ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ৮টি উপজাতির সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি জনগোষ্ঠী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক উচ্চত মণি তঞ্চংগ্যা লিখিত বক্তব্যে এ দাবি জানান। এ সময় পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক এল থাংগা পাংখোয়া, মেনদির মুরং মেম্বার, কদম তঞ্চংগ্যা, অংইয়ুং মুরং, অংহলা খুমী, জসিম খিয়ং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উচ্চত মণি তঞ্চংগ্যা তাদের ৮টি উপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি জনগোষ্ঠী দাবি করে বলেন, জীবনে-মরণে আমরা বাংলাদেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে থাকতে চাই। বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের কখনও কোনো বিরোধ ছিল না। তথাকথিত শান্তি বাহিনী কখনও আমাদের সমর্থন লাভ করেনি। পরিণতিতে আমাদের অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার শন্তু লারমার সাথে কথিত যে শান্তিচুক্তি করেছে, সেই শন্তু লারমা কখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতীয় জনগণের প্রতিনিধি ছিল না, এখনও নেই। কাজেই সকল উপজাতির মতামতের ভিত্তিতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, শান্তিচুক্তির পর শান্তিবাহিনীর লোক দেখানো অস্ত্র সমর্পণ করার পর এখনও জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, মুক্তিপণসহ তাদের সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, যেসব উপজাতি শান্তিবাহিনীকে অতীতে সমর্থন দেয়নি, তাদের উপর চলছে বর্তমানে নানা নির্যাতন ও হয়রানী। ফলে বিপুল সংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সরকার তথাকথিত শান্তিচুক্তির মাধ্যমে চিরদিনের জন্যে অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যারা গত ২৩ বছর জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সশস্ত্র সন্ত্রাস চালিয়েছে. তাদের কাছে নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ উপজাতি জিম্মি হয়ে পড়েছে। পরিষদ আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮ আদি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ঢাকায় একটি মহাসমাবেশ করবে বলেও জানায়।

(দৈনিক দিনকাল. ১৬ আগস্ট ১৯৯৮)

অন্তর্বর্তী পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ॥ শন্তু লারমার আপত্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে শন্তু লারমাকে চেয়ারম্যান করে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৬ সেপ্টেম্বর এই পরিষদ ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ৪টি বিল পাস করা হয় জাতীয় সংসদে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ৫৪ নম্বর ধারা অনুসারে গঠিত এই অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান শন্তু লারমা অবশ্য আপত্তি জানিয়েছেন সরকারি ঘোষণার বিষয়ে। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ জনসংহতি সমিতির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি প্রজ্ঞাপন হাতে পাবার পর তাঁরা তাঁদের লিখিত আপত্তি সরকারকে জানাবেন। বিবিসি'র খবরেও তাঁর এই আপত্তির কথা প্রচার করা হয়। শন্তু লারমা বিবিসিকে বলেন, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল তা' এবারে প্রকাশ্যরূপ নিতে পারে। খাগড়াছড়িতে শন্তু লারমা জনকণ্ঠকে বলেন : সরকারের সঙ্গে চুক্তির বাইরে তাদের কিছু অলিখিত চুক্তিও আছে। চুক্তির শর্ত অনুসারে সমিতি ১ জন চেয়ারম্যান ও ২২ সদস্যের নাম দিয়েছিল। কিন্তু সরকার তাদের প্রস্তাবিত ৩ জনকে বাদ দিয়ে নতুন ৩ জনের নাম সংযোজন করায় তারা এটি গ্রহণে অসম্মতি জানাচ্ছেন। শন্তু লারমা বলেন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা পরিষদ আইনে পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্ত লংঘন করা হয়েছে। সরকার তা' সংশোধন না করে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করায় তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন।

সরকার ঘোষিত পরিষদের পাহাড়ি সদস্যরা হলেন উষাতন তালুকদার, গৌতম কুমার চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, স্নেহকুমার চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, সাধুরাম ত্রিপুরা, থৈম্রাছিং চৌধুরী, মংনুচিং মারমা, কে. এস. মং মারমা, নীল কুমার তনচৈংগা, লয়েল ডেভিড বম মাধবী, লতা চাকমা এবং উনুপ্র। পরিষদের বাঙ্গালি সদস্যরা হলেন : মোহাম্মদ শফি, মোহাম্মদ জাফর আহমেদ, নূরুল আলম, মাহবুবুর রহমান, মোঃ শফিকুর রহমান, কাজল কান্তি দাশ এবং রওশন আরা বেগম।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ ॥ পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন মহলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া

সরকার কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন মহলে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সাধারণ

www.pathagar.com

জনগণের মাঝে ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের ভবিষ্যত কার্যক্রম নিয়েও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

সোমবার খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা আঞ্চলিক পরিষদ গঠন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সরকার একতরফাভাবে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে কোনো কিছু করতে হলে জনসংহতি সমিতি ও সরকারের সাথে বোঝা পড়া দরকার না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আশা করা যায় না। তিনি সরকার কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনে হতাশ হয়েছেন। হংসধ্বজ চাকমা বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন হওয়ায় দীর্ঘ ৮ মাস পরও এখানকার শরণার্থী সমস্যা, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়নি। তিনি পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চান।

এ দিকে খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুন্নবী চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জাহেদুল আলম ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির আলোকে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদকে স্বাগত জানান। নেতৃবৃন্দ নবগঠিত আঞ্চলিক পরিষদ যাতে অভীষ্ট লক্ষে পৌছতে পারে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অপরদিকে পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ শান্তিচুক্তির সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র সংগঠনগুলো সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ ও সদস্য মনোনয়ন গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করেছে। তবে খাগড়াছড়িতে চুক্তিবিরোধী পাহাড়ি ছাত্র সংগঠন এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেনি।

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপির সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, আমরা পার্বত্য চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই কোনক্রমেই সরকার কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ মেনে নেয়া যায় না। তিনি পার্বত্য চুক্তি বাতিল করে সকল সম্প্রদায়ের গ্রহনযোগ্য একটি চুক্তি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

বাঙালি কৃষক শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ, পার্বত্য আদিবাসী বাঙালি কল্যাণ পরিষদ ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ খাগড়াছড়ি জেলা শাখা নবগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদকে স্বাগত জানায়। সংগঠনসমূহ পৃথক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে, নবগঠিত আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের নব নিযুক্ত বাঙালি সদস্য জাফর আহমেদ সওদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে অভিনন্দন জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সরকার রবিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করায় রাঙ্গামাটিতে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা নবগঠিত আঞ্চলিক পরিষদকে স্বাগত জানিয়েছেন। অন্যদের মধ্যে নবগঠিত পরিষদকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছেন নাগরিক কমিটির সম্পাদক জাহিদ আক্তার, পৌর আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ সাধারণ সম্পাদক অমর দে, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জে. এফ. আনোয়ার চিনু, চাকমা রাজপরিবারের সদস্য এ্যাডভোকেট প্রতিম রায় পাম্পু।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

চুক্তিবিরোধী তিন পাহাড়ি সংগঠনের সঙ্গে শন্তু লারমার সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব

সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি প্রধান শন্তু লারমার চুক্তিবিরোধী তিন পাহাড়ি সংগঠনের প্রধান প্রসিত খীসাকে সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। বৈঠকের ব্যাপারে তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে তিন পাহাড়ি সংগঠন-পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিরোধ মেটাতে বিলুপ্ত শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির নেতা শন্তু লারমার দেওয়া এ সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনও ওয়াকিবহাল বলে জানা গেছে।

জনসংহতির ঘনিষ্ঠ প্রবীণ পাহাড়ি নেতা, সরকার-জনসংহতির যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে গতকাল টেলিফোনে ভোরের কাগজকে বলেছেন, বৈঠকে বসার সুযোগ সব সময়ই থাকছে। তিনি বলেন, সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই অংশ। তবে তিনি জানান, এজন্য তিন পাহাড়ি সংগঠনকে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্র দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে পাহাড়ি গণপরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সমীরণ চাকমা ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, শন্তু লারমার দেয়া সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তাব তারা পেয়েছেন মৌখিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে। এ বিষয়ে তিন সংগঠন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বলে তিনি জানান।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের (২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭) আগেই জনসংহতি সমিতি এবং তিন সংগঠন 'সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর আগে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে জনসংহতি সমিতির গোপন কংগ্রেসের আগে শন্তু লারমা প্রসিত খীসা গ্রুপের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। এই বৈঠকে 'সংবিধানের আওতায়ই পার্বত্য চুক্তি'-- সরকারের এ প্রস্তাবনার সঙ্গে জনসংহতি একাত্মতার কথা জানালে তিন সংগঠন তা মেনে নেয়নি। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর উভয়ের এ দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। এরই অংশ হিসেবে গত ১০ ফেব্রুয়ারি-৫ মার্চ শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের অনুষ্ঠানগুলোতে পাহাড়ি ছাত্র-গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন চুক্তির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

উভয়ের চরম মতবিরোধ শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে রূপ নেয়। শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের পরপরই খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র-গণপরিষদ নেতা প্রদীপ লাল চাকমা ও কুসুমপ্রিয় চাকমা বিরোধীপক্ষের হাতে নৃসংসভাবে খুন হন। এর আগে রাঙ্গামাটির কুতুকছড়িতে চুক্তি সমর্থনকারী অশ্বনীকুমার চাকমা বিরোধী পক্ষের রোষানলে নিহত হন। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নেতা এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠান নিয়ে গত বছর ১০ নভেম্বর বাঘাইছড়ি, কুতুকছড়ি,

www.pathagar.com

মহালছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের একাধিক অঞ্চলে জনসংহতি সমিতি এবং তিন সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

তিন পাহাড়ি সংগঠনের বিরোধিতার কারণে গত ২৭ জুন বাঘাইছড়িতে কড়া সেনা নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও জনসংহতির কেন্দ্রীয় নেতারা সভা করতে ব্যর্থ হয়। শন্তু লামরা এ ঘটনার পরই উভয়পক্ষের সমঝোতা বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে তিন সংগঠন আহূত ২৭ জুনের হরতালে ছাত্র পরিষদ কর্মী রূপণ, মনতোষ, সমর বিজয় ও সুকেশ চাকমা পুলিশের সঙ্গে এক সংঘর্ষে নিহত হয়। বাঘাইছড়িতে অপহৃত নেত্রী কল্পনা চাকমা ও নিহত চার ছাত্র পরিষদ কর্মীর স্মৃতিসৌধে জনসংহতি গত ২৭ জুন পুষ্পমাল্য অর্পণ ও স্মরণসভা করতে চেয়েছিল। জনসংহতির কেন্দ্রীয় নেতা জগদিশ চাকমা, শান্তিবাহিনীর সাবেক মেজর প্লেসহ বেশ কজন শীর্ষ নেতার উক্ত সভায় বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি সংঘাতে রূপ নিতে পারে– এ আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তারা কর্মসূচি স্থগিত করে।

এর সঙ্গে চলতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি জনসংহতির সামরিক বিভাগ শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শন্তু লারমা কল্পনা চাকমা অপহরণের বিষয়টিকে 'বিতর্কিত' বলে মন্তব্য করেছিলেন। এতে চুক্তিবিরোধী তিন পাহাড়ি সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে তারা পার্বত্য জেলাগুলোতে একাধিকবার প্রচুর প্রচারপত্র বিলি করেছে।

(ভোরের কাগজ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

আঞ্চলিক পরিষদের পুনর্গঠন চান শন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় শন্ত লারমার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক গতকাল রাতে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক রাত সাড়ে আটটায় শুরু হয়। গভীর রাত পর্যন্ত চলে। বৈঠকে জে এস এস নেতৃবৃন্দ চুক্তির কোন কোন ধারা সরকার লংঘন করছে তা বিস্তারিতভাবে মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। শন্তু লারমা স্পষ্ট করে মন্ত্রীকে বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠন করা না হলে তার পক্ষে এ চুক্তি মানা সম্ভব হবে না।

বৈঠকে শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয়দের পুনর্বাসন, ভোটার তালিকা তৈরি ও কিভাবে ভোটার হবে, পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের কর্মকাণ্ড, স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র কে দেবে এসব বিষয় গুরুত্ব সহকারে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক সূত্রে জানা যায়, শন্তু লারমা আজকের বৈটকের আলোচনা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে বলেন।

বৈঠকে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় শন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জে এস এস নেতৃবৃন্দ চুক্তির কপি পড়ে বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা চান মন্ত্রীর কাছে। তারা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আইন '৯৮-এর কোথায় কোথায় সংশোধন করতে হবে তা মন্ত্রীকে চিহ্নিত করে দেন।

(সংবাদ, ১০ অক্টোবর ১৯৯৮)

www.pathagar.com

জ্যোতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

জ্যোতিন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে সমীরণ দেওয়ানকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। নতুন চেয়ারম্যান জ্যোতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা সর্বশেষ খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সভাপতি ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক সময়ের সক্রিয় নেতা জ্যোতিন্দ্র লাল বেশ কয়েক বছর আগে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এরশাদ সরকারের আমলে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের সময় থেকেই সমীরণ দেওয়ান চেয়ারম্যান। প্রায় ১০ বছর তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮)

পার্বত্য পরিষদগুলো দলীয়করণ করা হচ্ছে, অচলাবস্থার জন্য জনসংহতির দায়ী নয় ঃ শন্তু লারমা

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান শন্তু লারমা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য জনসংহতি সমিতি দায়ী নয়। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় নিষ্পত্তি হওয়া ছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ অর্থবহ হতে পারে না।

বান্দরবানে ১০ দিনের এক সফরে এসে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সাথে মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে শুক্রবার তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির শর্তানুযায়ী বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন পূর্ণাঙ্গ সংশোধন না করে সরকার সেগুলোতে দলীয়করণ করেছে।

শন্তু লারমা বলেন, আমরা বাঙালি বা মুসলমান বিদ্বেষী নই। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতি ২৬ বছর যাবত একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করছে। এই সংগঠন উগ্র জাতীয়তাবাদ, সকল প্রকার মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। শন্তু লারমা অভিযোগ করে বলেন, শান্তিচুক্তির ৯ মাস অতিবাহিত হবার পরও অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প সরানো হয়নি, অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী পুনর্বাসন হয়নি, বন্দীমুক্তি এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, সাজা মওকুফ হয়নি। তিনি বলেন, আমি এবং আমার শীর্ষ নেতারা এখনও অসংখ্য মামলা মাথায় নিয়ে দিনযাপন করছি। এ অবস্থায় সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি শরণার্থী প্রত্যাবসন বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রমেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

শন্তু লারমা বলেন, শান্তিচুক্তি অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়নকারী কমিটির একজন সদস্য হিসাবে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তাঁকে চ্যায়ারম্যান করে গঠিত একটি কমিটি সম্পর্কিত সরকারী নোটিফিকেশন নিযুক্তিপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর কাছে পৌছানো হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নকারী কমিটির সদস্য বা জনসংহতি সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৭)

www.pathagar.com

বান্দরবানে কল্পরঞ্জন চাকমা লাঞ্ছিত

জনসভা শেষে ফেরার পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা পার্বত্য শান্তিচুক্তির পক্ষের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একদল কর্মীর হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

গতকাল বান্দরবান হতে ৬০ কিলোমিটার দূরে রুমা থানায় মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর এমপিকে থানা আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনাস্থলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পক্ষ হতে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপিতে শান্তিচুক্তির লিখিত ও অলিখিত চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন, রুমা থানায় সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণের নামে ৯ হাজার ৫৬০ একর জায়গা ভূমি হুকুমদখল হতে বিরত থাকার দাবিসহ কয়েকটি দাবি উল্লেখ করা হয়। মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় স্মারকলিপির সকল দাবির ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেও ভূমি হুকুমদখলের ব্যাপারে কিছু বলেননি। ফলে বিক্ষুব্ধ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শত শত কর্মী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। মন্ত্রী ও সফর সঙ্গীরা মধ্যাহ্নভোজ শেষে নৌকাপথে জেলা সদরে আসার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা রুমা মহিলা ক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে এবং মন্ত্রী ও এমপি'র বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। মন্ত্রী এবং অন্যরা তাদের পাশ কাটিয়ে ইঞ্জিন বোটে উঠার জন্য নিচে নামতে থাকলে উপর হতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা মন্ত্রীকে উদ্দেশ করে এলোপাতাড়ি ইট-পাটকেল ও জুতা নিক্ষেপ করতে থাকে। মন্ত্রীর সাথে তখন বীর বাহাদুর এমপি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ অন্যান্য সফরসঙ্গী ছিলেন। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তার আগে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা সকল তোরণ ভেঙ্গে ফেলে ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এবং রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে। মন্ত্রীর আজ (রবিবার) রোয়াংছড়ি থানা সফর বাতিল করা হয়েছে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ অক্টোবর ১৯৯৮)

রাঙ্গামাটিতে সেনা মোতায়েন, পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষে আহত ৫

দু'দিন আগের এক সন্ত্রাসী ঘটনায় আহত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে এক সংঘর্ষে কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে আসামী মারমা (২৯) নামে একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শহরে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষুব্ধ লোকজন ব্যারিকেড দেয়ায় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ক্লাসসমূহ স্থগিত রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় শহরের ভেদভেদী বাজারে উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের এক অতর্কিত হামলায় দু'বাঙালি ব্যবসায়ী গুরুতরভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে একজন কাজল কান্তি নাথ (৩০) শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। অপর আহত ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন এখনও রাঙ্গামাটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্যবসায়ী কাজল কান্তি নাথের মৃত্যুর সংবাদ রাঙ্গামাটিতে এসে পৌঁছলে শহরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভেদভেদী বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। ধীরে ধীরে গোটা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

(মুক্তকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ১৯৯৮)

বিরোধীদলের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ, জনসংহতি সমিতি আন্দোলনে যাচ্ছে, লক্ষ্য সংসদ নির্বাচন

শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন, সরকার ঘোষিত আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠনসহ অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে দেশের প্রথম আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আন্দোলনে যাচ্ছে।

জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা সফর করছেন। এই সফরে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন পার্বত্য জনসাধারণকে। জনসংহতি সমিতি আগামী সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই প্রার্থী দেবে। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যুক্ত সূত্র জানায়, সমিতি ভালভাবেই জানে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনে নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে। গত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তিনটি আসনে প্রচুর ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। আওয়ামী প্রার্থীরা পাহাড়িদের বেশি ভোট পেয়েছে, কম পেয়েছে স্থানীয় বাঙালির ভোট। সূত্র জানান, জনসংহতি সমিতি আশা করে পাহাড়িদের মধ্যে অধিকাংশই জনসংহতি সমিতিকে সমর্থন দেবে। অন্যদিকে শন্তু লারমা সম্প্রতি বান্দরবানে বিভিন্ন সমাবেশে 'পার্বত্যবাসীদের জন্যই গত ২৫ বছর যাবৎ আন্দোলন করে আসছি' বলে বাঙালিদের সম্পৃক্ত করার বক্তব্য রাখছেন। সূত্র জানায়, এ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক বাঙালিই জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে আসবে বলে জনসংহতি নেতারা মনে করছেন।

সম্প্রতি বান্দরবানে এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদলের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় বলে উল্লেখ করেছেন। সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতি প্রাথমিক পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় বিএনপি এবং পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম বিভাগ ও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়।

জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়নি বলে উল্লেখ করেছে। জনসংহতি নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারটি পাহাড়িদের বুঝিয়ে বলছে। পাহাড়ি ছাত্র-যুবকদের অন্যতম সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ইতোমধ্যে বান্দরবানের রুমায় মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এবং সংসদ বীর বাহাদুরের উপর হামলা চালায়। এর নেপথ্য কারণ জনসংহতি সমিতির তালিকা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন না করা।

সূত্র জানায়, এসব ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা অস্পষ্ট বলেই জনসংহতি সমিতি মনে করে। জনসংহতি সমিতি গত ২ ডিসেম্বর সই হওয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিভিন্ন ধারা যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে মনে করে। চুক্তির বাস্তবায়ন দ্রুত করা, আঞ্চলিক পরিষদ পুনর্গঠনসহ অন্যান্য দাবিতে জনসংহতি সমিতি আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ, প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও।

সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতি ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

www.pathagar.com

বিরোধিতাকারী তিনটি সংগঠনের সঙ্গে আপোস করতেও জনসংহতি সমিতির মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন নেতা কাজ করে যাচ্ছেন। শান্তিচুক্তি বিরোধিতাকারী ঐ পক্ষকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে আনতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন করা সহজতর হবে বলে সূত্র জানায়।

এদিকে সরকারদলীয় একটি সূত্র জানিয়েছে : জনসংহতি সমিতি আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে বলে তারাও শুনেছেন। আওয়ামী লীগ মাঠের আন্দোলনের জবাব মাঠেই দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঐ সূত্র জানায়, তাদের কাছে খবর আছে জনসংহতি সমিতির একজন উচ্চপদস্থ নেতার প্ররোচনায় খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও বান্দরবানের রুমায় মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার উপর হামলা চালানো হয়েছে। হামলাকারীদের কেউ কেউ ঐ নেতার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজের পার্শ্ববর্তী বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খারাপ কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে ঐ সন্ত্রাসীদের পুলিশ তখন গ্রেপ্তার করেনি বলে সূত্র উল্লেখ করেন। তিনি জানান, জনসংহতি সমিতি 'শান্তিচুক্তি' সরকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে না বলে যে দাবি তুলছে তার কোন ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, সময়ই প্রমাণ করবে এ সরকার শান্তি রক্ষার্থে কি করেছে, কি করেনি। তিনি জানান, কর্মসূচি যাই দেয়া হোক না কেন জনসংহতি সমিতি পার্বত্যবাসী পাহাড়ি-বাঙালিদের ভুল পথে নিয়ে যেতে পারবে না। আওয়ামী লীগ সঠিক পথ দেখাবে।

(সংবাদ, ২১ অক্টোবর ১৯৯৮)

আবার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে পার্বত্য জনগণের প্রতি শন্তু লারমার আহ্বান

জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান শন্তু লারমা আবার একটি 'আন্দোলনের' প্রস্তুতি নিতে উপজাতীয় জনসাধারণ ও আদিবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১০ দিন ধরে বান্দরবান জেলায় জনসংযোগ সফরের সময় বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনায় তিনি এ আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাও বান্দরবানে অবস্থান করে সরকারের পক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন। শন্তু লারমা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন, 'শান্তির প্রত্যাশায় আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি। কিন্তু সরকার চুক্তি থেকে দূরে সরে গেছে। তাই আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবারো নতুন সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই।' অন্যদিকে সরকাররের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে শান্তির পরিবর্তে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। কোনো কোনো দায়িত্বশীল সরকারি সূত্র জানিয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের পরিবর্তে সরকার এখন স্থানীয় সরকার পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। শন্তু লারমা বিগত পঁচিশ বছরে প্রথমবারের মতো বান্দরবান সফরে এসে যাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন তারা অনেকেই বিগত দিনে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। এমনকি শন্তু লারমার কুশপুত্তলিকাও দাহ করেছেন তারা। এ বিষয়টি সরকার খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিচ্ছে বলে জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় একজন নেতা জানান। শন্তু লারমা তার ১০ দিনের সফরে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ, ইউপি চেয়ারম্যান, মৌজা প্রধান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় লোকজনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয়

www.pathagar.com

পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। খাগড়াছড়ি ফিরে গিয়ে তিনি আন্দোলনের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে হরতালের ডাক দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

(ভোরের কাগজ, ২৪ অক্টোবর ১৯৯৮)

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক অচলাবস্থা অবসানে নতুন উদ্যোগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সাম্প্রতিক অচলাবস্থা নিরসনের নতুন একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার ২ নভেম্বর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির একটি বৈঠক ডেকেছে। জনসংহতি সমিতির নেতা শন্তু লারমা রোববার জনকণ্ঠকে বলেছেন তারা বৈঠকে অংশগ্রহণে সম্মতির কথা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। বৈঠকে সরকার পক্ষে চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ নেতৃত্ব দেবেন। তাঁকে সহযোগিতা করবেন শরণার্থী পুনর্বসান বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের প্রধান দীপংকর তালুকদার এমপি। জনসংহতির পক্ষে শন্তু লারমা ছাড়াও গৌতম চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান থাকবেন বৈঠকে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এই কমিটির সদস্য নন। তবে জনসংহতি সমিতির নেতা রূপায়ন দেওয়ান রোববার জনকণ্ঠকে বলেছেন, মন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চাইলে তাদের আপত্তি নেই। এর আগে ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর এমপিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বৈঠকে রাখা হয়েছিল। এদিকে মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা রোববার বিবিসিকে বলেছেন, সরকার জনসংহতির সাথে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে কোন আলোচনা আর করবে না। জনসংহতির নেতা রূপায়ন দেওয়ান জনকণ্ঠকে বলেছেন, বৈঠকের আলোচ্যসূচি আমরা জানি না, তবে আশা করছি সেখানে আঞ্চলিক পরিষদসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ৬ সেপ্টেম্বর ঘোষণার পর চলতি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কমিটিতে সরকার মনোনীত তিন সদস্যের বিষয়ে আপত্তি তুলে সমিতি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর গত প্রায় দেড় মাসব্যাপী সময়ে জনসংহতি নেতারা সরকারের কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের বেশ কিছু অভিযোগ করেছেন। এই প্রেক্ষিতে আগামী সোমবারের বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। রোববার সরকারি একটি সূত্র জনকণ্ঠকে বলেছে, জনসংহতি নেতারা কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে জনসংহতির পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এই অভিযোগ। সমিতির নেতা শন্তু লারমা রোববার দুপুরে টেলিফোনে জনকণ্ঠকে অবশ্য প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আশাবাদী কি না জানতে চাইলে সরাসরি কিছু বলেননি। শন্তু লারমা বলেন, বড় আশা নিয়ে আমরা সরকারের সাথে চুক্তি করেছি। সর্বোচ্চ ছাড় বলতে যা বোঝায় তার সব কিছুই আমরা দিয়েছি। এখন সরকার আন্তরিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে– সেই বিশ্বাস নিয়েই আমরা বৈঠকে যাচ্ছি। জনসংহতির প্রধান নেতা বলেন, সর্বশেষ ৭ আগস্টের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল প্রতিমাসে একবার চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক হবে। কিন্তু তা ডাকা হয়নি। নিয়মিত বৈঠক হলে, আলোচনা হলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। কারণ আমি বিশ্বাস করি, আমরা দু'পক্ষই বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই চুক্তি করেছি।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৮)

www.pathagar.com

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

মন্ত্রিসভা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা'র সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ অধিকতর সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। ফলে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মধ্যে পার্থক্য নিরসনের পথ সুগম হলো। একই সাথে মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাব অনুমোদন করায় পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের অবসান হওয়ারও সম্ভাবনা সৃষ্টি হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অধিকতর সংশোধনের এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী এই আইনের ৪ দফায় (কক) হবে– 'অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলার সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন।

জাতীয় সংসদে ইতোপূর্বে পাস হওয়া রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার আইনে ৪ দফায় (কক)– আছে বৈধ জায়গা-জমি আছে 'বা যিনি পার্বত্য জেলার সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন। 'এবং' শব্দের স্থলে 'বা' হওয়ায় জনসংহতি সমিতি এটিকে পার্বত্য শান্তিচুক্তির বরখেলাপ চিহ্নিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে পরবর্তীতে পাস হওয়া খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের আইনের ক্ষেত্রে 'বা' স্থলে 'এবং' করা হয়। কিন্তু রাঙ্গামাটি আইনে তা আগের অবস্থাতেই থেকে যায়। জনসংহতি সমিতি এতদিন ধরে রাঙ্গামাটি আইনের এই অসংগতির দূর করার দাবি করে আসছিল।

সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাঙ্গামাটি আইনের অধিকতর সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় আনে। অন্যদিকে আইন মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে মত দেয়া হয়েছিল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনটি বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে সংশোধন করা সঙ্গত হবে না। মন্ত্রিসভা এই দুধরনের মতামত পর্যালোচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব গ্রহণ ও অপরটি নাকচ করে।

(সংবাদ, ২৭ অক্টোবর ১৯৯৮)

পার্বত্য চট্টগ্রামের উগ্রপন্থীদের হাতে মর্টার নিক্ষেপের ক্ষমতাসম্পন্ন কামান

সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে তীব্র আন্দোলনের টার্গেট নিয়ে উগ্রপন্থী উপজাতীয়রা এবার মাঠে নেমেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঘাঁটি বলে পরিচিত বান্দরবানের রুমা ও রোয়াংছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ অন্যান্য কট্টরপন্থী উপজাতীয় দল 'আন্দোলনের' প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে বিভিন্ন পাড়া ও গ্রামে ব্যাপক সভা-সমাবেশ-গণসংযোগ করেছে বলে জেলা সদরে আসা উপজাতীয়রা জানায়। এলাকার মুষ্টিমেয় বাঙালিরা উপজাতীয় দলগুলোর উগ্র মনোভাবের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে শহরে

www.pathagar.com

চলে আসছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য জনসংহতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) সম্প্রতি এক দীর্ঘ 'সাংগঠনিক' সফরে মারমা অধ্যুষিত বান্দরবানের বিভিন্ন উপজাতীয় দলের সাথে গোপন বৈঠকের পরপরই উগ্রপন্থীদের সাংগঠনিক তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উপজাতীয় প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এ দলগুলো গহীন অরণ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে যাচ্ছে। মোটা অংকের চাঁদাবাজি করে ব্যবসায়ীদের কাছে চিঠি দিচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার।

এসব উগ্রপন্থী দল রুমা, রোয়াংছড়ি ছাড়াও থানচি ও আলীকদমে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করায় স্থানীয় বাসিন্দারা আশংকা করছেন, নিজেদের ক্ষমতার নমুনা হিসেবে ওরা যে কোনো সময় বড় ধরনের সন্ত্রাস চালাতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেল ছাড়াও বিভিন্ন মর্টার নিক্ষেপের ক্ষমতাসম্পন্ন কামানও তারা সংগ্রহ করছে পার্শ্ববর্তী দেশের বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে।

(দিনকাল, ১ নভেম্বর ১৯৯৮)

প্রেস ব্রিফিংয়ে শন্তু লারমা : শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধীদলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়েছে

জনসংহতি সমিতি চেয়ারম্যান শন্তু লারমা বলেছেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিরোধীদলগুলোর সঙ্গে তারা যোগাযোগ শুরু করেছেন। শান্তিচুক্তি বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চক্রের সাথে সমঝোতার সম্ভাবনা নাচক করে দিয়ে তিনি বলেন, সরকারই বরং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির ধারাবাহিকতায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রণয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য ও দাবি। এটি করা না হলে বাকি সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। গতকাল রাঙ্গামাটির উন্নয়ন বোর্ড রেস্টহাউজে এক প্রেস ব্রিফিঙে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) এ মন্তব্য করেন।

শন্তু লারমা বলেন, ২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা সম্পর্কেও তিনি ততটা আশাবাদী নন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিমাসে এই কমিটির সভা হওয়ার কথা থাকলেও ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবারের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সম্প্রতি বিডিআর ও বিএসএফ-এর যৌথসভায় ভারতে শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের তৎপরতা চলছে বলে যে সংবাদ পত্রপত্রিকায় এসেছে তা সত্যি নয়। তিনি এটাকে উদ্দেশ্যমূলক বলে অভিহিত করেন। আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তী পরিষদের সরকার মনোনীত ৩ জন বাঙালি সদস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে শন্তু লারমা বলেন, আমরা যাদের নাম জমা দিয়েছিলাম তারা যেমন আওয়ামী লীগ কর্মী-নেতা, সরকারের মনোনীত ব্যক্তিরাও আওয়ামী লীগের লোক। অতএব আমাদের লোককে বাদ দেয়ার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

তিনি বলেন, আমাদের মনোনীত বাদপড়া সদস্যদের সরকারি বিভিন্ন সংস্থার লোকজন প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে বলে আমাদের কাছে রিপোর্ট রয়েছে।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হলে ১৫ নভেম্বর থেকে জনসংহতি সমিতি আন্দোলনে যাবে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জেএসএস চেয়ারম্যান বলেন, আমরা কখনোই এমন কথা বলিনি। তবে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য করণীয়

www.pathagar.com

সবকিছুই আমরা করে চলেছি এবং করব। শান্তিচুক্তিবিরোধী পিসিপি, পিজিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতাদের সাথে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সমঝোতা নাচক করে দিয়ে শন্তু লারমা বলেন, একথা সত্যি নয়। যারা আমাদের হত্যা করে শান্তিচুক্তি ও শান্তি স্থাপনকে প্রতিহত করতে চায় তাদের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতা আমাদের হতে পারে না। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, আমাদের জানামতে সরকারের কোন কোন মহল এদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করছে। এমনকি এ সমস্ত সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পদক্ষেপের ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন, আজ পর্যন্ত সরকার কোন বিষয়েই তার সাথে আলাপ করেনি। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বিএনপিসহ সকল বিরোধীদলের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা সত্যি কিনা জানতে চাওয়া হলে জেএসএস চেয়ারম্যান বলেন, আমরা ইতোমধ্যে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছি।

জনসংহতি সমিতির ১৯ জন গ্রেপ্তারকৃত সদস্যের মুক্তির ব্যাপারে শন্তু লারমা বলেন, এ পর্যন্ত ৫ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি এতে সন্তুষ্ট নয়।

তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী একটি ঘোষণার মাধ্যমে যেখানে ১ জনের মুক্তি নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল তা না করে অহেতুক বিলম্ব ঘটানো হচ্ছে। তিনি দুঃখ করে বলেন এমনকি আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা রয়েছে সেগুলো এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বিভিন্ন উক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শন্তু লারমা বলেন, তার পক্ষে সম্ভব নয় এমন বিষয় নিয়েও তিনি যেখানে সেখানে কথাবার্তা বলে চলেছেন। শন্তু লারমা বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ে এখন কোন কথাবার্তা বলাকে আমি ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া হবে বলে মনে করি। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে শান্তিচুক্তির ধারাবাহিকতা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ আইনে ৪টি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা পরিষদ আইনে ১টি করে যে সংশোধনী আনা দরকার তা আনা হবে বলে আমি মনে করি।

(সংবাদ, ২ নভেম্বর ১৯৯৮)

একান্ত সাক্ষাৎকারে শন্তু লারমা : চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন অনিবার্য

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু) শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ভূমিকায় হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যথা হলে তারা আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন। তিনি বলেন, চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন অনিবার্য। আর তা কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে না।

গতকাল (মঙ্গলবার) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে ইত্তেফাকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে সরাসরি নির্বাচন দেয়া হলে তার সমিতি তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবে। সরকার সম্প্রতি শন্তু লারমাকে চেয়ারম্যান করে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করেছে। কিন্তু তিনজন

www.pathagar.com

বাঙালি সদস্যের নিয়োগের বিরোধিতা ও চুক্তির অন্যান্য শর্ত বাস্তবায়নের দাবিতে শন্তু লারমা পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তিচুক্তির বিভিন্ন অংশসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণের অবকাশ নেই। পার্বত্য তিন জেলা পরিষদ আইনসমূহ এখনও সংশোধন হয়নি, আঞ্চলিক পরিষদের ৩ সদস্য নিয়ে সমস্যা তা এখনও রয়েই গেছে। সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন, বন্দীদের মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহার, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি কমিশন গঠন,ভূমি পুনরুদ্ধার ও হস্তান্তরসহ শান্তিচুক্তি অনুযায়ী বহু বিষয় এখনও বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তিনি বলেন, চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের আইন সংশোধন করা না হলে আঞ্চলিক পরিষদ কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না।

শন্তু লারমা বলেন, তিন সদস্যবিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ২ জন সদস্য প্রতিটি বৈঠকে সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছেন যে, তারা ২ জন সরকার পক্ষ আর আমি জনসংহতি সমিতির পক্ষ। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে তিনজনকে একই সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়াদি পর্যালোচনা করা, বাস্তবায়ন করা এবং প্রয়োজনে সরকারকে পরামর্শ দেয়া। তিনি জানান যে, চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে ইতোমধ্যে তিনি বিরোধী দলের অনেক নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মন্থর গতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে শংকিত ও ক্ষুব্ধ করে তুলছে এবং তার প্রতিফলন বিভিন্ন এলাকায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। শন্তু লারমা বলেন, সরকারের সঙ্গে তাদের কিছু অলিখিত চুক্তি হয়েছিল। তবে তিনি উহার বিবরণ দিতে অস্বীকৃতি জানান। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভিযোগ করে তিনি বলেন, চুক্তি হওয়ার পর গত ১০ মাসে মাত্র ১০টি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প সরানো হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় ১৯ জন বন্দীর মাত্র ৭ জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। শন্তু লারমা বলেন, যে সেটেলারদের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন, সরকার সেই সেটেলারদেরকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রাধান্য দিচ্ছে।

(দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ নভেম্বর ১৯৯৮)

পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন সশস্ত্র আন্দোলনের আশঙ্কা। একটি উগ্রপন্থী গ্রুপ প্রকাশ্যে আসছে এ মাসেই

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে নতুন করে একটি শক্তি সংগঠিত হচ্ছে। এই গ্রুপটি জনসমর্থন লাভের জন্য উপজাতীয় জনপদগুলোতে জোর সাংগঠনিক তৎপরতা চালাচ্ছে বলে বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক নেতা প্রসিত খীসা এ গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন।

নতুন এই গ্রুপের শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতা এই প্রতিনিধিকে বলেছেন, পর্দার আড়ালে তাঁদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। ১০ নভেম্বর প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রক্রিয়া প্রকাশ্য আন্দোলনে রূপ নেবে। ঐ নেতা জানিয়েছেন, সম্প্রতি সরকারের সাথে শন্তু লারমা যে চুক্তি করেছেন, তাকে তাঁরা 'দাসত্বের চুক্তি' বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

এদিকে শান্তিচুক্তি সম্পাদনকারী শন্তু লারমা বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে কোন গ্রুপের নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, চুক্তিবিরোধী একটি গ্রুপ প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে। এছাড়া বান্দরবানের টাউন হলে ২২ অক্টোবর তাঁকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও তিনি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আভাস পাচ্ছেন। শন্তু লারমা কারও নাম উল্লেখ না করলেও পর্যবেক্ষক মহল বলেছেন, এটি স্পষ্ট যে, শন্তু লারমা প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বাধীন গ্রুপকেই ইঙ্গিত করছেন।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বে পাহাড়ি গণপরিষদের এক বিশেষ বর্ধিত সভায় এই মর্মে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল যে জনসংহতি সমিতি পাহাড়িদের দাবি আদায়ে ব্যর্থ হলে পাহাড়ি গণপরিষদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে জুম্ম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হবে। গত বছরের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রসিত বিকাশ খীসার অনুগামীরা প্রকাশ্যে চুক্তির বিরোধিতা করে। এ বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রথম অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই ঐ গ্রুপটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। প্রসিত খীসার অনুগামী সঞ্চয় চাকমাকে গ্রেপ্তারের পর এই আন্দোলন প্রকাশ্যে কিছুটা স্তিমিত হলেও গোপনে তাঁদের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত থাকে। প্রসিত গ্রুপের এক নেতা বলেছেন, সঞ্চয় গ্রেপ্তারের ঘটনা তাঁদের মনোবল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ৭ নভেম্বর ১৯৯৮)

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন পরিষদের ৭ ঘন্টা বৈঠকের পরও অচলাবস্থা কাটেনি ॥ ফের আলোচনা হবে : শন্তু

সোমবার চট্টগ্রামে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হলেও দু'দফা দীর্ঘ প্রায় ৭ ঘন্টার আলোচনায় দু'পক্ষের টানাপোড়েনের অবসান হয়নি। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও দু'পক্ষের অস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এসেছে অচলাবস্থা। রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের মাত্র ৩০ সেকেন্ডের অগোছালো প্রেস ব্রিফিংয়ে বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি ও চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বিশদ আলোচনা চলছে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। বিরক্ত অবয়বে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে শন্তু লারমার উক্তি ছিল– আলোচনা চলছে।

সোমবার নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট বিলম্বে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন পরিষদের ৪র্থ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শুরুর বিলম্বের কারণ ছিল সোমবার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত শন্তু লারমার বক্তব্য নিয়ে। শন্তু লারমা বলেছেন, আজকের বৈঠক নিয়ে তিনি আশাবাদী নন, প্রতিমাসে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। আর চুক্তির ধারাবাহিকতা নিয়ে আলাদা বক্তব্য। চিফ হুইপ জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকগুলো এনে পড়েন এবং সকাল পৌনে ১১টায় বৈঠক শুরু করেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, শুরুতে চিফ হুইপ চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য দেন। পরবর্তীতে শন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নে ধীরগতিতে নানা আপত্তি তুলে ধরেন। লারমার অভিযোগ ছিল, পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ বিলে বিরোধপূর্ণ ধারা সংশোধন হয়নি। তাঁর সংগঠনের গ্রেপ্তারকৃত অনেকেই মুক্তি পায়নি এবং কিছু

www.pathagar.com

সদস্যের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা এবং হুলিয়াও প্রত্যাহৃত হয়নি। উভয় পক্ষে এসব বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য নিয়ে বেলা গড়িয়ে যায়। বিকাল সোয়া ৩টায় ৪৫ মিনিটের বিরতি শেষে বিকাল ৪টায় সার্কিট হাউসের দোতলায় উভয় পক্ষে পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত বৈঠক চলে। এরপর সার্কিট হাউসের কর্ণফুলী রুমে পুনর্বৈঠক শুরু হয়। সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে চিফ হুইপ হাসনাত আবদুল্লাহ আকস্মিকভাবে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে চলছে। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে চলছে বিশদ আলোচনা। এসময় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি পুনর্বার ভিতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পর মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীকে নিয়ে তিনি একটি মাজার জিয়ারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এরপর শন্তু লারমা বেরিয়ে এলে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। বিরক্তির সুরে লারমা বলেন, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমাকে এভাবে বিরক্ত করে লাভ কি? সাংবাদিকদের প্রশ্ন, ৬ ঘন্টা বৈঠকের অগ্রগতি বলুন। লারমার উত্তর ছিল, আমাদের যেটা বলার তা বলা হয়েছে। অগ্রগতি হলে দেখবেন। আলাদা একটি কক্ষে যাওয়ার আগে লারমা সাংবাদিকদের মাত্র মিনিটখানিকের বক্তব্যে বলেন, আলোচনা আরও হবে। তবে তা কত সময় তা তিনি জানেন না।

এর আগে সকালে বৈঠক শুরুর পূর্বে শন্তু লারমা কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে বলেন, বৈঠক নিয়ে আমি হতাশ। প্রতি মাসে একটি বৈঠক হওয়ার কথা। অথচ আজকের বৈঠক ডাকা হয়েছে ৪ মাসে। বিলম্ব বৈঠকের জন্য আমাদের কাছে কোন পত্রও দেয়া হয়নি। আমাদের পরামর্শ নিয়ে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদে যে ৩ সদস্যের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে তা আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য আমরা চিঠি দিয়েছি কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। ভূমি কমিশন গঠন হয়নি। ফলে ফিরে আসা শরণার্থীদের বেদখল জায়গাজমির কোন সুরাহা হচ্ছে না। ঘোষিত ৩টি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের সংশোধনী চেয়েছি। কিন্তু কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। রাত ৮টায় উভয় পক্ষ পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয় এবং সোয়া ৯টায় তা সমাপ্ত হয়।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ নভেম্বর ১৯৯৮)

ভারতের ৭টি রাজ্য ও পার্বত্য এলাকা নিয়ে নতুন খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র

দেশের কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওরা ছেয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের পর অনাকাঙ্ক্ষিত হারে এনজিও তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় এবং সরকারের সাথে কোন প্রকার সমন্বয় ব্যতীত নানাবিধ কর্মকাণ্ড এনজিওগুলো চালানোর চেষ্টায় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে গত কয়েক মাস আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য এনজিওদের সার্বিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সরকারি সেই নির্দেশ এনজিওগুলো মানছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। পার্বত্য খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় অন্তত এক ডজন দেশী-বিদেশী এনজিও সক্রিয়। এদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন, সিসিডিপি, কারিতাস, আশা, প্রশিকা, ব্র্যাক, ফাদার্স টিম, ইউএনডিপি, বাওপা, ইনকেপ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নাম না জানা অনেকগুলো এনজিও খ্রিস্টান মিশনারীর কাজ করছে অতি গোপনে। এ সকল এনজিওদের মধ্যে বেশির ভাগই পশ্চিমা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশীয় বেশ কয়েকটি দেশের প্রত্যক্ষ বা

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য পরিপুষ্ট। পার্বত্য এলাকায় শিক্ষা, সেবা, সাহায্য ও উন্নয়নের নামে এনজিওগুলো দেড় যুগ আগে থেকেই আসতে শুরু করে। সাম্প্রতিককালে তাদের তৎপরতা অনেক বেড়েছে। চুক্তির পর হু হু করে আরো নিত্যনতুন এনজিও ঢুকে পড়ায় পার্বত্য পর্যবেক্ষক মহল অশুভ কোন মতলব তাদের রয়েছে বলেই ধারণা করছে।

বাস্তবে অনেকগুলো এনজিও সেবার ছদ্মবেশে নানা কৌশলে খ্রিস্টান মিশনারীর কাজে লিপ্ত। রীতিমত খ্রিস্টবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলছে। তাদের অঘোষিত ক্রুসেডে অনেকেই বিলীয় হয়ে যাচ্ছে। তারা মূলত 'ধর্ম যুদ্ধ' বা ক্রুসেডেই লিপ্ত। এদের কবলে পার্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় পাংখো, বোম, লুসাই, তৈইংচংগা, খুমি, চাক, মুরং, খিয়াংদের ধর্মীয় সামাজিক কৃষ্টি, কালচার, সভ্যতা অস্তিত্ব বিলুপ্তের পথে।

এছাড়া ত্রিপুরা ও মারমা উপজাতীয়রাও নীরব ক্রুসেডে বিলীন হচেছ। এনজিও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, হাজার হাজার উপজাতীয় পার্বত্য এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেছে। বান্দরবানের বোম, পাংখু, লুসাই উপজাতীয়রা ১০০ শতাংশই খ্রিস্টান হয়ে গেছে। বান্দরবানে খ্রিস্টানদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছে।

সীমান্ত সূত্রে জানা গেছে, খ্রিস্ট সমগোত্রের পৃথক পৃথক নামধারী অনেকগুলো এনজিও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম এলাকাগুলোতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই রাজ্যগুলোতে লাখ লাখ উপজাতীয় খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেছে। ভারতের ৭টি অঙ্গরাজ্যের উলফারা খ্রিস্টান ধর্মের ক্রশ গলায় দিয়ে থাকে বলে জানা গেছে।

খ্রিস্টানরা ভারতের ৭টি অঙ্গরাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনকি বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও ফেনী নিয়ে এই দু'দেশের বিশাল এলাকায় একটি খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার টার্গেট নিয়েই এগিয়ে চলছে। তারা এই বিশাল পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে উপজাতীয় খ্রিস্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী নীলনকশা সহকারে এগুচ্ছে।

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, মিরসরাইয়ের উত্তরাংশ, পটিয়া, রাউজান, সাতকানিয়া, কক্সবাজারের চকরিয়ায় এ সকল এনজিওদের তৎপরতা বিস্তৃতি লাভ করেছে। এনজিওগুলো রাজধানীর ঢাকা, ভারতের আইজল, চট্টগ্রাম, ফেনী থেকে পার্বত্য এলাকায় কলকাঠি নাড়ছে।

কোন কোন এনজিও উপজাতীয় খ্রিস্টান তরুণদের উচ্চ শিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কোরিয়া, ফ্রান্স, চীন, জাপান নিয়ে যাচ্ছে।

খ্রিস্টান মিশনারীর কাজে পার্বত্য এলাকায় নানা পরিচয়ে আসা খ্রিস্টানরা পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত এনজিও ও উপজাতীয় নেতাদের সাথে গোপন বৈঠক করে থাকে। সম্প্রতি বিদেশীদের আনাগোনা পার্বত্য এলাকায় বেড়ে গেছে। এদের প্রায় সকলেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রের লোক। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এ সকল বিদেশীদের আগমনের উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক তৎপরতা সম্পর্কে খুব কমই খোঁজ রাখছে।

গত অক্টোবর মাসে খাগড়াছড়ি জেলায় অস্ট্রেলিয়ার ফটো সাংবাদিকের পরিচয় দিয়ে জন ফেরী এবং অপর একজন আসে। তারা খাগড়াছড়ির বাজার মসজিদসহ বিভিন্ন এলাকার ভিডিও করে এবং ছবি তুলে নিয়ে যায়। এই দু'জন বিদেশী

www.pathagar.com

খাগড়াছড়ি আসা মাত্রই শান্তিবাহিনীর সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা রক্ত উৎপল ত্রিপুরার সাথে কথা বলেন। তারা খাগড়াছড়ি শহরের পোলাইট কম্পিউটার সেন্টারে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী ও কক্সবাজারের একটি ম্যাপ তৈরি করে নিয়ে যায়। তারা এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানও ভিডিও করে নিয়ে যায়। এতেই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তারা আসলে সাংবাদিক নয়, সে দেশের গোয়েন্দা। তাদের কোন সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় শান্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা চলাকালে আগত বিদেশীদের উপজাতীয় নেতারা এবং স্থানীয় এনজিওগুলো স্বায়ত্তশাসন দাবি এবং মানবাধিকার লংঘনের অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের সরকার, জনগণ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে। এছাড়া অনেক এনজিও পার্বত্য এলাকার ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থানসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিদেশে পাচার করছে।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১০ নভেম্বর ১৯৯৮)

মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন : শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন শন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) বলেছেন, বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্টের বিনিময়ে আজ পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি করা হয়েছে। একটি মহল নিজেদের স্বার্থে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে প্রলম্বিত করছে। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জটিলতা সৃষ্টি করছে। তিনি চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু করণীয় এ জন্য ঐক্যবদ্ধ এবং প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

জনসংহতি নেতা শন্তু লারমা গতকাল (মঙ্গলবার) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা মাঠে সাবেক সাংসদ জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় এ মন্তব্য করেছেন।

শন্তু লারমা বলেছেন, বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। তিনি পার্বত্য শান্তিচুক্তি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তিনি বলেন, 'শান্তিচুক্তির সুবাদে আজ এ অঞ্চলের যেসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন, তারা পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করেছেন। আশা করেছিলাম পার্বত্য অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক হবেন, সমন্বয় রাখবেন।' কিন্তু তারা তা করেননি বলে শন্তু লারমা অভিযোগ তুলেছেন।

পাহাড়ি গণপরিষদ নেতা থোয়াই প্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরা, পাহাড়ি পেশাজীবী ঐক্য কমিটির সদস্য সচিব সৌখিন চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা আহ্বায়ক তাতিন্দ্রলাল চাকমা, মহিলা শাখার সভানেত্রী মাধবী লতা চাকমা, পাহাড়ি গণপরিষদ সভাপতি ডা. কনিষ্ক চাকমা, সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি পলাশ খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন সভানেত্রী ওয়াই চিং প্রু মারমা, পাহাড়ি ছাত্র নেতা জলি মং মারমা, পার্বত্য আদিবাসী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, আবদুল

www.pathagar.com

গফুর তালুকদার প্রমুখ। জনসংহতি নেতা রসময় চাকমা সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন।

শন্তু লারমা শান্তিচুক্তির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, বাস্তবতা উপলব্ধি করে অধিকারকামী পার্বত্য মানুষের জন্য শান্তিচুক্তি করেছি। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ধোঁয়া তুলে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভেদপন্থী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি বিভেদপন্থীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি শান্তিচুক্তিবিরোধী প্রসিত সঞ্চয় গ্রুপকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদের হাতের পুতুল বলে অভিযোগ করে বলেন, 'ওরা শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চাচ্ছে'।

শন্তু লারমা স্মৃতিচারণ করে বলেন, ১৯৮৩ সালের এ দিনে বিভেদপন্থী গিরি প্রকাশ দেবেন পলাশ চক্র পাহাড়ি জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে নেতা এম এন লারমা এবং তার ৮ সহযোদ্ধাকে হত্যা করে। কিন্তু তারা গণধিকৃত হয়ে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নব্য বিভেদপন্থীরাও প্রত্যাখ্যাত হবে।

তিনি বলেন, শান্তিচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আজও নিষ্পত্তি হয়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইনে শান্তিচুক্তি পরিপন্থী যেসব ধারা রয়েছে তা সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে হয়নি।

প্রয়াত মানবেন্দ্র লামরার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালা উপলক্ষে গতকাল ভোরে খাগড়াছড়িতে নগ্নপায়ে এক শোক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের শাপলা চত্বরে ঘুরে এসে চেঙী স্কোয়ারে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। সফেদ পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে জনসংহতি নেতা শন্তু লারমা প্রথম বেদিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ওখানে জমায়েত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন ১০ নভেম্বর উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সমিতির সহসভাপতি উষাতন তালুকদার।

শান্তিচুক্তিপরবর্তী এই প্রথমবারের মতো জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় দুর্গম পাহাড়ি পথ ভেঙে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, যুব-কিশোর যোগদানের জন্য আসে। জনসংহতি সূত্রে জানা গেছে, কোস্টার, চাঁদের গাড়ি (খোলা জিপ), ৭০টির মতো গাড়িতে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসেছে সমাবেশে। জেলার দীঘিনালা, পানছড়ি, রামগড়সহ ৮টি থানায় এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

অপরদিকে পার্বত্য শান্তিচুক্তিবিরোধী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণপরিষদ জেলার পানছড়ি থানার পুজগাংমুখ হাই স্কুল মাঠে ও দীঘিনালার বানছড়া আনন্দময় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

খাগড়াছড়ির স্মরণসভা শেষ করে বাস ও খোলা জিপে করে ফিরে যাওয়ার সময় পার্বত্য শান্তিচুক্তিবিরোধীরা মহালছড়ি থানার বীজীতলা নামক স্থানে চুক্তির পক্ষের জনতার ওপর আক্রমণ চালায়। উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। আহতরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ৮টি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে বলে খাগড়াছড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে।

www.pathagar.com

বান্দরবানেও পালিত হয়েছে এম এন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী গতকাল বান্দরবানেও পালিত হয়েছে।

সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে সাধুরাম ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চন্দ্র শেখর চাকমা প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার অহেতুক তালবাহানা করছে। তিনি বলেন, কোনো কূটকৌশলের আড়ালে সাবেক গেরিলাদের কোণঠাসা করার যে কোনো চক্রান্ত সময়মতো মোকাবিলা করা হবে।

দিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে শোক র‍্যালি, স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য, প্রদীপ পূজা এবং ফানুস উড়ানো ছিল উল্লেখযোগ্য।

(ভোরের কাগজ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৮)

ক্যালকাটা জুম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভা : পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি : নতুন সমস্যার জট

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে এবং পাতানো খেলা ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যা সৃষ্টি করেছে ভারত। সমস্যা সমাধানের নামে ফাঁদ পেতেছে ভারত এবং নতুন করে সমস্যার জট বাধা শুরুও হয়েছে ভারতের মাটিতে।

বাংলাদেশ সরকারের সাথে যারা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তারা ভারতের মাটি থেকে ভারতের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের সাথে দীর্ঘদিন ধরে চোরাগুপ্ত হামলা চালিয়ে যুদ্ধ করেছে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং যেসব উপজাতীয় শান্তিচুক্তিকারীদের বিরোধিতা করছে, তারাও তা করছে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েই। এবং ভারতের পরামর্শেই শান্তিচুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারী এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারীদের বিরোধিতাকারী সকল গোষ্ঠীকেই পরামর্শ দিচ্ছে এবং পরিচালিত করছে ভারত। ভারতের এ ধরনের দ্বিমুখী চালে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারতের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যেই ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় এই পার্বত্য উপজাতীয়দের আর একটি নতুন গ্রুপ খাড়া করা হয়েছে। জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ক্যালকাটা জুম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (সিজেএসইউ)।

গতরাতে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, এই ক্যালকাটা জুম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গতকাল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে। এখানে উল্লেখ্য, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৮৩ সালে তার নিজ গ্রুপের কিছুসংখ্যক গেরিলার হাতে নিহত হন। লারমার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতাভিত্তিক ঐ জুম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তাদের প্রচারিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, "বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ভারত থেকে ফিরে যাওয়া ও অভ্যন্তরীণভাবে উচ্ছেদকৃত পাহাড়ি শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করতে হবে। সিজেএসইউ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এই সাবেক গেরিলা সংগঠনটি

www.pathagar.com

পাহাড়ি জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তারা যে চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের সাথে করেছে, তা কার্যকর করার মত ক্ষমতা তাদের নেই।"

বিবিসির খবরে আরো বলা হয়েছে, গতকাল বান্দরবানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সাবেক গেরিলা নেতারা জুম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে আন্দোলন সংগঠিত করতে প্রস্তুত আছেন বলে বক্তব্য প্রদান করেন।

অন্যদিকে জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি শন্তু লারমা সরকারের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে সরকারের একটি মহল এবং সরকারের বাইরে মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিকে বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো আগাগোড়াই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে তা বাতিল করার দাবি জানিয়ে আসছে। শন্তু লারমার শান্তিবাহিনী ভারতের তত্ত্বাবধানে থেকে ভারতেরই পরামর্শে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিতর্কিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তির বিভিন্ন ধারাতেই স্পষ্ট ভারত শান্তি বাহিনীকে দিয়ে এ চুক্তির মাধ্যমে তার কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে শান্তিচুক্তিতে সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। কিন্তু দেশের প্রবল বিরোধিতার মুখে কথিত শান্তিচুক্তিটি বাস্তবায়নে সরকারকে মারাত্মকভাবে হোঁচট খেতে হয়েছে। আর এরই জের ধরে ভারতের মাটিতে অবস্থানকারী পাহাড়ি তথা উপজাতীয়দের দিয়ে ক্যালকাটা জুম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গঠন করে তাদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এ দাবির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতের পাতানো খেলা এখন জমে উঠেছে।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১১ নভেম্বর ১৯৯৮)

জনসংহতি চায় পার্বত্য এলাকায় পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের তিন সদস্যের বিষয়টিই মুখ্য নয়— জনসংহতি সমিতি চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে সমিতির সাথে শাসক দলের তিন এমপি'র সম্পর্কই এখন ভাল নয়। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বললেও সমিতির এখনও প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা আছে। তাদের মতে তিন এমপিই সরকারকে বিপদগামী করছেন। এই অবস্থায় জনসংহতির প্রধান নেতা শন্তু লারমা হস্তক্ষেপ চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর। বিরোধী দলের সাথেও তাদের যোগাযোগ প্রয়াস অব্যাহত আছে। অমীমাংসিত অবস্থার কারণে আগামী ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে কোন অনুষ্ঠান পালনের সিদ্ধান্তও এখন পর্যন্ত হয়নি। জনসংহতি সমিতির একটি সূত্র শুক্রবার জনকণ্ঠকে বলেছে– তিন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ের কারণেই আঞ্চলিক পরিষদ অমরা মেনে নেইনি এই প্রচারণা সঠিক নয়। কারণ এই আঞ্চলিক পরিষদ শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য। শান্তিচুক্তি আর পার্বত্য বিলসমূহের অসঙ্গতির বিষয়েই আপত্তি তারা তুলেছেন। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ বিলে স্থায়ী বাসিন্দাদের সংজ্ঞায় 'এবং' আর 'বা'র যে

www.pathagar.com

গোলমাল ছিল তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ১৬ নভেম্বর সংসদেও তা উত্থাপনের কথা আছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল একটি সূত্র বলেছে, চিহ্নিত সমস্যাটিই মূল সমস্যা নয়। পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন কর্তৃত্ব নিয়ে জনসংহতির ক্ষোভ, আপত্তি। শান্তিচুক্তিতে আছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সবকিছুতে তদারকি থাকবে আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে জেলা পরিষদের। বিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদারকির বিষয় তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে। ২ হাজারের বেশি পুরনো মামলা আছে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। শন্তু লারমার বিরুদ্ধেও মামলা এখনও আছে। শান্তিচুক্তিতে এসব মামলা প্রত্যাহার অথবা নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কার্যক্রমের ধীরগতিতে সমিতি ক্ষুব্ধ। সাবেক শান্তিবাহিনীর কয়েক শ' সদস্যকে পুলিশে নেয়া হয়েছে। সমিতির ক্ষোভ অফিসার পদে নেয়া হচ্ছে না। পুরনো যাঁরা চাকরিতে ছিলেন তাঁদের চাকরি ফিরে পাবার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়াতেও তাঁরা অসন্তুষ্ট। অনেকে চাকরিতে যোগ দিয়েও বেতন পাচ্ছেন না। অনেকের চাকরির বয়স চলে গেছে। তাঁদের ক্ষতিপূরণের কোন ফয়সালা হয়নি এ নিয়েও তাঁরা ক্ষুব্ধ।

সূত্র বলেছে, উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও পার্বত্য এলাকায় জনসংহতির এখন মূলত চলছে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন আওয়ামী লীগ দলীয় নেতার ধারণা ছিল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর জনসংহতি নামে কোন পৃথক দল থাকবে না। জনসংহতির ধারণা ছিল তাদের সাথে আওয়ামী লীগের এমন একটি সমঝোতা হবে যে, জাতীয় পর্যায়ে তাঁরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না– তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় পরিষদসমূহেও আওয়ামী লীগ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। অলিখিত যেসব চুক্তির কথা তাঁরা বলছে সেখানেও নাকি এমন একটি সমঝোতার বিষয় ছিল। কিন্তু এসব হিসাব ঠিক থাকেনি। দু'পক্ষই এখন সব ক্ষেত্রে নিজ নিজ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে। সর্বশেষ আঞ্চলিক পরিষদের অন্তর্বর্তী কমিটিতে সরকার পছন্দের তিন সদস্যের অন্তর্ভুক্তিকে তাঁরা সমঝোতা ভঙ্গ হিসাবেই দেখেছে। ওই তিন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাঁদের রাগ রাঙ্গামাটির দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বান্দরবানের বীরবাহাদুর এমপি'র ওপর। দীপঙ্করকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান করার বিষয়ে জনসংহতি আপত্তি না করলেও বীর বাহাদুরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করার বিষয়টিকে তাঁরা ভালভাবে নেয়নি। জনসংহতির এক নেতা জনকণ্ঠকে বলেছেন, কথা ছিল উপজাতীয় এক ব্যক্তিকে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হবে। কিন্তু সরকার আলোচনা করেনি। আর তাদের দাবি হচ্ছে বীরবাহাদুর পার্বত্য চট্টগ্রামের তেরো উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি নাকি নেপালী। পার্বত্য এলাকার অপর এমপি কল্পরঞ্জন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন এতে জনসংহতিরই সায় ছিল। এখন রাজনীতির দ্বন্দ্বে কল্পরঞ্জনের সাথে তাঁদের সম্পর্ক খুবই নাজুক পর্যায়ে। শন্তু লারমা গত ১০ নভেম্বর খাগড়াছড়ির সমাবেশে প্রকাশ্যে এই তিন এমপি'র সমালোচনা করেছেন।

জনসংহতি সমিতির আরেকটি ক্ষোভ শান্তিচুক্তিবিরোধী প্রসিত গ্রুপের বিরোধিতায় সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাঁদের বক্তব্য প্রসিতদের বিরোধিতার মুখে ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা শান্তিচুক্তি করেছেন। এখন এই অবস্থায় ঘরে-বাইরে তাঁরা

www.pathagar.com

নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। প্রসিত খীসার অন্যতম সহযোগী নেতা সঞ্চয় চাকমা অবশ্য এখন কারাগারে। সূত্র বলেছে, আরেক পাহাড়ি নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সাথেও সমিতির সম্পর্ক এখন ভাল নয়। উপেন নাকি দাবি করে বলেন, শন্তু লারমা আত্মসমর্পণকারী ২ হাজার সাবেক শান্তিবাহিনীর নেতা আর তিনি নেতা প্রায় ৬০ হাজার প্রত্যাবাসনকারী শরণার্থীর। উপেন্দ্র লাল আঞ্চলিক দল জনসংহতির চাইতে জাতীয় রাজনীতিতেই বেশি আগ্রহী। এসব পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক পরিষদ প্রশ্নে অচলাবস্থার অবসান প্রত্যাশার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলায় সংগঠন জোরদারের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। বিরোধী দলের সাথে আলোচনার যে উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছে সেটিও শান্তিতে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টার অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। রাঙ্গামাটির স্থানীয় একটি সূত্র বলেছে, সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় জনসংহতি এবং তার প্রতিপক্ষের তরফে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। জনসংহতির চাঁদার রসিদে স্লোগান হচ্ছে– 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে একত্রিত হোন'। অপরপক্ষের অন্য রসিদে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনের আহ্বান আছে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ নভেম্বর ১৯৮৮)

শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি ॥ সরকার ও জনসংহতির সম্পর্কে বড় ফাটল

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এক বছরের মধ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির সম্পর্কে বড় একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। আজ ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের প্রথম বর্ষপূর্তিতে দিবসটি উভয় পক্ষ পালন করছে পৃথক মঞ্চে। রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে জনসংহতি সমিতি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে প্রধান সমাবেশটি করছে। খাগড়াছড়িতে তারা সমাবেশ করবে। অন্যদিকে সরকারি দল আওয়ামী লীগ রাঙ্গামাটির অদূরে কাপ্তাইয়ে সমাবেশ করছে। খাগড়াছড়িতেও সরকারি দল সমাবেশ করবে। তাছাড়া চুক্তিবিরোধী বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠন সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজারে ও বান্দরবানে সমাবেশ ডেকেছে। তাদের দাবি, চুক্তি বাতিল করতে হবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের প্রথম বর্ষের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতির প্রধান শন্তু লারমা বলেছেন, 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে এক বছরের অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়।' পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্প রঞ্জন চাকমা বলেছেন, 'শান্তিচুক্তির সকল শর্তই পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।' অন্যদিকে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত সরকার দলের এমপি দীপংকর তালুকদার বলেছেন, 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে উভয় পক্ষকেই আন্তরিক হতে হবে।'

(প্রথম আলো, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৮)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : খ

JANA SAMHATI SAMITI
(UNITED PEOPLES PARTY)

Chittagong Hill Tracts Guide Lines

Ideology : Humanitarianism is idelogy of Jana Samhati Samiti.

Principles : Nationalism, Democracy, Secularism are the main principles of Jana Samhati Samiti.

Aims and Objects : For the achievement of the right of self-determination of the various small nationalities, such as the Chakma, Marma (Mogh), Tripura, Bom, Murung, Pankho, Khumi, Chak, Khiang and Lusai, is the main aim and object of the party, that is :

1. In order to be free from Islamic fanaticism, expansionism, exploitation, oppression, deprivation and perpetuated rule of Bangladesh and to safeguard the national entity and homeland for the various multilingual nationalities– (a) To ensure the separate entity status of Chittagong Hill Tracts with a constitutional guarantee. (b) To establish Regional autonomy with a Legislative Assembly:

2. Chittagong Hill Tracts in the homeland of various multilingual small nationalities. Therefore– (a) To do away with difference, oppression, exploitation and deprivation among the various multilingual small nationalities: (b) To develop culture and language of the various small nationalities.

Associate Organizations : The associate organization of Jana Samhati Samiti are : –(1) Shanti Bahini (peace army)- armed wing; (2) Militia (auxiliary force)- armed wing; (3) Gram Panchayet- village council; (4) Juba Samiti- youth forum; (5) Mahila Samiti- Women's association.

www.pathagar.com

Strategy & Tactics on External Help : Jana Samhati Samiti irrespective of caste. creed and religion, would welcome and ready to accpet unconditionally every help extended from any nation, humanitarian society, UNO, humanitarian and political organizations which are sympathetic to our cause and believe that would accelerate the movement for the right of self– determination. Specially, Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti expect help and cooperation from world humanitarian and democratic states in preserving the national entity and homeland of the Jumma people. It also expects every kinds of help from the UNO along with other world humanitarian organizations namely– Amnesty International, IFOR, Survival International and Anti-Slavery etc.

সূত্র : (Amena Mohsin 1997 : 223-224).

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চার খণ্ড (ক,খ,গ,ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন :

(ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এ চুক্তির আওতায় যথাশিগগির ইহার বিভিন্ন ধারায় নিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে:

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহ্বায়ক।
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য।
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য

www.pathagar.com

৪। এই চুক্তির উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন :

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিনটি) আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।
(খ) ৪ নম্বর ধারার উপধারা ১,২,৩,ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।
(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হইবে "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন– অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বছর' শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বছর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

www.pathagar.com

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে : আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বছরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা(২)-এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর উপ-ধারা(১) ও উপ-ধারা(২)-এ পরিষদে সরকারের উপসচিব সমতল একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে: "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা(৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা(১) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

www.pathagar.com

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা(১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।
(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা(৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা(৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে : কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বছরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে : পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা(২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার(৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা(১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন করা হইবে : আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা(৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

www.pathagar.com

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে :

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাষা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পরিষদে এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা(১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হইবে : এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা(১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা(২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

www.pathagar.com

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে : পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। (ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে : (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত হইবে :

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
(খ) পুলিশ (স্থানীয়);
(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
(ঘ) যুব কল্যাণ;
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(চ) স্থানীয় পর্যটন;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জনসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
(ট) মহাজনী কারবার;
(ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক অরোপনীয় কর রেট, টোল এবং ফিসের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে :

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;
(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

www.pathagar.com

(চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ;
(জ) সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালিটির অংশবিশেষ;
(ঞ) ব্যবসার উপর কর;
(ট) লটারির উপর কর;
(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে :

চেয়ারম্যান ১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) ১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) ৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।
অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।
উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

www.pathagar.com

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।
খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।
খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।
গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।
ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।
ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।
চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে :

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নেবর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন :

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ '৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ '৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির

www.pathagar.com

লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্থ ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলে ভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে :

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);
গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;
ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।
খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আসন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ : যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া ও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান : চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও

www.pathagar.com

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি, পরোয়ানা, হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

www.pathagar.com

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্যে সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অদিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

www.pathagar.com

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
৮) সাংসদ, বান্দরবান
৯) চাকমা রাজা
১০) বোমাং রাজা
১১) মং রাজা
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

(সূত্র : সালিম সামাদ ১৯৯৮)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ঘ

শন্তু লারমার সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাতকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (শন্তু) লারমা 'সম্প্রতি দৈনিক 'প্রথম আলো' কে দীর্ঘ এক একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। গত ১২ নভেম্বর ৯৮ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি শহরে তাঁর অস্থায়ী আবাসে এ সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন ও তার সমস্যা, পাহাড়ে চুক্তি বিরোধীদের তৎপরতা, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আস্থার অভাব, বর্তমান আওয়ামী লীগসহ সাবেক তিন সরকারের সঙ্গে সংলাপ, মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার হত্যাকাণ্ড, দলের তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, জনসংহতি সমিতির বর্তমান ও ভবিষ্যত রাজনীতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন– এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা অনেক কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকারটির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হলো।

প্রশ্ন : দীর্ঘদিন আত্মগোপনে রাজনীতি করার পর এখন প্রকাশ্যে এসেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন দেখছেন?

শন্তু লারমা : পরিস্থিতি বলতে যেটা প্রথম বলা যেতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল। গত ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখন চাইবে এখানে শান্তি থাকবে উন্নয়ন আসবে।

গোটা দেশের কথা বলা যেতে পারে- পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে নিয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। এটাও একটা দিক।

অন্যদিকে সশস্ত্র যুদ্ধের কারণে যে অবস্থাটা সাধারণত হয়ে থাকে, দুই পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের মধ্যে কাউন্টার ইরসারজেন্সীর কারণে সাধারণ নিরীহ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়। সেটা থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ আছে।

চুক্তি বাস্তবায়নটা কতোটুকু হচ্ছে না হচ্ছে সেটা একটা বিষয়। সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতি হওয়ার কারণে, বিশেষ করে চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো যথাসময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে নানাভাবে আশঙ্কা, সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। যে এলাকায় যাই– সেখানে একই প্রশ্ন, এতোদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তা সত্ত্বেও ঠিকভাবে, ঠিক সময়ে কেন চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে ন। এ প্রশ্নটা সব মহল থেকে করা হচ্ছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সরকার পক্ষ এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

এ অস্বস্থিকর অবস্থার জন্য এখন একে অপরকে দায়ী করছে। সরকার পক্ষ বলছে জনসংহতি সহযোগিতা করছে না। আবার জনসংহতি সমিতি বলছে যে, সরকার পক্ষ যথাসময়ে যথাযথভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না। এখানে আমাদের প্রেক্ষিতে যদি মূল্যায়ন করি তাহলে দেখতে পাই, চুক্তি অনুসারে জনসংহতি সমিতির যেটা করণীয় ছিল, তা জনসংহতি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে করেছে। এখন চুক্তির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যা কিছু করণীয় সেগুলো হচ্ছে মূলত এবং প্রধানত সরকারের বিষয়। জনসংহতি সমিতির এখন প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু করণীয় নেই, সহযোগিতা প্রদান ছাড়া। আমি মনে করি জনসংহতি এ সহযোগিতাটা সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার যে প্রক্রিয়াটা রয়ে গেছে সেটা অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। এ কারণেই ইতিমধ্যে নানা সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সমস্ত সমস্যার কারণে আজকে জনসংহতি সমিতিকে নানাভাবে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

সমস্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে, যেহেতু চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী সেনা শিবির, ভিডিপি, আনসারসহ শিবিরগুলো এখনো স্ব-স্ব আবাসে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি সে কারণে এখনো বিভিন্ন এলাকায় সেনা উপস্থিতি নানাভাবে, পরোক্ষভাবে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাছাড়া এটা স্পষ্ট যে, এখন পর্যন্ত এখানকার সিভিল প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলার ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে সেনা কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটা যদি আমরা দেখি, ভারত প্রত্যাগত যে শরণার্থীরা আছে এবং এখানে পরিস্থিতির শিকার হয়ে যারা অভ্যন্তরীণভাবে উপজাতীয়দের মধ্যে উদ্বাস্তু হয়ে আছে, তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটা যথাযথভাবে হচ্ছে না এবং বলতে গেলে প্রক্রিয়াটি নাই বললেই চলে। যদিও এখানে একটা টাস্কফোর্স-এ উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবন যাত্রাটা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অথচ সরকার পক্ষ নানা বক্তব্য দিচ্ছে। সেখানেও তারা পরিস্থিতিটাকে ঘোলাটে করছে। আমি বলবো চুক্তি সম্পাদনের পরপর মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, তাতে এখন ভাটা পড়েছে। সরকারের প্রতি যথেষ্ট সন্দেহ, অবিশ্বাস, গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। বিশেষ করে এখানকার যে জনপ্রতিনিধিরা আছেন, যারা জনগণের ভোটে এবং জনসংহতি সমিতির সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছেন, আজকে তাদের যে বক্তব্য সেগুলো চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক। অন্যদিকে সরকার যে প্রতিশ্রুতি বা বক্তব্য দিচ্ছেন এবং অন্যান্য সময় দিয়েছেন সেগুলোও বিরোধাত্মক। ফলে জনগণ এ পরিস্থিতিতে একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছেন বা পড়ে গেছেন বলা যায়।

প্রশ্ন : চুক্তি বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ কি সরকারের আন্তরিকতার অভাব? নাকি তাদের বর্তমান অগ্রাধিকারে আপনারা নাই ?

শন্তু লারমা : যে প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন, সেটা অত্যন্ত জটিল বিষয়। এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্নও বলবো আমি। কারণ সরকার বলছেন যে, তাদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা রয়েছে, প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে চলছে– এটা তারা বলে আসছেন। পক্ষান্তরে এখানকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা স্থায়ী বাসিন্দা সরকারের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের মিল নাও থাকতে পারে। আর, জনসংহতি সমিতি এ পরিপ্রেক্ষিতে যে

www.pathagar.com

বক্তব্য রাখতে পারে তার সঙ্গেও পার্থক্য থাকতে পারে। এ বিষয়ে আমি বা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারাতো কম বলেছি বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং দিয়ে যাচ্ছি।

এখানে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সরকারের একটা বিশেষ মহল আছে, সেই বিশেষ মহলের কারণে চুক্তি বাস্তবায়নটা এতো ধীরগতি হচ্ছে এবং যেগুলো উল্লেখযোগ্য বিষয় এখনো পর্যন্ত সেগুলো অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে আরো অন্যান্য বিষয় অবশ্যই থাকতে পারে, আছে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত না গিয়ে এটাই বলতে চাচ্ছি যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনসংহতি এবং আমি মনে করি- এখানকার জনগণের আস্থা রয়েছে। তবে সরকারের যে দায়দায়িত্ব তা সামগ্রিক অর্থে প্রধানমন্ত্রীরও আছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একা সব দায়দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকারের আরো যে অঙ্গসংগঠন অর্থাৎ প্রশাসন, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকল ক্ষেত্রে যারা আছেন– শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে তাদেরও দায়দায়িত্ব রয়েছে। আমরা বারে বারে বলে আসছি যে, সরকারের একটি বিশেষ মহল আছে, চুক্তিকে নিয়ে, চুক্তিকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছাত্রপরিষদ, গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটা ছোট্ট গ্রুপ চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে, স্লোগান দিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করছে। চুক্তির বিরোধিতার নামে তারা মূলত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে বা অস্তিত্বকে ধ্বংস বা বিলুপ্ত করার জন্য সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আর সরকারের বিশেষ মহলটি এদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। যাতে তারা সন্ত্রাসমূলক কাজগুলো করে যেতে পারে; জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা, দুর্বল করা এবং নানাভাবে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখার চেষ্টা আছে। যাতে বলা যেতে পারে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থাটা, পরিস্থিতিটা এখনো পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি, অস্বাভাবিক রয়ে গেছে। যাতে এখানে সামরিক উপস্থিতিটা, প্রয়োজনীয়তাটা দেখানো যেতে পারে এবং যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে। আমাদের মনে হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কারণে চুক্তি বিরোধীরা এখানে প্রকাশ্যে সশস্ত্রভাবে ঘোরাফেরা করছে। অথচ তাদের কোনো কিছু করা হয় না।

প্রশ্ন : শোনা যায় চুক্তি বিরোধীদের পিছনে বিদেশী শক্তিও রয়েছে। সরকারতো বলছে চুক্তি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তারা তৎপর। বেশ কিছু ব্যক্তি গ্রেপ্তারও হয়েছে।

শন্তু লারমা : এক্ষেত্রে আমরা যতোটুকু জানি সেটা বলতে পারি। তারা কোনো বিদেশী শক্তির সহযোগিতা বা সাহায্য পাচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সত্য। কিন্তু করা হচ্ছে কি কারণে? প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যখনই তাদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই যে খাগড়াছড়িতো এখান থেকে বেশি দূরে নয়, বলা যায় তাদের প্রধান আস্তানা। যেখান থেকে তাদের কার্যকলাপ চালানো হয়। সবকিছু জেনেশুনেও তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে না। আমরা তো দুএকবার শুনেছি পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কিন্তু ঘুরে আসলে তো হবে না। তাদের কার্যকলাপতো নিষ্ক্রিয় করা হয় না। এ রকম কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপও দেখতে পাই না। আমরা শুনেছি যে, গ্রেপ্তার করার পর পর সরকারের পক্ষ থেকে তাদের

www.pathagar.com

জামিন দেয়ার সুপারিশ করা হয়। জামিনও পেয়ে গেছে। সবাই জানে যে, এরা ফিরে এসে আবারো সে কাজ করবে। সরকারের কোনো না কোনো বিশেষ মহলের কারণে এটা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি বলছেন, তারা সশস্ত্র হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তাহলে আপনাদের নিরাপত্তা কি হুমকির মুখে?

শন্তু লারমা : নিশ্চয়ই। এটাতো আমরা বলেই আসছি। অথচ সরকারের সঙ্গে আমাদের অলিখিত চুক্তি ছিল যে- আমাদের নিরাপত্তা সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা তো দেয়া হচ্ছে না। আজকে আমার যে অবস্থা, এই যে এখানে খাগড়াছড়িতে আছি, গত মার্চ মাসের ৫ তারিখ আমি এখানে এসেছি। আমি এবং আমার সহকর্মী নেতৃস্থানীয়দের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে এটাওতো একটা অন্যতম দিক যে, আমাদের অন্য কোথাও যেতে হলে যে সহযোগিতা আমাদের দরকার সেটা দিতে হবে। কিন্তু তা আমরা পাইনি। যেমন আমি এখানে আছি, আমি যদি অন্য কোথাও যেতে চাই তাহলে আমাকে প্রশাসনের কাছে লেখালেখি করতে হবে। পুলিশ দরকার, তারাতো আর সঙ্গে সঙ্গে আসছে না। তাদের মধ্যে লেখালেখি হবে। তাদের জনবল নাই, যানবাহন নাই।

যেমন গতবার আমি রাঙ্গামাটি হয়ে চট্টগ্রাম গেলাম– তখন পুলিশ এসেছে। কিন্তু গাড়ি ছিল না। প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর, না পেয়ে খাগড়াছড়ি বাজার থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাঙ্গামাটি রাজবনবিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। দেরিতে গিয়ে পৌঁছেছি। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারিনি। কিন্তু বিষয়টা সেটা না। আমি পৌঁছুতে পারি বা না পারি, আন্তরিকতাটা এখানে প্রশ্ন। আমাকে যদি এতো গুরুত্ব দেয়া হতো, তাহলে আমার নিরাপত্তার দিকটাও দেখা হতো। আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে চট্টগ্রামে। একদিন আগে না হয় আর কি। আমার তো মূলত লক্ষ্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাজে চট্টগ্রাম যাওয়া। তাহলে আমাকে, যিনি জনসংহতি সমিতির সভাপতি, যানবাহনের সুযোগটা দিতে হবে না? যিনি এত বড় একটা শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, সে শান্তিচুক্তি দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। সেখানে তার জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা হবে না কেন? স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এটা আগেই করা উচিত ছিল না? যেমন আমি খাগড়াছড়ি শহরে আছি। প্রয়োজন হচ্ছে আমি গ্রামে যাবো বা পৌর এলাকায় যাবো। আমি কাকে নিয়ে যাবে? আমাকে একজন বডিগার্ড দেয়া হয়েছে, আর এখানে তো শুধু হাউস গার্ড দেয়া হয়েছে। আমি যদি পানছড়িতে যেতে চাই জরুরি কাজে, তাহলে পুলিশের জন্য লেখালেখি করতে দিন দুয়েক চলে যাবে। এখানে আমি ডিসি বা এসপির বিরুদ্ধে বলছি না। আমি বলছি প্রক্রিয়ার কথা। কারণ ওনাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন প্রশাসনের গাড়ি নাই। যানবাহনের অত্যন্ত অভাব। ভাড়া গাড়ি না হলে হয় না। সেখানে আপনারা জানেন- ভাড়া গাড়ির দামটা দেবে কে? তখন টানাটানি পড়ে যায়। এটাই আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আমি একজন সদস্য। সে হিসেবে আমার প্রয়োজন এখানে চুক্তির ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা। অথচ নানা অসুবিধার কারণে আমি তা ঠিকভাবে করতে পারছি না।

অন্যদিকে দেখেন প্রসিত সঞ্চয় গ্রুপটা। ঘিলাছড়িতে যাদের অপহরণ করলো তাদের তো মেরেই ফেলতো। জনগণের চাপ ছিল বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ১০ নভেম্বরের ঘটনা দেখেন যেটা বিজিতলায় হয়ে গেলো। দিনটি তারাও পালন

www.pathagar.com

করেছে, আমরাও করেছি। কর্মসূচি শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তারা আক্রমণ করলো। ১০ জন আহত হলো, ৮টা গাড়ি ভাঙচুর করলো। যে গাড়িগুলো এসেছে সভা চলার সময়, সেগুলোর সিটসহ বিভিন্ন জিনিস নষ্ট করেছে। এগুলো হয়রানি ছাড়া আর কি? যাতে পরবর্তীতে গাড়ির মালিকরা আমাদের গাড়ি না দেয়। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সমস্যা করছে।

এখানকার জনগণতো চুক্তির পক্ষে। তবে তারা সেটা দেখেন মোটা চোখে। যেমন : সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হবে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হবে, আঞ্চলিক পরিষদ হবে, জেলা পরিষদ আইন হবে। কিন্তু ভিতরে কি আছে, না আছে সেটাতো তারা বোঝেন না। তাদের বোঝানোতো আমার কাজ। তারা আমাকে দেখতে চায়। আমার কাছ থেকে শুনতে চায়। কিন্তু আমিতো যেতে পারি না এসব অসুবিধার কারণে।

প্রশ্ন : আপনি একাধিকবার অলিখিত চুক্তির কথা বলছেন। এর আগেও বলেছেন, আসলে কি ছিল তাতে?

শন্তু লারমা : এখনতো সবকিছু বলা যাবে না। কথা ছিল, ২২ সদস্যের আঞ্চলিক পরিষদ জনসংহতি সমিতি করবে। আমাদের নিরাপত্তা বিধান করবে। আরো কতোগুলো ছিল। সবকিছু মিলিয়ে চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ না করে পারছি না। লিখিত চুক্তির মধ্যে জেলা পরিষদ আইনটা হচ্ছে না। সেটা সর্বাগ্রে হওয়ার কথা। সেটা তোলা হয়েছিল এপ্রিলে। আজকে ৮ মাস গেলো টানাটানি করতে। যে জেলা পরিষদ আইনটাকে কেন্দ্র করে চুক্তিটা, বলা যায় সমগ্রটা এবং এখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মূল ভূমিকা জেলা পরিষদ আইনের। সেটা এখনো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। গত ২ নভেম্বর চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যে মিটিং হলো সেখানে আমাদের বলা হলো- শুধু রাঙ্গামাটি জেলার স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা ধারাটা পরিবর্তন করা হবে। অথচ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলা পরিষদ আইনে আরো বিরোধাত্মক ধারা রয়েছে। সেগুলো না হলে তো আইন অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। এভাবে তিন মাস, ছয় মাস পর পর একটা করে সংশোধন করা হলে আগামী ৫ বছরেও তো শেষ হবে না। চুক্তি অনুসারে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন এগুলো করতে করতে তো বর্তমান সরকারের সময়টাই পার হয়ে যাবে। কখন চুক্তি বাস্তবায়ন হবে? যেমন ধরুন, গতবারে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক হলো। আমরা এ পর্যন্ত মাত্র চারটা বৈঠক করেছি। বৈঠকে তারা লিখিত কোনো কিছু করতে চায় না। সেখানে সভার কার্যবিবরণী বা বৈঠকের সিদ্ধান্ত থাকা দরকার। কি আলাপ হলো, কি সিদ্ধান্ত হলো বা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বটা কি- এটা হলো চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টা পরিবীক্ষণ করা। চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি হলো, না হলে কেন হলো না, সেটা সব কিছু পরিষ্কার করা। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠকে গেলে মনে হয় যেন নতুন করে ডায়ালগ শুরু হয়েছে। একদিকে সরকার পক্ষ অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি। কি আশ্চার্যের ব্যাপার! আমার সব সময় লিখিত আলোচনা দাবি জানিয়ে আসছিলাম। সর্বশেষ বৈঠকে জানানো হলো, তাদের পক্ষে সম্ভব না। চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির একটা অফিস পর্যন্ত নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : তাহলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না?

শন্তু লারমা : নিশ্চয়ই না। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন : চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধী দলের সহযোগিতা চাইবেন বলেছেন। এতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

শন্তু লারমা : এটা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি। চুক্তি যেহেতু জনসংহতি সমিতি বা সরকারের একক চুক্তি না, এটা হচ্ছে গোটা বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য একটা চুক্তি। এই চুক্তিতে যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সকল পাহাড়ি, বাঙালির। এখানে এ চুক্তি যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সম্পদ তা যদি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগানো যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি শান্তি আসে– তা গোটা বাংলাদেশেরই শান্তি। তাই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার, বিরোধী দল, বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে চুক্তি যাতে যাথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় তার জন্য আমরা সকলের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রশ্ন : এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা আছে কি? বিরোধী দলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ কি হচ্ছে?

শন্তু লারমা : সরাসরি হচ্ছে না। তবে চুক্তির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা দরকার। এটা বাংলাদেশের স্বার্থে, বিরোধীতা করলেও আমরা তাদের কাছে যাবো। এছাড়া বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সবার কাছে আমাদের আবেদন- বাংলাদেশের স্বার্থে এ চুক্তিটাকে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। আমরা এ ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করবো। সরকার যাতে এটা বাস্তবায়ন করতে আরো এগিয়ে আসতে পারে। যে বাধাগুলো আছে সেগুলো যাতে অপসারিত হয়। সেজন্য আমরা যাকে যেখানে পাই, সেখানে আমাদের আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্ন : কিছু বিরোধী দলতো চুক্তি মানে না। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজেই বলেছেন, উনি ক্ষমতায় আসলে চুক্তি সংশোধন করবেন।

শন্তু লারমা : তারা না মানলেও আমরা যাবো। আমরা মনে করি এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

প্রশ্ন : বিএনপি আমলে আপনাদের সঙ্গে সংলাপ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না কেন?

শন্তু লারমা : বিএনপি আমলে আমরা সরকারের কাছে লিখিতভাবে আমাদের দাবি দিয়েছিলাম। তারা সেটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট উত্তর দিয়েছিলেন। তারা যেটা দিতে চেয়েছিলেন, সেটা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের মতোই। অবশ্য পরে একটা সাব কমিটি করা হয়েছিল, আপনারা জানেন। কিন্তু সাব-কমিটির তো সে ধরনের কোনো ক্ষমতা ছিল না।

প্রশ্ন : এরশাদ আমলেও তো আলোচনা হয়েছে- সে সম্পর্কে বলবেন? তখন কি সমস্যা হয়েছিল?

শন্তু লারমা : এরশাদ সরকারকেও আমরা লিখিত দিয়েছিলাম, তারা নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বৈঠকে ফেরৎ নিয়ে এসে বলেছিলেন, তারা তা গ্রহণ করবেন না। তারা একটা লিখিত দেবেন, তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেটার ওপর আলোচনা হবে। এটা তারা বলেছিলেন। আমরা বলেছিলাম, সেটা সম্ভব না। এরশাদ সরকারতো পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন– ১৯৮৯, ওই পর্যায়েই ছিলেন। সেটা ৯ দফা রূপরেখার ভিত্তিতে হয়েছিল। সে থেকে আর আলোচনার অগ্রগতি হয়নি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের সময় আপনি জেলে ছিলেন। শোনা যায় তখন আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল এবং তার ভিত্তিতে আপনাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

শন্তু লারমা : হ্যাঁ, তখন থেকে সংলাপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি আমিই শুরু করেছি। অবশ্যই পার্টির সম্মতি নিয়ে। তখন সরকারের মধ্যে একটা গ্রুপ ছিল। আমার মনে হয় তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী মশিউর রহমান চেয়ে থাকতে পারেন। প্রক্রিয়া সেখানে শুরু হয়েছিল, লক্ষ্য ছিল কিভাবে সমঝোতায় পৌছানো যায়। আমাকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে কোনো কারণ থাকতে পারে কিনা জানি না। তবে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম, বিনাশর্তে। মুক্তি পাওয়ার পর আমি চেষ্টা করেছিলাম উভয় পক্ষ যাতে বসতে পারে। কিন্তু সেটা হয়নি। সরকারের পক্ষে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যিনি কথা বলবেন, ওনার ক্ষমতা আছে কিনা তা পার্টির তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কাগজটা না দেয়ার কারণে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি। আমি দেখেছি কাগজটা। তখন যিনি চট্টগ্রামের জিওসি ছিলেন জেনারেল মঞ্জুর, ওনাকে দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন : জেনারেল মঞ্জুরের ভূমিকা কি ছিল?

শন্তু লারমা : ওনার ভূমিকাটা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্ণারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কথা বলে, সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা। সে ক্ষমতাটা তাকে দেয়া হয়েছিল। কাগজটা আমি দেখেছি। কিন্তু সে কপিটা জনসংহতি সমিতিকে না দেয়ার কারণে আলোচনা হয়নি।

প্রশ্ন : তখনতো আপনাদের দলের ভেতরেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল? দল হিসেবে কি আপনারা বেশি অনড় ছিলেন?

শন্তু লারমা : না, আমার মনে হয় বেশি অনড় ছিলাম না। তবে সে সময় থেকে বিভেদপন্থীরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো। মুক্তিলাভ করার পর আমি যখন কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গিয়েছিলাম, সেই সময়ই অনুভব করেছিলাম দলে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যখন জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখান থেকে বিস্ফোরণটা দেখা গেছে। যা হোক, জাতীয় সম্মেলনটা শেষ করি। এর পরবর্তীতেও চক্রান্তকারীরা অপচেষ্টা চালাতে থাকে। এর ফলে সমস্যাটা বড়ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে হত্যা করার মতো শক্তিশালী কি বিভেদপন্থীরা নিজেরা ছিল? নাকি তাদের সঙ্গে আরো কোনো শক্তি ছিল?

শন্তু লারমা : না, তারা তেমন শক্তিশালী ছিল না। এখানে অন্য পক্ষ ছিল, বিদেশীদের হাত ছিল। কোনো না কোনো মহল তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল বা হাত ছিল। হাত বলতে এখন সেটা সুস্পষ্টভাবে বলা যাবে না, তবে দেশী-বিদেশী মহল জড়িত ছিল এটা স্পষ্ট। এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে, আমাদের নেতাকে তারা হত্যা করতে পারতো না। সে সময় হলো কি, আমরা উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত নিলাম এক হয়ে যাবো। উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সেখানে আমিও ছিলাম, আমাদের নেতাও ছিলেন। বৈঠকে সেখানে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা জনগণের স্বার্থে, আন্দোলনের সফলতার স্বার্থে, আমরা পুনর্মিলনীর উদ্যোগ নিলাম। তারিখও ধার্য হলো। সে সুযোগটা তারা নিয়েছে। আমাদের আন্তরিকতা ছিল, সদিচ্ছা ছিল, সেকারণে সেভাবে অবস্থান নিয়েছি। সব সময় সতর্ক ছিলাম না। সেখানে আমিও ছিলাম। আমি যে কিভাবে বেঁচে গেছি সেটা ভাবলে এখনো আশ্চর্য লাগে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : প্রীতি চাকমার গ্রুপতো শেষ পর্যন্ত দলেবলে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল? অবশ্য প্রীতি চাকমাসহ কয়েকজন নেতা বাদে বাকিরা। অথচ তারাই বেশি বিপ্লবপনা দেখিয়েছিল?

শন্তু লারমা : হ্যাঁ, তারাতো আত্মসমর্পণ করলো। সে সময়তো তারা বিরাট বিপ্লবী কথাবার্তা বলেছিল। আত্মসমর্পণের পর তারা দুর্বল হয়ে গেলো। যারা আত্মসমর্পণ করেনি, তাদের একটা বড়ো অংশ আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলনে বাধ্য হলো। কিন্তু তারা সে সময় চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

প্রশ্ন : সম্প্রতি বিডিআর-বিএসএফ বৈঠকে বিডিআর প্রধান বলেছেন, প্রীতি চাকমা ওপারে সক্রিয়া আছেন।

শন্তু লারমা : এটার কোনো ভিত্তি নেই। একদম অসত্য। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কেন এ ধরনের অভিযোগ করা হলো, আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের ঘরের ভিতর যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করছে তাদের তো আগে ধরা দরকার। প্রীতি কুমার, উনি গুনার ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত আছেন। চার কুচক্রী যাদের বলা হয়– একজনতো তাদের আত্মঘাতি গুলিতে মারা গেছেন। বাকিরা তাদের ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত আছেন। শিবির পরিচালনা করছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের যারা চুক্তির বিরোধীতা করছে, তারাতো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আগে তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত।

প্রশ্ন : প্রসিত-সঞ্চয় চুক্তির বিরোধীতা করছে। তারাতো আপনাদের সঙ্গেই ছিল?

শন্তু লারমা : হ্যাঁ, ছিল। আমি বলবো তারা ছদ্মবেশে ছিল। তাদের যে উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতিপরায়ণতা এগুলো ধামাচাপা দেয়ার জন্য ছিল। এখানে আমি বলবো, তারা চার কুচক্রীর উত্তরসূরী। অবশ্য এদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে তারা একই চিন্তাধারার লোক। প্রীতি, ভবতোষ-চার কুচক্রীর পেছনে যেমন কোনো না কোনো মহলের হাত ছিল, প্রসিত-সঞ্চয়ের পিছনেও কোনো না কোনো মহলের হাত রয়েছে। হতে পারে মৌলবাদী গোষ্ঠী বা অন্য কোনো মহল। তারা বিভিন্ন সময় এমন বক্তব্য দেয় যে, তারা দেখায়- আমরা জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ক্ষতি করেছি। এটা হচ্ছে তাদের আবরণ। তাদের যে হীন তৎপরতা সেগুলো আড়াল করার জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য এগুলো করে আসছে।

প্রশ্ন : আপনাদেরও একটা গ্রুপ সীমান্তের ওপারে রেখে এসেছেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন?

শন্তু লারমা : এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। আমরা যারা জনসংহতি সমিতির সদস্য, তারা সবাই বড়ো আশা নিয়ে, সদিচ্ছা নিয়ে চলে এসছি। কোনো গ্রুপ রেখে আসার প্রশ্নই থাকতে পারে না। চুক্তি অনুসারে আমাদের যা করণীয় তার সব কিছুই আমরা করেছি।

প্রশ্ন : জনসংহতি সমিতির রাজনীতির ভবিষ্যত কি?

শন্তু লারমা : আমি তো মনে করি জনসংহতি সমিতির রাজনীতির ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। কারণ জনসংহতি সমিতি সুনির্দিষ্ট নীতি, আদর্শ নিয়ে চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করাই জনসংহতি সমিতির মূল লক্ষ্য। তাছাড়া জনসংহতি সমিতিতো দীর্ঘ দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতি করে আসছে। সাধারণ মানুষের সমর্থনও পেয়েছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা জনসংহতি সমিতির আছে কি?

শন্তু লারমা : রাজনৈতিক দল হিসাবে জনসংহতি সমিতি অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তা এককভাবে হতে পারে। আবার অন্য কোনো জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলেও করতে পারে। তবে তা নির্বাচনের সময়ের সামগ্রিক অবস্থা এবং বাস্তবতার ওপর নির্ভর করবে।

প্রশ্ন : কার সঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে যেতে পারেন?

শন্তু লারমা : যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা পাহাড়ি-বাঙালি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহানুভূতি সম্পন্ন। তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে জনসংহতি সমিতি জাতীয় ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন : জাতীয় ইস্যু বিষয় বলছেন— বর্তমানে দেশে যে অস্থিরতা চলছে, সেখানে আপনাদের একটা ভূমিকা আছে বলে কি মনে করেন?

শন্তু লারমা : অবশ্যই মনে করি আছে। তবে এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামেও তো নানা সমস্যা। জেলা পরিষদ আইনগুলো ঠিকভাবে হচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হচ্ছে না। চুক্তি যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

প্রশ্ন : জনসংহতি সমিতির মতো আওয়ামী লীগেরও জনসমর্থনের একটা বড়ো ভিত্তি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে, বিশেষ করে পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে। পরিস্থিতি নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্যই কি চুক্তি সম্পর্কে আপনারা ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশ করছেন?

শন্তু লারমা : না, এখানে চুক্তির ওপর ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করে আমরা রাজনীতি করছি না। চুক্তি বাস্তবায়নটা সবার দাবি এবং আমি মনে করি জনসংহতি সমিতি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে নয়। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার চলছে। তাই চুক্তি বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতৃত্বের বেশি ভূমিকা রাখা উচিত। চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানে যারা জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বে আছেন, ওনারাওতো জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে পড়েন। স্বাভাবিকভাবে এখানে কেউ যদি বলেন যে, তারা ঠিকভাবে কাজ করছেন না, সেটা উদ্দেশ্যমূলক হবে। আমি বলবো বাস্তবতা বিবর্জিত। চুক্তিকে নিয়ে অহেতুক ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশ করা, চুক্তিকে নিয়ে কোনো বাস্তবতা ছাড়া কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া, এটাতো হতে পারে না। জনসংহতি সমিতি সেটা করেওনি, করবেও না। আমি দেখি যে, চুক্তি যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না, এটাতো সত্য।

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসের কারণে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। তেল গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ চলছে। আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে কি আপনারা এসব কিছু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন?

শন্তু লারমা : উন্নয়নের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমে আমাদের যে দিকটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী জনগণের স্বার্থ। সেজন্য বর্তমান যে পরিস্থিতি, সেটা স্বাভাবিক হয়ে না আসা পর্যন্ত হাজার হাজার পরিবার নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারছে না। নিজের জায়গাজমি তারা নিজেদের দখলে আনতে পারেনি। সেই ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী, আর এখানে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু শরণার্থী যারা বিভিন্ন জায়গায় আছেন, তাদের পুনর্বাসনটা না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন তৎপরতা তেমন কাজে দেবে না। সর্বোপরি এখন এই যে বহিরাগত যারা আছেন, যারা স্থায়ী বাসিন্দা নন-৪ লাখের বেশি মানুষ, তাদেরও একটা সম্মানজনক পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের উন্নয়নের কোনো সুফল পাওয়া যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত : হচ্ছে এখানে এই উন্নয়নের কার্যক্রম যাতে অর্থবহ হতে পারে তার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ঠিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। অর্থাৎ এই আইনগুলো প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এবং আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এখানে উন্নয়নের কাজ যদি নেয়া হয়, তাহলে সেগুলোর বাস্তবায়ন একটা সমস্যা দেখা দেবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, এখানে উন্নয়নটা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থে না আসার সম্ভাবনা বেশি। সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে উন্নয়ন এখানে দরকার, উন্নয়নকে আমরা স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ অত্যন্ত গরিব এবং পশ্চাৎপদ। এখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে, নতুন করে রাস্তাঘাট নির্মাণের কোনো প্রয়োজন নেই। যেগুলো আছে সেগুলো প্রশস্ত করা, লিংক রোডগুলো সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা ঠিকমতো করা প্রয়োজন। এখানে সবচাইতে বেশি জরুরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির উন্নয়ন। এ সমস্ত ক্ষেত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, যাতে উন্নয়নটা এখানে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে এখানে চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। এখানকার হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের পুনর্বাসন হওয়া দরকার। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ দেয়া হবে সেটা আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে হওয়া দরকার। দেশী-বিদেশী যে উন্নয়ন বরাদ্দ হবে তা আঞ্চলিক পরিষদের নেতৃত্বে হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামে বেকারত্ব একটা বড়ো সমস্যা। কর্মসংস্থানও দরকার। এ ব্যাপারে কি পরিকল্পনা আছে আপনাদের?

শন্তু লারমা : পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বেকারত্ব দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে। কর্মসংস্থান হবে। তা ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হবে, সে ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান হবে। ভূমি সমস্যার অনেক সমাধান হবে। ফলে সমন্বিত কৃষিরও বিকাশ হবে, তাতে কর্মসংস্থান বাড়বে।

প্রশ্ন : বাঙালিদের প্রশ্নের আসি। আঞ্চলিক পরিষদে সরকার মনোনীত ৩ জনের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। এটা কি ঠিক, তাদের আপনারা স্থায়ী বাসিন্দা মনে করেন না?

শন্তু লারমা : আমরা আঞ্চলিক পরিষদে যে বাঙালি সদস্যদের নাম দিয়েছি তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনাটা ছিল, তারা স্থায়ী বাসিন্দা কিনা, দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক এবং অতীত রাজনীতি স্বচ্ছ কিনা। অলিখিত চুক্তিতে ছিল জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করবে। সে হিসাবে আমরা নাম দিয়েছি। সরকার আমাদের কিছু না জানিয়ে ৩ জনকে বাদ দিয়ে হঠাৎ করে নতুন ৩ জনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রশ্ন : আপনি চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনের কথা বলছেন।

শন্তু লারমা : আমরাতো আন্দোলনের মধ্যেই আছি। অস্ত্র জমা দিয়ে আন্দোলনের রূপ পাল্টিয়েছি। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে সশস্ত্র আন্দোলন করছি। এখন অস্ত্র জমা দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করছি। অস্ত্র জমা দেয়ার পর আমরা মনে করি চুক্তি বাস্তবায়ন দরকার।

প্রশ্ন : আঞ্চলিক পরিষদে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেওতো ক্ষোভ অসন্তোষ রয়েছে?

শন্তু লারমা : এখানে আমাদের যে আঞ্চলিক পরিষদের দাবি ছিল, আর বর্তমানে যে আঞ্চলিক পরিষদ দেয়া হয়েছে, সেটা দাবি অনুসারে হয়নি। এখন যে সংখ্যাটা আছে এটা অনুসারে যদি দেখতে হয়, তাহলে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিগুলোর সরাসরি

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ব তাতে নেই। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে যাতে কমপক্ষে একজনকে দেয়া যায়, সেজন্য আমার দাবি করেছিলাম ২৮ সদস্য। যেহেতু রূপটা হয়ে গেছে জাতিভিত্তিক, সেহেতু প্রত্যেক জাতি থেকে কমপক্ষে একজন করে নিতে চেয়েছিলাম। সেটা সরকার পক্ষ মেনে নেয়নি। সে জন্য ২২ সদস্য করা হয়েছে এবং সেটা সংখ্যাভিত্তিক হয়েছে। আসলে সেটাও ঠিক হয়নি। এখানে বাঙালিদেরকে যেটা এক-তৃতীয়াংশ ধরা হয়েছে, তা কমে যাবে। বাঙালি সংখ্যা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যেভাবে দেখা যায়, যিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা– তিনি ভোটাধিকার প্রাপ্ত। ভোটাধিকার প্রাপ্ত মানে উনি নির্বাচিত হতে পারবেন। তাহলে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাঙালি জনসংখ্যা, তা কমে যাবে। যারা এখানে আছেন তারা সবাই স্থায়ী বাসিন্দা নন। সামগ্রিক হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ, যাতে ৫০ হাজারে একজন সদস্য ধরা হয়েছে। ৭ জন বাঙালি সদস্য মানে, জনসংখ্যা সাড়ে ৩ লাখ। অথচ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে এ সংখ্যা আরো কম হবে। মানে এক-তৃতীয়াংশ না। তাই এখানে ভাগটা জাতিভিত্তিক করা হয়নি। অবশ্য জাতিভিত্তিক করা হলে ভালো হতো। সেটা করা সম্ভবপর হয়নি। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোরতো জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

আর, একটা বিষয় হচ্ছে যে, কেউ নির্বাচিত হয়ে যখন পরিষদে যাবেন তখন উনিতো আর নিজের জাতির প্রতিনিধিত্ব করবেন না। তিনি ওখানে যে দায়িত্বটা নেবেন সেটা অনেক বড়ো কাজ। ওখানে তো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, পাংখো সম্প্রদায়ের দায়িত্ব তারা পালন করবেন না। তিনি স্বাভাবিকভাবে যে দায়িত্ব নেবেন, সে বিষয়গুলোর প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি পরিষদের সদস্য হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। ওনারা আমার কাছে এসেছিলেন। যখন বান্দরবান গেলাম, তখনও বেশ কয়েক দফা এ বিষয়ে বোঝানোর জন্য আলোচনা করতে হয়েছে। উনারা বুঝেছেন।

প্রশ্ন : জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পাঠকদের প্রতি আপনার কোনো কিছু বলার আছে কি?

শন্তু লারমা : আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে আমাদের আবেদন, চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের পক্ষে সবাই থাকবেন এই কামনা করি। এখানকার যে বাস্তবতা তা যেন সংবাদপত্রে তথ্যভিত্তিক এবং সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় সেটাও আশা করি। আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাই সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের জনগণ যেন শান্তিচুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের পক্ষে থাকেন।

(প্রথম আলো : ১৯/১১/১৯৯৮)

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. বাংলা ভাষায় রচিত

আজকের কাগজ, ৮ ডিসেম্বর, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ : ঢাকা।

আব্দুস সাত্তার, ১৯৬৬, পাকিস্তানের উপজাতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স : ঢাকা।

আহমদ ছফা, ১৯৯৮, শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ, ইনফো পাবলিকেশন্স : ঢাকা

এ. ওয়াদুদ ভূঁইয়া অদুদ, ১৯৯৮, 'পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিরোধ : কালো চুক্তি মানি না', সাপ্তাহিক পূর্ণিমা (৩ জুন) : ঢাকা।

এম. কামরুজ্জামান, ১৯৮৬, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সংকট : উপজাতীয়তা ও সংহতি', প্রাক্সিস জার্নাল (সংখ্যা ২২) : ঢাকা।

গিয়াস উদ্দিন মোল্যা, ১৯৯২, 'বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (সংখ্যা ৪২) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ : ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ডিসেম্বর '৯৭–নভেম্বর '৯৮ : ঢাকা।

বরেন ত্রিপুরা, ১৯৯০, 'ত্রিপুরা জাতি', সাপ্তাহিক পার্বতী (২৩ নভেম্বর) : প্রকাশ স্থান নেই।

বিপ্লব চাকমা, ১৯৯৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র : ঢাকা।

মাহফুজ পারভেজ, ১৯৯৭, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : বিকল্প মানবিক সমাধান' দৈনিক পূর্বকোন (১৬ সেপ্টেম্বর) : চট্টগ্রাম।

মাহফুজ পারভেজ, ১৯৯৮, 'জাতীয়তাবাদের রাজনীতি' বাংলাবাজার পত্রিকা (৬ মে) : ঢাকা

মাহফুজ পারভেজ, ১৯৯৮, 'একবিংশ শতকের পদধ্বনি', পাক্ষিক শৈলী (১ জুন) : ঢাকা।

মাহফুজ পারভেজ, ১৯৯৮, 'সম্ভবনার দুই দিগন্ত', দৈনিক পূর্বকোণ (৩ আগস্ট) : চট্টগ্রাম।

মাহফুজ পারভেজ, ১৯৯৮, 'পার্বত্য সংকটের নানা মাত্রা ও ভবিষ্যৎ' দৈনিক পূর্বকোণ (১০ আগস্ট) : চট্টগ্রাম।

মোঃ নূরুল আমিন, ও অন্যান্য, ১৯৯২, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (সংখ্যা ৪২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা।

মোঃ শাহ আলম, ১৯৯৬, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজ পাঠ, ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম, আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : চট্টগ্রাম।

রাশীদ উন নবী, ১৯৯৮, 'সরকারি শান্তি নিয়ে অশান্তি', সাপ্তাহিক পূর্ণিমা (১৩ মে) : ঢাকা।

শামসুল আলম, ১৯৯৭, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে আনন্দ মিছিল ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া', আজকের কাগজ (৪ ডিসেম্বর) : ঢাকা।

www.pathagar.com

সজল বসু, ১৯৯৫, আঞ্চলিক আন্দোলন, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স : কলকাতা।
সালিম সামাদ, ১৯৯৮, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সংগ্রাম, পাঠক সমাবেশ : ঢাকা।
সিদ্ধার্থ চাকমা, ১৯৮৫, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, মল্লিকপুর : কলকাতা।
সিদ্ধার্থ চাকমা, ১৯৮৬, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স : কলকাতা।
সুবোধ ঘোষ, ১৯৯৫, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি : কলকাতা।
সুনীতি বিকাশ চাকমা, ১৯৯১, প্রসঙ্গ : পার্বত্য চট্টগ্রাম, এখনো ষড়যন্ত্র : চট্টগ্রাম।
হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯৮, 'জাতীয় সংহতির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ', দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭-২০ জুলাই) : ঢাকা।
হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৭, পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা, আগামী প্রকাশনী : ঢাকা।

২. ইংরেজি ভাষায় রচিত

Amena Mohsin, 1997, The Politics of Nationalism : The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, UPL : Dhaka.
Amena Mohsin & Imtiaz Ahmed, 1996, 'Modernity, Alienation and the Enviornment : The Experience of the Hill People', Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (December) : Dhaka.
Asish Nandy, 1983, The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonialism, Oxford University Press : Delhi.
Bangladesh Observer, 1980 (22 April) : Dhaka.
BBS, 1986, Statistical Pocket Book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Government of Bangladesh : Dhaka.
Bertil Lintner, 1990, 'Interactable Hill', Far Eastern Economic Review (April 5) : Hongkong.
CHT Report, 1991, Chittagong Hill Tracts Commission (May) : Dhaka.
D. R. Z. A Nazneen, 1996, 'Conflict Resolution Approach : The Case of Sri Lanka and Bangladesh', Social Science Review (Vol. XIII, No 2) University of Dhaka : Dhaka.
IISS, 1985, The Military Balance, (1985-86) : London.
Khaled Belal, 1992, The CHT, Falconry in the Hills : Chittagong.
M. Nurul Amin, 1988-89, Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tracts, Regional Studies (Winter) : Islamabad.
Mey Wolfgang, 1984, Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, IWGIA Document (No-51) : Copenhagen.
M. R. Shelley, 1992, The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh : An Untold Story, CDRB : Dhaka.
Parliament Debates, 1973, Government of Bangladesh : Dhaka.
Rabindra Nath Tagore, 1976, Nationalism, MacMillan : London.
Rehman Sobhan, 1991, The Decade of Stagnation : The State of the Bangladesh Economy in 1980s (ed.), UPL : Dhaka.
S. A. Ahsan & Bhunitra Chakma, 1989, 'Problems of National Integration in Bangladesh : The Chittagong Hill Tracts', Asian Survey (Vol.29, No.10) : California.

www.pathagar.com

Satish Kakti, 1993, 'North East Chaos', Stateman (July 14) : Calcutta.
Selina Haq & Ehsanul Haque, 1990, Disintegration Process in Action : The case of South Asia, BILIA : Dhaka.
S. Kamaluddin, 1980, 'A Tangled web of Insurgency', Far Eastern Economic Review (May 23) : Hongkong.
S. Mahmud Ali, 1993, The Fearful State : Power, People and Internal War in South Asia, Zed Books : London & New Jersey.
Stephen Oren, 1976, 'After the Bangladesh Coup', The world today.
Subir Bhaumik, 1996, Insurgent Crossfire : North-East India, Lancer Publishers Pvt. Ltd : New Delhi.
Syed Anwar Hossin, 1991, 'Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics', BIISS Journal (Vol.12, No. 4) : Dhaka.
Syed Murtaza Ali, 1996, The Hitch in the Hills, Publish by Dil Monowara Begum : Chittagong.

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ প্রান্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা; দীর্ঘ দুই দশকের জাতিগত সংঘাত আর বহু মানুষের রক্ত, অশ্রু, বেদনায় সিক্ত পার্বত্য জনপদে অবশেষে সম্পন্ন হয়েছে 'শান্তিচুক্তি' (১৯৯৭)। সন্দেহ নেই, চুক্তির ফলে পাহাড়ে আপাত শান্তি নেমে এসেছে; কিন্তু এটাও লক্ষ্যনীয় যে, এ প্রসঙ্গে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে একটা গুমোট আকার ধারন করেছে। বিরোধী দলই শুধু নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং সরকারের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকারী জনসংহতি সমিতি পর্যন্ত নানা ক্ষোভের কথা বলেছে। ১৯৯৮ সালে চুক্তির বর্ষপূর্তি হলেও পুরো বাস্তবায়ন হয়নি চুক্তির। বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে অনিশ্চয়তার দোলাচল; অমীমাংসিত থাকছে স্থায়ী শান্তির আকাংখা। *'বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি'* গ্রন্থে দল-নিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট, মাটি, মানুষ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ, চুক্তি ও চুক্তি পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সূক্ষাতিসূক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশ্লেষন করা হয়েছে স্থায়ী শান্তির নানা প্রস্তাবনা ও রূপরেখা। পার্বত্য জনপদের সামগ্রিক সমস্যা ও সম্ভাবনার তথ্যনিষ্ঠ প্রামান্য দলিলে ভরপুর এ গ্রন্থে সর্বশেষ অবস্থা পর্যন্ত সময়কালের সজিব ও প্রানবন্ত বিবরণ উপস্থাপনা করা হয়েছে।

মাহফুজ পারভেজ, কবি-লেখক-গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা পেশায় থেকে গত ছয় বছর ধরে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পিএইচডি গবেষনাকালে রচনা করেন এ গ্রন্থ।–যা সাম্প্রতিক সময়ের একটি সিরিয়াস ও গুরুত্বপূর্ন গবেষণা-কর্ম।

১২৫.০০ টাকা